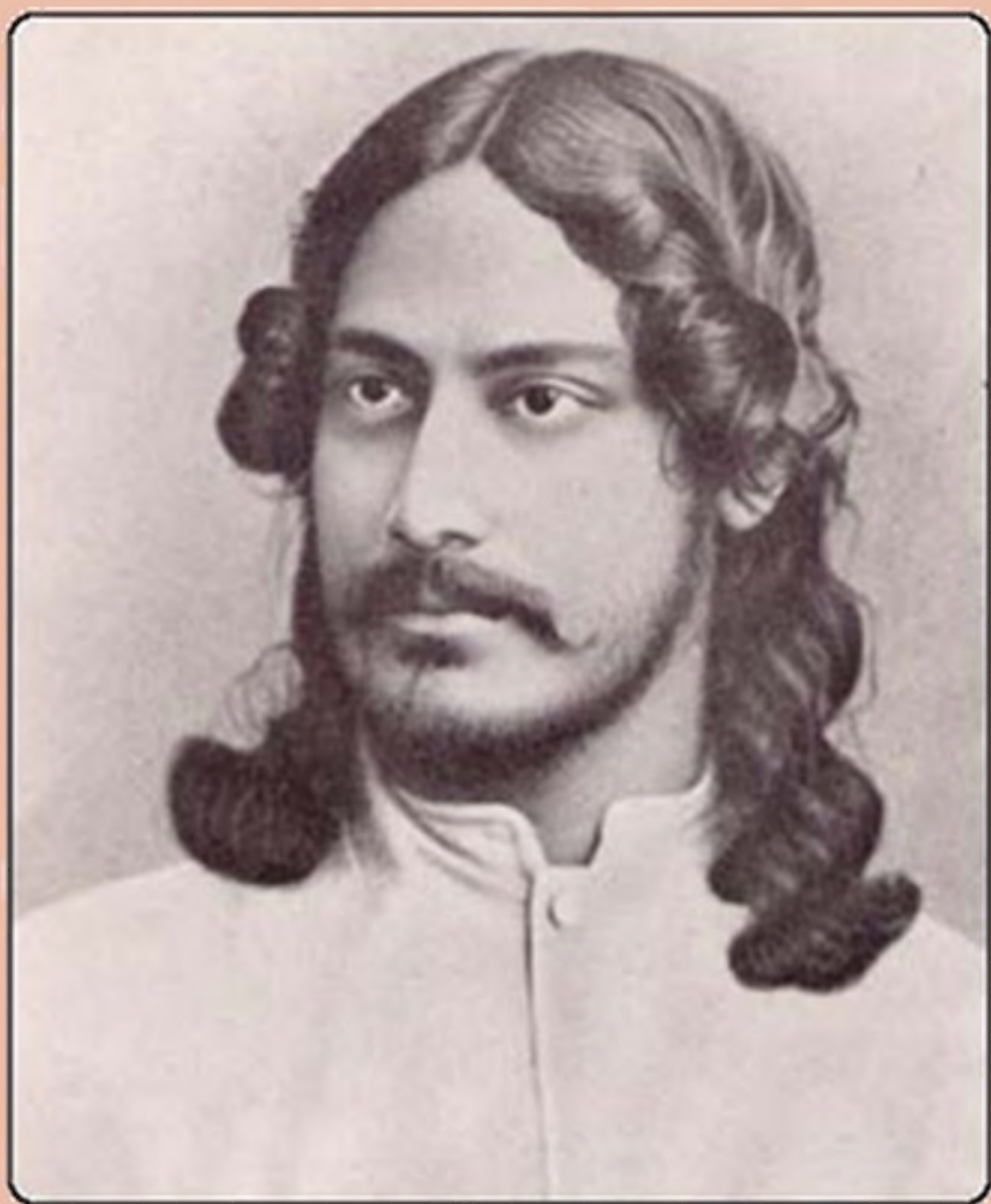


# রবীন্দ্র রচনাবলী

অষ্টাদশ খণ্ড

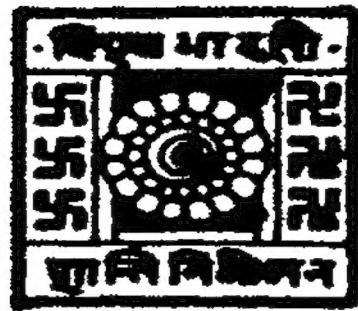
শ্রীবিষ্ণুনাথ ঠাকুর



# রবীন্দ্র-রচনাবলী

অষ্টাদশ খণ্ড

ঐচ্ছিক



52,228.

বিশ্বভারতী

২, বঙ্কিম চাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা



প্রকাশক—শ্রীপুণ্ডিনবিহারী সেন  
বিশ্বভারতী, ৬৩ বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—শ্রীষ্ম, ১৩৫১  
মূল্য ৪।০, ৬।০, ৭।০ ও ১০/-

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য  
প্রিন্ট প্রেস, ৩০ বর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

## সূচী

চিত্রসূচী	১৭০
কবিতা ও গান	
শেষ সপ্তক	১
সংযোজন	১০৫
নাটক ও প্রহসন	
শেষ বর্ষণ	১২৫
নটীর পূজা	১৪৫
নটরাজ	১৯১
উপন্যাস ও গল্প	
গল্পগুচ্ছ	২৫১
প্রবন্ধ	
সঞ্চয়	৩২৭
পরিচয়	৪২৩
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	৫৪৩
গ্রন্থ-পরিচয়	৫৬৭
বর্ণানুক্রমিক সূচী	৫৯৩



## চিত্রসূচী

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি	৩
ঘট ভরা	১১৫

কবিতা ও গান



# শেষ সপ্তক

# শেষ সপ্তক

এক

স্থির জেনেছিলাম, পেয়েছি তোমাকে,

মনেও হয়নি

তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা ।

তুমিও মূল্য করনি দাবি ।

দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,

দিলে ডালি উজাড় ক'রে ।

আড়চোখে চেয়ে

আনমনে নিলেম তা ভাঙারে ;

পরদিনে মনে রইল না ।

নববসন্তের মাধবী

যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,

শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়

আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে

“তোমাকে যা দিই

তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ;

আরো দেওয়া হল না

আরো যে আমার নেই ।”

বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে ।

আজ তুমি গেছ চলে,

দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,

তুমি আস না ।



## রবীন্দ্র-রচনাবলী

এতদিন পরে ভাঙার খুলে  
দেখছি তোমার রত্নমালা,  
নিয়েছি তুলে বুকে ।  
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন  
সে ছুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে  
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,  
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে ।

শান্তিনিকেতন

১ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

## তুই

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে  
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্তে  
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে  
দিলে তুমি দোলা ;  
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে  
একটি অমৃতরেখা ;  
আর কোনোদিন তার দেখা মেলেনি ।  
জোয়ারের তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল  
চিরদূর্লভের একটি রত্নকণা  
শতলক্ষ্য ঘটনার সমুদ্র-বেলায় ।

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে  
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা  
প্রাণের আধখোলা জালনায়  
দূর বনাস্থ থেকে  
পথ-চলতি গানে ।

অকৃতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়  
হৃদয়-তারে

যুষ্টিধারামুখর নির্জন প্রবাসে,  
সঙ্কায়ুখীর কল্পন স্নিগ্ধ গন্ধে,  
রোপে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক  
আপন অলিঙ্গিত উত্তরীরে স্পর্শ।

তার পরে মনে পড়ে  
একদিন সেই বিশ্বয়-উন্ননা নিমেষটিকে  
অকারণে অসময়ে ;  
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,  
যখন গোকচরা শস্তরিক্ত মাঠের দিকে  
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে ;  
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে  
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে  
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

### তিন

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন ;  
কৌতূহলী ভোরের আলো  
কুয়াশার আবরণ দিলে সরিয়ে।  
হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজা বাতাবি গাছে  
ধরেছে কচি পাতা ;  
সে যেন আপনি বিস্মিত  
একদিন তমসার কূলে বান্দীকি  
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে  
চকিত হয়েছিলেন নিজে,—  
তেমনি দেখলেম শুকে।



অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে  
 অরুণ-আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে  
 -এই কয়টি কিশলয় ;  
 সে যেন সেই একটুখানি কথা  
 যা তুমিই বলতে পারতে,  
 কিন্তু না বললে গিয়েছ চলে ।

সেদিন বসন্ত ছিল অনতিদূরে ;  
 তোমার আমার মাঝখানে ছিল  
 আধ-চেনার যবনিকা ;  
 কেঁপে উঠল সেটা মাঝে মাঝে ;  
 মাঝে মাঝে তার একটা কোণ গেল উড়ে ;  
 ছরস্তু হয়ে উঠল দক্ষিণ বাতাস,  
 তবু সরাতে পারেনি অস্তুরাল ।  
 উচ্ছ্বাস অবকাশ ঘটল না ;  
 ঘণ্টা গেল বেজে,  
 সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে ।

### চার

যৌবনের প্রাস্তসীমায়  
 জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার স্নান অবশেষ ;—  
 যাক কেটে এর আবেশটুকু ;  
 সূক্ষ্মপটের মধ্যে জেগে উঠুক  
 আমার ঘোর-ভাঙা চোখ,  
 স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত  
 দুঃখসুখের বাষ্পধনিমা  
 স'রে যাক সঙ্ক্যামেষের মতো  
 আপনাকে উপেক্ষা ক'রে ।

ঝরে-পড়া ফুলের ধনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,  
 চারদিকে তার স্বপ্ন মৌমাছি  
 গুন গুন করে বেড়ায়,  
 কোন্ অলঙ্কার সৌরভে ।

এই ছায়ায় বেড়ায় বন্ধ দিনগুলো থেকে  
 বেরিয়ে আশ্রুক মন  
 শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায় ।  
 অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক  
 কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন  
 সৃষ্টির মহাসাগরে ।

যাব লক্ষ্যহীন পথে,  
 সহজে দেখব সব দেখা,  
 শুনব সব সুর,  
 চলন্ত দিনরাত্রির  
 কলরোলের মাঝখান দিয়ে ।  
 আপনাকে মিলিয়ে নেব  
 শাস্ত্রশেষ প্রাস্তরের  
 সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে ।  
 ধ্যানকে নিবিষ্ট করব  
 ঐ নিশ্চল শালগাছের মধ্যে  
 যেখানে নিমেষের অস্তুরালে  
 সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,  
 চিল মিলিয়ে গেল যৌৱপাতুর সুদূর নীলিমায় ।  
 বিলের জলে বাঁধ বেঁধে  
 ডিঙি নিয়ে যাছ ধরছে জেলে ।  
 বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,  
 ফিকে রঙের নীলাধরের প্রাস্তে  
 বেগনি রঙের আঁচলা ।

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে

মাছধরা জালের উপরকার আকাশে ।

মাছরাঙা শুক্ক বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,

তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে ।

ভিজ্জে বাতাসে শ্রাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ ।

চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা

নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে ।

অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে

এই সহজ প্রবাহ,—

মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন

ভাঙনগড়নের উপর দিয়ে

এর নিত্য যাওয়া আসা ।

চঞ্চল বসন্তের অবসানে

আজ আমি অলস মনে

আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে ;

এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে

আমার রক্তের মৃত্তাঙ্গের ছন্দে ।

এর আলো ছায়ার উপর দিয়ে

ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা

চিন্তাহীন তর্কহীন শান্ত্রহীন

মৃত্যু-মহাসাগরসংগমে ।

## পাঁচ

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে ;

ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,

ঝোমাঝ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে ।

বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে

ধ্বন পায়ি তাকে আহ্বান করতে ।

কিছুকাল ছিলাম বিদেশে ।

সেখানকার প্রাণের ভাষা

আমার প্রাণের ভাষার সঙ্গে মেলেনি ।

তার অভ্যেসক হল না

আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে ।

সজল মেঘ-শ্রামলের

সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে

কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল ।

বনম্পতির অঙ্গের আয়ত্তি

ঐ তো দেয় বাড়িয়ে

বছরে বছরে ;

তার কাষ্ঠকলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে

তেমনি ক'রে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ

আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ

কিছু যোগ করে ।

প্রতিবার রঙের প্রলেপ লাগে

জীবনের পটভূমিকায়

নিবিড়তর ক'রে ;

বছরে বছরে শিল্পকারের

অঙ্গুলি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত

অঙ্কিত হয় অন্তর-কলকে ।

নিরালায় জানলার কাছে বসেছি যখন

নিকর্য প্রহরগুলো নিঃশব্দ চরণে

কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে ;

জীবনের গুপ্ত ধনের ভাণ্ডারে

পুঞ্জিত হয়েছে বিশ্বত মুহূর্তের সঞ্চয় ।

বহু বিচিত্রের কারুকলার চিত্রিত  
 এই আমার সমগ্র সত্তা  
 তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে  
 কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে  
 পরিপূর্ণ অব্যাহত হবে ?

তার সকল তপস্কায় সে চেয়েছে  
 গোচরতাকে ;  
 বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অক্ষুট তারা,  
 বলেছে, যেমন বলে নিশাস্তের অরুণ আভাস,—  
 “এস প্রকাশ, এস।”

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,  
 আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে  
 বধু যেমন সত্য ক’রে জানে আপনাকে,  
 সত্য ক’রে জানায়,  
 যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,  
 যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,  
 যখন দৈন্তকে দেয় সে মহিমা,  
 যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

ছয়

দিনের প্রান্তে এসেছি  
 গোধূলির ঘাটে।  
 পথে পথে পাত্র ভরেছি  
 অনেক কিছু দিয়ে।  
 ভেবেছিলেম চিরপথের পাথের সেগুলি ;  
 দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে।

অনেক করেছি সংগ্রহ মানুষের কথার হাতে,  
 কিছু করেছি সঞ্চয় প্রেমের সদাশ্রিতে ।  
 শেষে ভুলেছি সার্থকতার কথা,  
 অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোই হয়েছে অন্ধ অভ্যাসে বাধা ;  
 ফুটো কুলিটার শূন্য ভরাবার জন্যে  
 বিজ্ঞান ছিল না ।

আজ সামনে যখন দেখি  
 ফুরিয়ে এস পথ,  
 পাথরের অর্থ আর রইল না কিছুই ।  
 যে প্রদীপ জ্বলছিল মিলন-শস্যার পাশে  
 সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে করে ।  
 তার শিখা নিবল আজ,  
 সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে ।  
 সামনের আকাশে জ্বলবে একলা সন্ধ্যার তারা ।  
 যে বাঁশি বাজিয়েছি  
 ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,  
 তার শেষ সুরটি বেজে থামবে  
 রাতের শেষ গ্রহরে ।

তার পরে ?

যে জীবনে আলো নিবল,  
 সুর থামল,  
 সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই  
 ভরা সত্য ছিল,  
 সে-কথা একেবারেই ভুলবে জানি,  
 ভোলাই ভালো ।  
 তবু তার আগে কোনো একদিনের জন্যে  
 কেউ একজন  
 সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো  
 বসন্তের যে ফুল একদিন যেসেছি ভালো ।



আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে  
 শুকনো পাতা ঝরেছে,  
 সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,  
 বৃষ্টিধারায় আমকাঠালের ডালে ডালে  
 জেগেছে শব্দের শিহরণ,  
 সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল  
 জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল  
 চকিত পদে ।

এই সামান্য ছবিটুকু  
 আর সব কিছু থেকে বেছে নিয়ে  
 কেউ একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকে  
 কোনো একটি গোধুলির ধূসরমুহূর্তে ।

আর বেশি কিছু নয় ।  
 আমি আলোর প্রেমিক ;  
 প্রাণরক্তভূমিতে ছিলাম নীলি-বাজিরে ।  
 পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া  
 দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ।

যে পথিক অন্তঃস্বর্ষের  
 স্নায়মান আলোর পথ নিয়েছে  
 সে তো ধুলোর হাতে উজ্জাড় করে দিলে  
 সমস্ত আপনার দাবি ;  
 সেই ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে  
 রেখে যেয়ো না তোমার নৈবেদ্য ;  
 ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি,  
 যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,  
 যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে,  
 যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজছে ঘণ্টা  
 জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের  
 মিলের মাত্রা রেখে ।

সাত

অনেক হাজার বছরের  
 মরু-যবনিকার আচ্ছাদন  
 যখন উৎক্ষিপ্ত হল,  
 দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের  
 বিরাট কঙ্কাল ;—  
 ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে  
 ছিল তার জীবনক্ষেত্র ।  
 তার মুখরিত শতাব্দী  
 আপনার সমস্ত কবিগান  
 বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জন ।  
 আর, যে-সব গান তখনো ছিল অঙ্কুরে, ছিল মুকুলে,  
 যে বিপুল সম্ভাব্য  
 সেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন  
 অপ্রকাশ থেকে অপ্রকাশেই গেল মগ্ন হয়ে—  
 যা ছিল অপ্রজ্ঞল ধোঁওয়ার গোপন আচ্ছাদনে  
 তাও নিবল ।  
 যা বিকাল, আর যা বিকাল না,—  
 দুই-ই সংসারের হাট থেকে গেল চলে  
 একই মূল্যের ছাপ নিয়ে ।  
 কোথাও রইল না তার ক্ষত,  
 কোথাও বাজল না তার ক্ষতি ।

ঐ নির্মল নিঃশব্দ আকাশে

অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের

হয়েছে আবর্তন ।

নূতন নূতন বিশ্ব

অঙ্ককারের নাড়ি ছিঁড়ে

জন্ম নিয়েছে আলোকে,

ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের কেনপুঞ্জ ;  
 অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে  
 যেমন গেছে বর্ষণশাস্ত মেঘ,  
 যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ ।

মহাকাল, সম্যাসী তুমি ।  
 তোমার অন্তঃস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে  
 উচ্ছৃত হয়ে উঠছে সৃষ্টি  
 আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে ।  
 প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,  
 তারি নিস্তরক কেন্দ্রস্থলে  
 তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে  
 হে নির্ময়, দাঁও আমাকে তোমার ঐ সম্যাসের দীক্ষা ।  
 জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে  
 যেখানে আছে অক্ষুণ্ণ শাস্তি  
 সেই সৃষ্টি-হৌমায়িশিখার অন্তরতম  
 স্তিমিত নিভূতে  
 দাঁও আমাকে আশ্রয় ।

১৯ চৈত্র, ১৩৪১

### আট

মনে মনে দেখলুম  
 সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা  
 যা মুখর ইতিহাসকে নিষিদ্ধ রেখেছে  
 আপন তপস্তার আসন থেকে ।

দেখলেম দুর্গম গিরিঅঙ্গে  
 কোলাহলী কোতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে  
 অনূর্ধ্বস্পর্শ নিভূতে

ছবি আঁকছে গুণী  
 গুহাভিত্তির 'পরে,  
 যেমন অঙ্ককার পটে  
 সৃষ্টিকার আঁকছেন বিশ্বছবি ।

সেই ছবিতে ওরা আপন আনন্দকেই করেছে সত্য,  
 আপন পরিচয়কে করেছে উপেক্ষা,  
 দাম চায়নি বাইরের দিকে হাত পেতে,  
 নামকে দিয়েছে মুছে ।  
 হে অনামা, হে রূপের তাপস,  
 প্রণাম করি তোমাদের ।  
 নামের মারাবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি  
 তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্তিতে ।

নাম-ক্ষালন যে পবিত্র অঙ্ককারে ডুব দিয়ে  
 তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,  
 সেই অঙ্ককারের মহিমাকে  
 আমি আজ বন্দনা করি ।  
 তোমাদের নিঃশব্দ বাণী  
 রয়েছে এই গুহায়,  
 বলছে—নামের পূজার অর্ঘ্য,  
 ভাবীকালের খ্যাতি,  
 সে তো প্রেতের অন্ন ;  
 ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা ।  
 তার পিছনে ছুটে  
 সত্ত্ব বর্তমানের অন্নপূর্ণার  
 পরিবেষণ এড়িয়ে যেয়ো না, মোহাক ।

আজ আমার স্বাধের কাছে  
 শঙ্কনে গাছের পাতা গেল ঝরে,

ডালে ডালে দেখা দিয়েছে  
 কচি পাতার রৌমাঞ্চ ;  
 এখন প্রোঢ় বসন্তের পারের খেয়া  
 চৈত্রমাসের মধ্যশ্রোতে ;  
 মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়ার  
 গাছে গাছে দোলাতুলি ;  
 উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে  
 ধূসরের আভাস,  
 নানা পাখির কলকাকলিতে  
 বাতাসে আঁকছে শব্দের অক্ষুট আলপনা ।

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের শ্রোতে  
 আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;  
 তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে  
 কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো ।  
 অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি  
 সত্য মুহূর্তের দান,  
 এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ ।  
 যখন কোনোদিন গান করেছি রচনা,  
 সেও তো আপন অন্তরে  
 এইরকম পাতার হিল্লোল,  
 হাওয়ার চাঞ্চল্য,  
 রৌদ্রের ঝলক,  
 প্রকাশের হর্ষবেদনা ।  
 সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি,  
 গর-ঠিকানার পথিক ।  
 তার ষেটুকু সত্য  
 তা সেই মুহূর্তেই পূর্ণ হয়েছে,  
 তার বেশি আর বাড়বে না একটুও,  
 নামের পিঠে চড়ে ।

বর্তমানের দিগন্তপারে

যে-কাল আমার লক্ষ্যের অতীত

সেখানে অজানা অনাস্থীয় অসংখ্যের মাঝখানে

যখন ঠেলাঠেলি চলবে

লক্ষ লক্ষ নামে নামে,

তখন তারি সঙ্গে দৈবক্রমে চলতে থাকবে

বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার

আমারো নামটা,

ধিক থাক্ সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।

জীবনের অল্প কয়দিনে

বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ

দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি।

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি

যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন

বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,

প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

১।৪।৩৫

শাস্তিনিকেতন

নয়

ভালোবেসে মন বললে—

“আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।”

অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অভ্যুক্তি ;

দিতে পারবে কেন ?

সবটার নাগাল পাব কেমন করে ?

ও যে একটা মহাদেশ,

সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।

ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে

নির্বাক অনভিক্রমণীয়।



তার মাথা উঠেছে মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়,  
তার পা নেমেছে আধারে-ঢাকা গহ্বরে ।

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,  
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,  
ছরবীরের সন্ধান সেইটুকুতেই ।  
যাকে বলতে পারি আমার সবটা,  
তার নাম দেওয়া হয়নি,  
তার নকশা শেষ হবে কবে ?  
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার ?  
নামটা রয়েছে যে-পরিচয়টুকু নিয়ে,  
টুকরো-জোড়া দেওয়া তার রূপ,  
অনাবিষ্কৃতের প্রাপ্ত থেকে সংগ্রহ-করা ।

চারিদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার  
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ ।  
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে  
চিত্তভূমিতে ;  
হাওয়ায় লাগে লীল বসন্তের ছোওয়া ;  
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা  
কার কাছেই বা স্পষ্ট হল ?  
ভাষার অঞ্জলিতে  
কে ধরতে পারে তাকে ?  
জীবনভূমির এক প্রাপ্ত দৃঢ় হয়েছে  
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,  
আর এক প্রাপ্তে অচরিতার্থ সাধনা  
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,  
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি ।

এই ব্যক্তিভগৎ মানবলোকে দেখা দিল  
জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে ।

তার আলোকহীন প্রদেশে  
 বৃহৎ অগোচরতার পুঞ্জিত আছে  
 আত্মবিস্মৃত শক্তি,  
 মূল্য পার্শ্বনি এমন মহিমা,  
 অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির ভল্লায় ।  
 সেখানে আছে ভীকর লজ্জা,  
 প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,  
 অখ্যাত ইতিহাস,  
 আছে আত্মাভিমানের  
 ছদ্মবেশের বহু উপকরণ,—  
 সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা  
 অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা ।

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,  
 এ কার জন্মে, এ কিসের জন্মে ?  
 যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,  
 বহু বেদনায় বীধা হতে চলল যার ভাষা,  
 পৌছল না যা বাণীতে,  
 তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অভলে,  
 সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি ।

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;  
 ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুষ্ঠনে,  
 শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;  
 কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,  
 নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে ।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,  
 তাই আমাকে বেঁটন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা ।  
 তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;

অজ্ঞানার ঘরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,  
 কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,  
 সবাই রইল দূরে,—  
 যারা বললে “জানি”, তারা জানল না ।

২৭/৩/৩৫

শান্তিনিকেতন

দশ

মনে হয়েছিল আজ সব-কটা দুঃখ  
 চক্র ক’রে বসেছে দুর্ময়গায় ।  
 অদৃষ্ট জাল ফেলে অস্তরের শেষ তলা থেকে  
 টেনে টেনে তুলছে নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে ।  
 মনে হয়েছিল, অস্তহীন এই দুঃখ ;  
 মনে হয়েছিল, পশুহীন নৈরাশ্রের বাধায়  
 শেষ পর্যন্ত এমনি ক’রে  
 অঙ্ককার হাতড়িয়ে বেড়ানো ।  
 ভিতস্থক বাসা গেছে ডুবে,  
 ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে

এমন সময়ে সত্ত্ববর্তমানের  
 প্রাকার ডিড়িয়ে দৃষ্টি গেল  
 দূর অতীতের দিগন্তলীন  
 বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায় ।  
 যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়  
 ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে রক্তবীণায়  
 পুরাণখ্যাত কালের কোন্‌ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা ।

দুঃসহ দুঃখের স্মরণতত্ত্ব দিয়ে গাঁথা  
 সেই দারুণ কাহিনী ।

কোন দুর্দাম সর্বনাশের  
বহুখণ্ডনিত মৃত্যুমাতাল দিনের  
হুংকার,

যার আতঙ্কের কম্পনে  
ঝংকৃত করছে বীণাপানি  
আপন বীণার তীব্রতম তার ।

দেখতে পেলেম  
কতকালের দুঃখ লজ্জা গানি,  
কত যুগের জলধারা মর্মনিঃশ্রাব  
সংহত হয়েছে,  
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্তি  
অতীতের সৃষ্টিশালায় ।

আর তার বাইরে পড়ে আছে  
নির্বাপিত বেদনার পর্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি,  
জ্যোতিহীন বাক্যহীন অর্থশূন্য ।

এগারে।

ভোরের আলো-আধারে  
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক  
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতশবাজি ।  
হেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে  
একটু একটু সোনার লিখন নিয়ে ।

হাটের দিন,  
মাঠের মাঝখানকার পথে  
চলেছে গোরুর গাড়ি ।  
কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা,  
গ্রামের মেয়ে কাঁথের ঝুড়িতে নিয়েছে  
কচুশাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা ।

ছটা বাজল ইস্কুলের ঘড়িতে ।

ঐ ঘণ্টার শব্দ আর সকাল বেলাকার কাঁচা রোদ্দুরের রং  
মিলে গেছে আমার মনে ।

আমার ছোটো বাগানের পাটিলের গায়ে  
বসেছি চৌকি টেনে  
করবীগাছের তলায় ।

পূর্বদিক থেকে রোদ্দুরের ছটা  
বাঁকা ছায়া হানছে ঘাসের 'পরে ।

বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে  
পাশাপাশি দুটি নারকেলের শাখায় ।  
মনে হচ্ছে যমজ শিশুর কলরবের মতো ।  
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে  
চিকন সবুজের আড়ালে ।

চৈত্রমাস ঠেকল এসে শেষ হপ্তায় ।  
আকাশে ভাসা বসন্তের নৌকায়  
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে ।  
দূর্বাধাস উপবাসে লীর্ণ ;  
কাঁকর-ঢালা পথের ধারে  
বিলিতি মৌসুমি চারায়  
ফুলগুলি রং হারিয়ে সংকুচিত ।  
হাওয়া দিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে,—  
বিদেশী হাওয়া চৈত্রমাসের আঙিনাতে ।  
গায়ে দিতে হল আবরণ অনিচ্ছায় ।  
বাঁধানো জলকুণ্ডে জল উঠছে শিরশিরিয়ে,  
টলমল করছে নালগাছের পাতা,  
লাল মাছ কটা চঞ্চল হয়ে উঠল ।

নেবুধাস কাঁকড়া হয়ে উঠেছে  
বেলা-পাহাড়ের গায়ে ।

তার মধ্যে থেকে দেখা যায়  
 গেরুয়া পাখরের চতুর্মুখ মূর্তি ।  
 সে আছে প্রবহমান কালের দূর তীরে  
 উদাসীন ;  
 ঋতুর স্পর্শ লাগে না তার গায়ে ।  
 শিল্পের ভাষা তার,  
 গাছপালার বাণীর সঙ্গে কোনো মিল নেই ।  
 ধরণীর অন্তঃপুর থেকে যে শুক্রবা  
 দিনে রাতে সঞ্চারিত হচ্ছে  
 সমস্ত গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়,  
 ঐ মূর্তি সেই বৃহৎ আত্মীয়তার বাইরে ।  
 মানুষ আপন গৃহ বাক্য অনেক কাল আগে  
 যক্ষের মৃত ধনের মতো  
 ওর মধ্যে রেখেছে নিরুদ্ধ ক'রে,  
 প্রকৃতির বাণীর সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধ ।

সাতটা বাজল ঘড়িতে ।  
 ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে ।  
 সূর্য উঠল প্রাচীরের উপরে,  
 ছোটো হয়ে গেল গাছের মত ছায়া ।  
 খিড়কির দরজা দিয়ে  
 মেয়েটি ঢুকল বাগানে ।  
 পিঠে ঢুলছে ঝালরওআলা বেণী,  
 হাতে ককির ছড়ি ;  
 চরাতে এনেছে  
 একজোড়া রাজহাঁস,  
 আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে ।  
 হাঁস ছোটো দাম্পত্য দায়িত্বের মর্ষাদায় গভীর,  
 সকলের চেয়ে গুরুতর ঐ মেয়েটির দায়িত্ব

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

• জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান  
ছোট্ট ঐ মাতৃমনের মেহরসে ।

আজকের এই সকালটুকুকে  
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে ।

ও এসেছে অনায়াসে,  
অনায়াসেই যাবে চলে ।

যিনি দিলেন পাঠিয়ে  
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ ক'রে  
আপন আনন্দ-ভাণ্ডার থেকে ।

বারে।

কেউ চেনা নয়  
সব মানুষই অজানা ।

চলেছে আপনার রহস্তে  
আপনি একাকী ।  
সেখানে তার দোসর নেই ।

সংসারের ছাপমারা কাঠামোয়  
মানুষের সীমা দিই বানিয়ে ।  
সংসার বেড়া-দেওয়া বসতির মধ্যে  
বাঁধা মাইনের কাজ করে সে ।  
ধাকে সাধারণের চিহ্ন নিয়ে লগাটে ।

এমন সময় কোথা থেকে  
ভালোবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে,  
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,  
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা ।  
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বভাব, অপূর্ব, অসাধারণ,  
তার জুড়ি কেউ নেই ।



তার সঙ্গে যোগ দেবার বেলার  
 বাধতে হয় গানের সেতু,  
 ফুলের ভাষার করি তার অভির্থনা ।

চোপ বলে,  
 যা দেখলুম, তুমি আছ তাকে পেরিয়ে ।  
 মন বলে  
 চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্ত  
 তুমি এসেছ সেই অগমের দূত,—  
 রাত্রি যেমন আসে  
 পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অব্যবহিত ক'রে ।  
 তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যকার অচেনাকে,  
 তখন আপন অশ্রুভবের  
 তল ধুঁজে পাইনে,  
 সেই অশ্রুভব  
 “তিলে তিলে নূতন হোয় ।”

তেরো

রাস্তায় চলতে চলতে  
 বাউল এসে ধামল  
 তোমার সদর দরজায় ।  
 গাইল, “অচিন পাখি উড়ে আসে খাচায়” :  
 দেখে অবুঝ মন বলে—  
 অধরাকে ধরেছি ।

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে  
 দাঁড়িয়েছিলে জানলার ।  
 অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের  
 পল্লবে,  
 অধরা ছিল তোমার কঁকন-পরা নিটোল হাতের  
 মধুরিমায় ।

ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,

ও গেল চলে ;

জানলে না এইগানে তোমারই কথা ।

তুমি রাগিনীর মতো আস যাও

একতারার তারে তারে ।

সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাচা,

দোলে বসন্তের বাতাসে ।

তাকে বেড়াই বুকে ক'রে ;

ওতে রং লাগাই, ফুল কাটি

আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে ।

যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ ঘাই ভুলে,

কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য

অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,

খেলিয়ে যায় বনের সবুজে

মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে ।

অচিন পাখি তুমি,

মিলনের খাচায় থাক,

নানা সাজের খাচা ।

সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,

স্থকিত ওড়ার মধ্যে ।

তার ঠিকানা নেই,

তার অভিসার দিগন্তের পারে

সকল দৃশ্যের বিলীনতায় ।

চোদ্দো

কালো অঙ্ককারের তলার

পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে ।

বাতাস ধমধমে,

গাছের পাতা নড়ে না,

স্বচ্ছরাত্নের তারাগুলি

যেন নেমে আসছে

পুরাতন মহানিম গাছের

ঝিল্লি-ঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি ।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে

আমার হাত ধরলে চেপে ;

বললে, “তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই ।”

দীপহীন বাতায়নে

আমার মূর্তি ছিল অম্পট,

সেই ছায়ায় আবরণে

তোমার অন্তরতম আবেদনের

সংকোচ গিয়েছিল কেটে ।

সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী

ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায় ।

সেই মুহূর্তের আনন্দবেদনা

বেজে উঠল কালের বীণায়,

প্রসারিত হল আগামী অন্তর্যম্মানে ।

সেই মুহূর্তে আমার আমি

তোমার নিবিড় অভূতবের মধ্যে

পেল নিঃসীমতা ।

তোমার কল্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে

সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,

সে পেয়েছে অমৃত ।

তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে

তার সবচেয়ে অত্যন্ত ক’রে আছি আমি,

অত্যন্ত বেঁচে ।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু

সে গৌণ ।

এর বাইরে আছে মরণ,  
একদিন রূপের আলো-জালা রজমঞ্চ থেকে  
সরে যাবে নেপথ্যে ।

প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে  
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে  
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব ।  
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া  
যার তলায় ছুবেলা জল দাও আপন হাতে,  
সেও প্রধান হয়ে উঠে'  
তার ডালপালার বাইরে  
সরিয়ে রাখবে আমাকে  
বিশ্বের বিরাট অগোচরে ।  
তা হ'ক,  
এও গৌণ ।

### পনেরো

শ্রীমতী রানী দেবী কল্যাণীয়াহ

১

আমি বদল করেছি আমার বাসা ।  
ছুটিমাত্র ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ।  
ছোটো ঘরই আমার মনের মতো ।  
তার কারণ বলি তোমাকে ।

বড়ো ঘর বড়োর ভান করে মাত্র,  
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজায় ।  
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভান করে না ।  
অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তার নেই  
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো ।

আকাশের শব্দ ঘরে মেটাতে চাইনে ;  
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,  
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে ।

বেশ লাগছে ।

দূর আমার কাছেই এসেছে ।  
জালনার পাশেই বসে বসে ভাবি —  
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর ।  
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর ।  
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও  
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে  
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলাগা,  
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের ।

মনে পড়ে এক দিন মাঠ বেয়ে চলেছিলাম  
পালকিতে অপরাহ্নে ;  
কাহার ছিল আটকন ।  
তার মধ্যে একজনকে দেখলেম  
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্তি ;  
আপন কর্মের অপমানকে প্রতিপদে সে চলছিল পেরিয়ে  
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে পাখি যেমন যায় উড়ে ।  
দেবতা তার সৌন্দর্যে তাকে দিয়েছেন সুদূরতার সম্মান ।

এই দূর আকাশ সকল মানুষেরই অস্তুতম ;  
জানলা বন্ধ, দেখতে পাইনে ।  
বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তার প্রাচীর,  
যাকে চায় তাকে ক্লক করে কাছের বন্ধনে ।  
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,  
আগাছা যেমন কসলকে মারে চেপে ।

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি ।  
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা ;

দূরকে সাজাই নানা সাজে,  
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়  
সকালে সন্ধ্যায় ।

কিছু কাজ করি তাতে লাভ নেই, তাতে শোভ নেই,  
তাতে আমি নেই ।

যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি  
তাতে প্রতিমূহূর্তে আছে আমার মহাকাশ ।  
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, শুক নিঃশব্দ সুদূর,  
জীবনের চারদিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র ;  
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি ।

২

অন্য কথা পরে হবে ।  
গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি ।  
এতদিন খবর দিইনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব ।  
যেনন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি ।  
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে ।  
নিজেরই সংবাদ সে নিজে ।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,  
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,  
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে ।  
সে প্রতিকূপ নয় ।  
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়াভাড়া,  
কিছু বা তার ঘনিষে ওঠে ভাবে,  
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে ;  
এতদিন এই সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে ।

মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে,  
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারি খোঁজে ।

আজকাল আছে সে চোখ মেলে ।

রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তার বেরিয়ে পড়েছে, দেখবে ব'লে ।

সে ভাকায়, আর বলে, দেখলেম ।

সংসারটা আকারের মহাযাত্রা ।

কোন্ চির-জাগরুকের সামনে দিয়ে চলেছে,

তিনিও নীরবে বলছেন, দেখলেম ।

আদি যুগে রজমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,

“খোলো আবরণ ।”

বাণের যবনিকা গেল উঠে ,

রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে ;

ইন্ড্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন ।

তীর দেখা আর তীর সৃষ্টি একই ।

চিত্রকর তিনি ।

তীর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে ।

৮/৪/৩৫

শাস্তিনিকেতন

৩

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে

রেখার যাত্রী নিয়ে,

অঙ্ককারের ভূমিকায় তাদের কেবল

আকারের নৃত্য ;

নির্বাক অসীমের বাণী

বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অস্বহীন ইচ্ছিতে ।—

অমিতার আনন্দসম্পদ

ভালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে স্মৃতিতা,

সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,

গুণ রূপ, আলো দিগ্গজ গড়া ।

আজ আদিশ্রুতির প্রথম মুহূর্তের ধ্বনি

পৌছল আমার চিত্তে,—



যে ধ্বনি অনাদি রাত্রির যবনিকা সন্নিবেদিয়ে  
বলেছিল, “দেখো।”

এতকাল নিভুতে

আপনি যা বলেছি আপনি তাই শুনেছি,  
সেখান থেকে এলেন আর-এক নিভুতে,  
এখানে আপনি যা আঁকছি, দেখছি তাই আপনি।  
সমস্ত বিশ্ব জুড়ে দেবতার দেখবার আসন,  
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,  
রচনা করছি দেখা।

ষোলো

শ্রীযুক্ত সুধীলনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু

১

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।  
কথা ধনীঘরের মেয়ে,  
অর্থ আনে সঙ্গে করে,  
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।  
রেখা অপ্রগল্ভা, অর্থহীনা,  
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।  
গাছের শাখায় ফুল কোটানো কল ধরানো,  
সে কাজে আছে দায়িত্ব ;  
গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানো  
সে আর-এক কাণ্ড।  
সেইখানেই শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে,  
প্রজাপতি উড়তে থাকে,  
জোনাকি বিকমিক করে রাতের জ্বলা।  
বনের আসরে এরা সব রেখা-বাহন  
হাঙা চালের দল,  
কারো কাছে জবাবদিহি নেই।

কথা আমাকে প্রভ্রম দেয় না, তার কঠিন শাসন ;  
 রেখা আমার যথেষ্টাচারে হাসে,  
 ভর্জনী তোলে না ।

কাজকর্ম পড়ে থাকে, চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি,  
 ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রূপ-কল্যানোর অন্তরমহলে ।  
 এমনি করে, মনের মধ্যে  
 অনেকদিনের যে-লক্ষীছাড়া লুকিয়ে আছে  
 তার সাহস গেছে বেড়ে ।  
 সে আঁকছে, ভাবছে না সংসারের ভালোমন্দ,  
 গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দাপ্রশংসা ।

মনটা আছে আরামে ।  
 আমার ছবি-আঁকা কলমের মুখে  
 খ্যাতির লাগাম পড়েনি ।  
 নামটা আমার খুশির উপরে  
 সর্দারি করতে আসেনি এখনো,  
 ছবি-আঁকার বুক জুড়ে  
 আগেভাগে নিজের আসনটা বিছিয়ে বসেনি ;  
 ঠেলা দিয়ে দিয়ে বসছে না  
 “নাম রক্ষা ক’রো ।”

অথচ ঐ নামটা নিজের মোটা শরীর নিয়ে  
 স্বয়ং কোনো কাজই করে না ।  
 সব কীর্তির মুখ্য ভাগটা আদায় করবার জন্যে  
 দেউড়িতে বসিয়ে রাখে পেয়াদা ;  
 হাজার মনিবের পিণ্ড-পাকানো  
 করমাশটাকে বেদী বানিয়ে তুপাকার ক’রে রাখে  
 কাজের ঠিক সামনে ।

এখনো সেই নামটা অবজ্ঞা ক'রেই রয়েছে অদ্বন্দ্বিত :-

আমার তুলি আছে মুক্ত  
যেমন মুক্ত আজ ঋতুরাজের লেখনী ।

৭ এপ্রিল, ১৯৬৪

সতেরো

শ্রীমান ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কল্যাণীয়েশু

আমার কাছে শুনতে চেয়েছ  
গানের কথা ;

বলতে ভয় লাগে,  
তবু কিছু বলব ।

মানুষের জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে  
আপন সার্থক ভাষা ।

মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা,  
যেমন বোবা বিশ্বত্রস্তাণ্ড ।

সেই বিরাট বোবা  
আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে,  
ব্যাখ্যা করে না ।  
বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গি, আছে ছন্দ,  
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে ।

অগুণরমাণু অসীম দেশে কালে  
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,  
নাচছে সেই সীমার সীমার ;  
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ ।  
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ  
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা,  
ঘাসের ফুল থেকে গুচ্ছ ক'রে  
আকাশের তারা পর্যন্ত ।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাধা মানে না,  
 বাহন করতে চায় কথাকে,—  
 তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,  
 সেই কথাটা খোজে ভঙ্গি, খোজে ইশারা,  
 খোজে নাচ, খোজে সুর,  
 দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,  
 নিয়মকে দেয় বঁকা ক'রে।  
 মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে  
 তখন বিদ্যুচ্চকল পরমাণুপুঞ্জের মতোই  
 সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,  
 ভঙ্গি দেয় তাকে,  
 নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।  
 সেই সীমায়-বন্দী নাচন  
 পায় গানে-গড়া রূপ।  
 সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে  
 সৃষ্টির অন্তরমহলে,  
 সেখানে ষত রূপের নটী আছে  
 ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে  
 নূপুর-বাঁধা চাকল্যের  
 দোলযাত্রায়।

আমি যে জানি

এ-কথা যে-মানুষ জানায়  
 বাক্যে হ'ক সুরে হ'ক, রেখায় হ'ক,  
 সে পণ্ডিত।  
 আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,  
 রূপ দেখি,

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

এ-কথা যার প্রাণ বলে  
গান তারি জন্তে,  
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও  
তার নাড়িতে বাজে সুর ।

যদি সুযোগ পাও  
কথাটা নারদমুনিকে শুধিয়ে,  
ঝগড়া বাধাবার জন্তে নয়,  
তত্ত্বের পার পাবার জন্তে সংস্কার অতীতে ।

## আঠারো

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয়ের  
আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান ?  
আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও ।  
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও  
বহন করে না স্থায়ী সত্যকে—  
সাস্থ্য নেই এমন কথায় ;  
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহংকারে ।

জীবনটা আপন সকল সঞ্চয়  
ছড়িয়ে রাখে কালের চলাচলের পথে ;  
তার অবিরাম-ধাবিত চাকার তলায়  
গুরুতর বেদনার চিহ্নও যায়  
জীর্ণ হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে ।  
আমাদের প্রিয়তমের মৃত্যু  
একটিমাত্র দাবি করে আমাদের কাছে  
সে বলে—“মনে রেখো ।”

কিন্তু সংখ্যা নেই প্রাণের দাবির,  
তার আহ্বান আসে চারিদিক থেকেই  
মনের কাছে ;

সেই উপস্থিত কালের ভিড়ের মধ্যে  
অতীতকালের একটিমাত্র আবেদন  
কখন হয় অগোচর ।

যদি বা তার কথাটা থাকে  
তার ব্যথাটা যায় চলে ।  
তবু শোকের অভিমান  
জীবনকে চায় বঞ্চিত করতে ।  
স্পর্ধা করে প্রাণের দূতগুলিকে বলে—  
খুলব না দ্বার ।  
প্রাণের কসলখেল বিচিত্র শস্ত্র উর্বর,  
অভিমানী শোক তারি মাঝখানে  
ঘিরে রাখতে চায় শোকের দেবত্র জমি,—  
সাধের মরুভূমি বানায় সেখানটাতে,  
তার খাজনা দেয় না জীবনকে ।  
মৃত্যুর সঞ্চয়গুলি নিয়ে  
কালের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ ।  
সেই অভিযোগে তার হার হতে থাকে দিনে দিনে ।  
কিন্তু চায় না সে হার মানতে ;  
মনকে সমাধি দিতে চায়  
তার নিজস্ব কবরে ।

সকল অহংকারই বন্ধন,  
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার ।  
ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ,  
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে ।

## উনিশ

তখন বয়স ছিল কাঁচা ;  
 কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,  
 বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার,  
 জিন নেই, লাগাম নেই,  
 ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে  
 ভরসঙ্কোবেলায় ;  
 ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো  
 ধরনী ঘেন পিছু ডাকছে আঁচল হুলিয়ে ।  
 আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা  
 দূরে মাঠের সীমানায় দেখা যায়  
 একটিমাত্র ব্যগ্র বিরহী আলো একটি কোন্ ঘরে  
 নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায় ।

যে ছিল ভাবীকালে  
 আগে হতে মনের মধ্যে  
 ফিরছিল তারি আবছায়া,  
 যেমন ভাবী আলোর আভাস আসে  
 ভোরের প্রথম কোকিল-ডাকা অঙ্ককারে ।

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা,  
 আখ্যানা ।

তাই অপক্লপের রাঙা রংটা  
 মনের দিগন্ত রেখেছিলে রাঙিয়ে ;  
 আসন্ন ভালোবাসা

এনেছিল অঘটন-ঘটনার স্বপ্ন ।  
 তখন ভালোবাসার যে কল্পরূপ ছিল মনে  
 তার সঙ্গে মহাকাব্যযুগের  
 দুঃসাহসের আনন্দ ছিল মিলিত ।



এখন অনেক ধবর পেয়েছি জগতের,  
 মনে ঠাওরেছি  
 সংসারের অনেকটাই মার্কামারা ধবরের  
 মালখানা।

মনের রসনা থেকে  
 অজ্ঞানার স্বাদ গেছে মরে,  
 অজুতবে পাইনে  
 ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে .  
 নিয়তই অসম্ভব,  
 জ্ঞানার মধ্যে অজানা,  
 কথার মধ্যে রূপকথা।  
 ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,  
 যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,  
 সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,  
 যার অন্তে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।

### বিশ

সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা  
 আকাশের নিচে  
 রাঙামাটির পথের ধারে।  
 ঘাসের 'পরে বসেছে সবাই।  
 দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি,  
 দীর্ঘ, ঝুঁ, পুরাতন,—  
 শুক দাঁড়িয়ে,  
 শুকনবমীর মারাকে উপেক্ষা করে ;—  
 • দূরে কোকিলের ক্লাস্ত কাকলিতে বনম্পত্তি উদাসীন  
 ও যেন শিবের তপোবন-দ্বারের নন্দী,  
 দৃঢ় নির্মম ওর ইচ্ছিত।

সভার লোকেরা বললে,—

“একটা কিছু শোনাও, কবি,  
রাত গভীর হয়ে এস।”

খুলেমে খুঁথিখানা,  
ষত পড়ে দেখি

সংকোচ লাগে মনে।

এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর,  
এত ষত্বের ধন।

এদের কণ্ঠস্বর এত মৃদু,  
এত কুণ্ঠিত।

এরা সব অস্তঃপুরিকা,

রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের 'পরে ;  
তার উপরে ফুলকাটা পাড়,  
সোনার সূতোয়।

রাজহংসের গতি ওদের,  
মাটিতে চলতে বাধা।

প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীকু,  
বলেছে, বরবর্গিনী।

বন্দিণী ওরা বহু সম্মানে।

ওদের নূপুর ঝংকৃত হয় প্রাচীরঘেরা ঘরে,  
অনেক দামের আশ্রয়ে।

বাধা পায় তারা নৈপুণ্যের বন্ধনে।

এই পথের ধারের সভায়,

আসতে পারে তারাই

সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে,

খুলে ফেলেছে হাতের কঁকন

মুছে ফেলেছে সিঁদুর ;

যারা ফিরবে না ঘরের মায়ায়,

যারা তীর্থযাত্রী ;

যাদের অসংকোচ অক্লান্ত গতি,  
 ধূলিধূসর গায়ের বসন ;  
 যারা পথ খুঁজে পায় আকাশের তারা দেখে ;  
 কোনো দায় নেই যাদের  
 কারো মন জুগিয়ে চলবার ;  
 কত রৌদ্রতপ্ত দিনে  
 কত অঙ্ককার অর্ধরাত্রে  
 যাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে  
 অজানা মৈলগুহায়,—  
 জনহীন মাঠে,  
 পথহীন অরণ্যে ।  
 কোথা থেকে আনব তাদের  
 নিন্দা প্রশংসার ফাঁদে টেনে ।

উঠে দাঁড়ালেম আসন ছেড়ে ।  
 ওরা বললে, “কোথা যাও কবি ?”  
 আমি বললেম,—  
 “যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,  
 নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান ।”

### একুশ

নূতন করে  
 সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে  
 কালের সীমানা  
 আলোর বেড়া দিয়ে ।  
 সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি  
 অমৃত নিমৃত কোটি কোটি বংশরের মাপে ।  
 সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে  
 জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,  
 গণনায় শেষ করা যায় না ।

তারা কোন্ প্রথম প্রভাতের আলোকে  
কোন্ গুহা থেকে উড়ে বেরোল অসংখ্য,  
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে  
আকাশ থেকে আকাশে ।

অব্যক্তে তারা ছিল প্রচ্ছন্ন,  
ব্যক্তের মধ্যে ধৈর্যে এস  
মরণের ওড়া উড়তে ;—  
তারা জানে না কিসের জন্মে  
এই মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগ ।

কোন্ কেন্দ্রে জলছে সেই মহা আলোক  
যার মধ্যে কাঁপ দিয়ে পড়বার জন্মে  
হয়েছে উন্নতির মতো উৎসুক ।  
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনীর অচিন্ত্য রহস্যে  
একদিন আসবে কলসঙ্ক্যা,  
আলো আসবে স্নান হয়ে,  
ওড়ার বেগ হবে ক্লাস্ত  
পাখা যাবে থমে,  
লুপ্ত হবে ওরা  
চিরদিনের অদৃশ্য আলোকে ।

ধরার ভূমিকায় মানব-যুগের  
সীমা আঁকা হয়েছে  
ছোটো মাপে  
আলোক-আধারের পর্বায়ে  
নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির  
অগোচরে ।  
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে  
এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয় ।

বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে

ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল

আঁকা হচ্ছে মোছা হচ্ছে ।

বুধুদের মতো উঠল মহেন্দ্রজারো,

মক্কাবালুর সমুদ্রে, নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে ।

সুমেরিয়া, আসোরিয়া, ব্যাবিলন, মিসর,

দেখা দিল বিপুল বলে

কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া

ইতিহাসের রক্তস্রোতে,

কাঁচা কালির লিখনের মতো

লুপ্ত হয়ে গেল

অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে ।

তাদের আকাজ্ঞাগুলো ছুটেছিল পতঙ্গের মতো

অসীম দুর্লভ্যের দিকে ।

বীরেরা বলেছিল

অমর করবে সেই আকাজ্ঞার কীর্তিপ্রতিমা ;

তুলেছিল জয়স্তুতি ।

কবিরা বলেছিল, অমর করবে

সেই আকাজ্ঞার বেদনাকে,

রচেছিল মহাকবিতা ।

সেই মুহূর্তে মহাকাশের অগণ্য-ঘোজন পত্রপটে

লেখা হচ্ছিল

ধাবমান আলোকের জলদক্ষরে

সুদূর নক্ষত্রের

হোমহত্যার মন্ত্রবাণী ।

সেই বাণীর একটি একটি ধ্বনির

উচ্চারণ কালের মধ্যে

ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তুতি,

নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,  
বিলীন হয়েছে আত্মগোরবে স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস ।

আজ রাতে আমি সেই নক্ষত্রলোকের  
নিমেষহীন আলোর নিচে  
আমার লতাবিভানে বসে  
নমস্কার করি মহাকালকে ।

অমরতার আয়োজন  
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত  
খেলার সামগ্রীর মতো  
ধুলায় পড়ে বাতাসে যাক উড়ে ।  
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা  
মূর্ত্তগুলিকে,  
তার সীমা কে বিচার করবে ?  
তার অপরিমেয় সত্য  
অমৃত নিমৃত বৎসরের  
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে  
ধরে না ,  
কল্লাস্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে  
সৃষ্টির রক্তমঞ্চ দেবে অঙ্ককার করে  
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে  
কল্লাস্তরের প্রতীক্ষায় ।

### বাইশ

গুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,  
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,  
আমাতে মিলিয়ে আছে এক হয়ে ।  
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—  
পৃথক হব আমরা ।

ও এসেছে কতলক্ষ পূর্বপুরুষের  
 রক্তের প্রবাহ বেয়ে ;  
 কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা ;  
 সে সব বেদনা বহু দিনরাত্তিকে মথিত করেছে  
 সুদীর্ঘ ধারাবাহী অতীত কালে ;  
 তাই নিয়ে ও অধিকার করে বসল  
 নবজাত প্রাণের এই বাহনকে,  
 ঐ প্রাচীন, ঐ কাঙাল ।

আকাশবাণী আসে উর্ধ্বলোক হতে,  
 ওর কোলাহলে সে যায় আবিল হয়ে ।  
 নৈবেদ্য সাজাই পূজার থালায়,  
 ও হাত বাড়িয়ে নেয় নিজে ।

জীর্ণ করে ওকে দিনে দিনে পলে পলে,  
 বাসনার দহনে,  
 ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে  
 যে-আমি জরাহীন ।  
 মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,  
 তাই ওকে যখন মরণে ধরে  
 ভয় লাগে আমার  
 যে-আমি মৃত্যুহীন ।

আমি আজ পৃথক্ হব ।

ও থাক্ ঐ খানে দ্বারের বাহিরে,  
 ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুড়ুসু ।  
 ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক,  
 তালি দিক্ বসে বসে  
 ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে ;



অন্ময়রণের মাঝখানটাতে  
যে আল-বাধা খেতটুকু আছে  
সেইখানে করুক উৎসৃতি ।

আমি দেখব ওকে জানলায় বসে,  
ঐ দূরপথের পথিককে,  
দীর্ঘকাল ধরে যে এসেছে  
বহু দেহমনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে  
মৃত্যুর নানা খেয়া পার হয়ে ।

উপরের তলায় বসে দেখব ওকে  
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,  
আশা-নৈরাশ্রের ওঠা-পড়ায় সুখদুঃখের আলো আধারে ।  
দেখব যেমন করে পুতুলনাচ দেখে ;  
হাসব মনে মনে ।

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,  
নিত্যকালের আলো আমি,  
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,  
অকিঞ্চন আমি,  
আমার কোনো কিছুই নেই  
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা ।

### ভেইশ

আজ্জ শরভের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি  
মনে হয় এ ঘেন আমার প্রথম দেখা ।  
আমি দেখলেম নবীনকে,  
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ  
যার দর্শন হারিয়েছে ।

কল্পনা করছি,—

অনাগত যুগ থেকে

ভীষণাত্মী আমি

ভেসে এসেছি মস্তবলে ।

উজান স্বপ্নের স্রোতে

পৌছলেম এই মুহূর্তেই

বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে ।

কেবলি তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে ।

আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে,—

অন্যযুগের অজানা আমি

অভ্যন্তর পরিচয়ের পরপারে ।

তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতূহল

যার দিকে তাকাই

চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে

পুষ্পলয় ভ্রমরের মতো ।

আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে

সমস্তের মাঝে ।

জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে

যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,

যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর

তার সে জীব উত্তরীয় আজ গেল খসে ।

দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে ।

দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায় ।

যে বোবা আজ পর্বস্ত ভাষা পায়নি

জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত

আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন,

ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাজ্যের প্রান্তে

প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন ।

আমার এতকালের কাছের জগতে

আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক ।

তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে

দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য ।

সহমরণের বধু

বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পায়

মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে

নূতন চোখে

চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ ।

### চব্বিশ

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে

বাঁধব না আজ তোড়ায়,

রংবেরঙের স্মৃতিগুলো থাক্,

থাক্ পড়ে ঐ জরির ঝালর ।

শুনে ঘরের লোকে বলে,

“যদি না বাঁধ জড়িয়ে জড়িয়ে

ওদের ধরব কী করে,

ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে ?”

আমি বলি,

“আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,

ওদের উচ্ছ্বাসি অসংযত,

ওদের এলোমেলো হেলাদোলা

বকুলবনে অপরাহ্নে,

চৈত্রমাসের পড়ন্ত রোঁজে ।

আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,

শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি,

তাই নিয়ে খুলি থাকো ।”

বন্ধু বললে,

“এলেম তোমার ঘরে  
ডরা পেয়ালার তৃষ্ণা নিয়ে ।  
তুমি খাপার মতো বললে,  
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি  
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা ।  
আতিথ্যের ক্রটি ঘটান কেন ?”

আমি বলি, “চলো না ঝরনাতলায়,  
ধারা সেখানে ছুটছে আপন পেয়ালে,  
কোথাও মোটা, কোথাও সরু ।  
কোথাও পড়ছে শিখর থেকে শিখরে,  
কোথাও লুকোল গুহার মধ্যে ।  
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথর  
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্ষের মতো,  
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়  
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আড়লগুলো,  
কাকে ধরতে চায় ঐ জলের ঝিকঝিকির মধ্যে ?”

সভার লোকে বললে,

“এ যে তোমার আবাধা বেলীর বাণী,  
বন্দিনী সে গেল কোথায় ?”  
আমি বলি, “তাকে তুমি পারবে না আজ চিনতে,  
তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,  
চমক দিচ্ছে না চূনি-বসানো কঙ্কণে ।”  
ওরা বললে, “তবে মিছে কেন ?  
কী পাবে ওর কাছ থেকে ?”

আমি বলি, “যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে  
ডালে পালায় সব মিশিয়ে ।

পাতার ভিতর থেকে

তার রং দেখা যায় এখানে সেখানে,

গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপটার ।

চারদিকের খোলা বাতাসে

দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে ।

মূর্ত্তোর করে ধরবার জন্তে সে নয়,

তার অসাজানো আটপত্তরে পরিচয়কে

অনামক হয়ে মানবার জন্তে

তার আপন স্থানে ।”

পঁচিশ

পাঁচিলের এধারে

ফুলকাটা চিনের টবে

সাজানো গাছ সুষংঘত ।

ফুলের কেয়ারিতে

কাঁচিছাটা বেগনি গাছের পাড় ।

পাঁচিলের গায়ে গায়ে

বন্দী-করা লতা ।

এরা সব হাসে মধুর করে,

উচ্চহাস্ত নেই এখানে ;

হাওয়ায় করে দোলাছুলি

কিন্তু জায়গা নেই ছরস্তু নাচের ,

এরা আভিজাত্যের সূক্ষ্মাসনে বঁধা ।

বাগানটাকে দেখে মনে হয়

মোগল বাদশার জেনেনা,

রাজ-আদরে অলংকৃত,

কিন্তু পাহারা চারদিকে,

চরের দৃষ্টি আছে ব্যবহারের প্রতি ।

পাঁচিলের ওপারে দেখা যায়  
 একটি সুদীর্ঘ যুকলিপটাস  
 খাড়া উঠেছে উর্ধ্বে ।  
 পাশেই দুটি তিনটি সোনারুরি  
 প্রচুর পল্লবে প্রগল্ভ ।  
 নীল আকাশ অব্যাহত বিস্তার  
 ওদের মাথার উপরে ।

অনেকদিন দেখেছি অন্তমনে,  
 আজ হঠাৎ চোখে পড়ল  
 ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা,  
 দেবলোম, সৌন্দর্যের মর্যাদা  
 আপন মুক্তিতে ।  
 ওরা ভ্রাতা, আচারমুক্ত, ওরা সহজ ;  
 সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে  
 বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাধাবাধি ।

ওদের আছে মাথার দোলন  
 দীর্ঘ লয়ে ;  
 পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের ;  
 মর্মরধ্বনি হাওয়ার ছড়ানো ।

আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত ;  
 বললোম, “টবের কবিতাকে  
 রোপণ করব মাটিতে,  
 ওদের ভালপালা যথেষ্ট ছড়াতে দেব  
 বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে ।”

## ছাবিংশ

আকাশে চেয়ে দেখি

অবকাশের অস্ত নেই কোথাও।

দেশকালের সেই সুবিপুল আত্মকুলো

তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,

তাদের দ্রুতবিচুরিত আলোক-সংকেতে

তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কল্পমান।

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত ;

চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল ;

অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড করে

ভিড় করেছে তারা

উৎকণ্ঠ কোলাহলে।

সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,

সত্য পৌছয় না অশ্রুজ্বল বাণীতে।

প্রতিদিনের অভ্যস্ত কথার

মূল্য হল দীন ;

অর্থ গেল মুছে।

আমার ভাষা যেন

কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত

হেমস্তের বেলা,

তার সুর পড়েছে চাপা।

সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো

মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না-

“ভালোবাসি।”

সংকোচ লাগে কণ্ঠের কপণতায়।

তাই ওগো বনম্পতি,

তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,



জামছায়ায় সহজ করে নিতে চাই

আমার বাণী ।

দেখি চেয়ে, তোমার পল্লবস্তবক

অনায়াসে পার হয়েছে,

শাখাবাহের জটিলতা,

জয় করে নিয়েছে চারদিকে নিস্তরক অবকাশ ।

তোমার নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস সেই উদার পথে

উত্তীর্ণ হয়ে যায়

সূর্যোদয়-মহিমার মাঝে ।

সেই পথ দিয়ে দক্ষিণ বাতাসের স্রোতে

অনাদি প্রাণের মন্ত্র

তোমার নবকিসলয়ের মর্মে এসে মেলে—

বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র—

“ভালোবাসি ।”

বিপুল ঐশ্বর্য্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায়

সুদূরে ;

বর্তমান মুহূর্ত্তগুলিকে

অবলুপ্ত করে কালহীনতায় ।

যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু

জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে

আমার মুখের দিকে,—

চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়

সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে ।

উর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে

সৃষ্টির শাস্ত্রভাবনী—

“ভালোবাসি ।”

যেদিন যুগান্তের রাত্রি হল অবসান

আলোকের রশ্মিদূত

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিকোর্ণ করেছিল এই আদিমবাণী  
আকাশে আকাশে ।

সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে  
প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে  
তরঙ্গে তরঙ্গে ছুঁলেছিল এই মন্ত্র-বচন ।

এই বাণাই দিনে দিনে রচনা করেছে  
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা  
আমার বিরহ-গগনে  
অন্তঃসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে ।

আজ দিনান্তের অন্ধকারে  
এজন্মের ষত ভাবনা ষত বেদনা  
নিবিড় চেতনার সম্মিলিত হয়ে  
সঙ্ঘ্যাবেলায় একলা তারার মতো  
জীবনের শেষবাণীতে হ'ক উদ্ভাসিত-  
“ভালোবাসি ।”

### সাতাশ

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাধি  
স্বয়নাথার নিচে ।

বসে থাকি  
কোমরে আঁচল বেঁধে,  
সারা সকালবেলা,  
শেওলা-ঢাকা পিছল পাথরটাতে  
পা ঝুলিয়ে ।

এক নিমেষেই ঘট যায় শুয়ে  
তার পরে কেবলি তার কান্না ছাপিয়ে ওঠে,

জল পড়তে থাকে কেনিয়ে কেনিয়ে  
 বিনা কাজে বিনা স্বরায় ;

ঐ যে পূর্বের আলোয়  
 উপচে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা,  
 আমার খেলা ঐ সঙ্গেই ছলকে ওঠে  
 মনের ভিতর থেকে :

সবুজ বনের মিনে-করা  
 উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা,  
 তারি পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে  
 পড়ছে ঝরঝরানির শব্দ ।  
 ভোরের ঘুমে তার ডাক শুনতে পায়  
 গায়ের মেয়েরা ।

জলের ধ্বনি  
 বেগনি রঙের বনের সীমানা যায় পেরিয়ে,  
 নেমে যায় যেখানে ঐ বুনোপাড়ার মানুষ  
 হাট করতে আসে,  
 তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে  
 ঝাকে ঝাকে উঠতে থাকে চড়াই পথ বেয়ে,  
 তার বলদের গলায়  
 কুহুঝুঝু ঘণ্টা বাজে,  
 তার বলদের পিঠে  
 শুকনো কাঠের আঁটি বোঝাই-করা ।

এমনি করে  
 প্রথম প্রহর গেল কেটে ।

রাঙা ছিল সকালবেলাকার  
 নতুন রৌদ্রের রঙ,  
 উঠল সাদা হয়ে ।  
 বক উড়ে চলেছে পাহাড় পেরিয়ে  
 জলার দিকে,

শব্দচিল উড়ছে একলা

ঘন নীলের মধ্যে,

উর্ধ্বমুখ পর্বতের উধাও চিন্তে

নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো

বেলা হল,

ডাক পড়ল ঘরে ।

ওরা রাগ করে বললে,

“দেরি করলি কেন ?”

চুপ করে থাকি নিরুত্তরে ।

ঘট ভরতে দেরি হয় না

সে তো সবাই জানে ;

বিনাকাজে উপচে-পড়া-সময় খোঁওয়ানো,

তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে ?

### আটাশ

তুমি প্রভাতের শুকতারা

আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে -

কখনো বা তুমি দেখা দাও

গোধূলির দেহলিতে,

এই কথা বলে জ্যোতির্দীপ ।

সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে

রক্ত-অবগুণ্ঠনের নিচে

শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার আল

শাহানার সুরে ।

সকালবেলায় বিরহের আকাশে

শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে

ভৈরবীর তানে লাগাও

বৈরাগ্যের মূর্ছনা ।

সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে

চিরজীবন

সুখদুঃখের আলোর অঙ্ককারে

মনের মধ্যে দিয়েছ

আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।

যখন নিভৃতপুলকে রোমাঞ্চ লেগেছে মনে

গোপনে রেখেছ তার 'পরে

সুরলোকের সম্মতি,

ইচ্ছানীর মালার একটি পাপড়ি,

তোমাকে এমনি করেই জেনেছি

আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী।

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ;

বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে

তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,

তুমি মহিমাম্বিত ;

সুৰ্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে

তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,

রবিরশ্মিগণিত-দিনরত্নের মালা

ভুলছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে

তোমার নিগূঢ় জগদ্ব্যাপার

সেখানে তুমি স্বভদ্র, সেখানে সুদূর,

সেখানে লক্ষকোটিবৎসর

আপনার জনহীন রহস্তে তুমি অবগুপ্তিত।

আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে

কবিচিত্তে যখন আগিয়ে তুলেছ

নিঃশব্দ শান্তিবানী

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

সেই মুহূর্তেই

আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন

তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে

রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য।

তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে

আমাদের নিমজ্জন নেই,

আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।

হে পণ্ডিতের গ্রহ,

তুমি জ্যোতিষের সত্য

সে-কথা মানবই,

সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।

কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য

যেখানে তুমি আমাদেরি

আপন শুকতারা, সঙ্ক্যাতারা,

যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,

যেখানে আমাদের হেমস্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,

যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি,

যেখানে কালে কালে

প্রভাতে মানব-পথিককে

নিঃশব্দে সংকেত করেছ

জীবনযাত্রার পথের মুখে,

সঙ্ক্যায় ফিরে ডেকেছ

চরম বিশ্রামে।

## উনত্রিশ

অনেককালের একটিমাত্র দিন

কেমন করে বাধা পড়েছিল

একটা কোনো ছন্দে, কোনো গানে,

কোনো ছবিতে।

কালের দূত তাকে সরিয়ে রেখেছিল  
চলাচলের পথের বাইরে ।

যুগের ভাসান খেলার  
অনেক কিছু চলে গেল ঘাট পেরিয়ে,  
সে কখন ঠেকে গিয়েছিল বাকের মুখে  
কেউ জানতে পারেনি ।

মাঘের বনে  
আমের কত বোল ধরল,  
কত পড়ল ঝরে ;  
কান্ডনে ফুটল পলাশ,  
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে :  
চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্বের খেতে  
কবির লড়াই লাগল যেন  
মাঠে আর আকাশে ।  
আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে  
কোনো ঋতুর কোনো তুলির  
চিহ্ন লাগেনি ।

একদা ছিলাম ঐ দিনের মাঝখানেই ।  
দিনটা ছিল গা ছড়িয়ে  
নানা কিছুর মধ্যে ;  
তার। সমস্তই ঘেঁষে ছিল আশেপাশে সামনে ।  
তাদের দেখে গেছি সবটাই  
কিন্তু চোখে পড়েনি সমস্তটা ।  
ভালোবেসেছি,  
ভালো করে জানিনি  
কতখানি বেসেছি ।  
অনেক গেছে কেলাছড়া ;  
আনমনার রসের পেয়ালার  
বাকি ছিল কত ।



সেদিনের যে পরিচয় ছিল আমার মনে  
 আজ দেখি তার চেহারা অন্য ছাঁদের।  
 কত এলোমেলো, কত যেমন-তেমন  
 সব গেছে মিলিয়ে।  
 তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে  
 তাকে আজ দূরের পটে দেখছি যেন  
 সেদিনকার সে নববধূ।  
 তবু তার দেহলতা,  
 ধূপছায়া রঙের আঁচলটি  
 মাথায় উঠেছে খোপাটুকু ছাড়িয়ে।  
 ঠিকমতো সময়টি পাইনি  
 তাকে সব কথা বলবার,  
 অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন,  
 সে-সব বৃথা কথা।  
 হতে হতে বেলা গেছে চলে।

আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি,—  
 স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে  
 ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,  
 মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,  
 বলা হল না,—  
 ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,  
 ফেরার পথ নেই।

### ত্রিশ

যখন দেখা হল  
 তার সঙ্গে চোখে চোখে  
 তখন আমার প্রথম বয়েস ;  
 সে আমাকে শুধাল,  
 “তুমি খুঁজে বেড়াও কাকে ?”

আমি বললেম,

“বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে  
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কোতুকে,  
ভাসিয়ে দিলেন

পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে,  
যেখানে ভেসে বেড়ায়

ফুলের থেকে গন্ধ,  
বাশির থেকে ধ্বনি।

কিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে ;  
তার মৌমাছির পাখার বাজে  
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জন।”

তুনে সে রইল চূপ করে  
অশ্রু দিকে মুখ কিরিয়ে।

আমার মনে লাগল ব্যথা,  
বললেম, “কী ভাবছ তুমি?”

ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে,—  
“কেমন করে জানবে তাকে পেলে কিনা,  
তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে  
একটিমাত্রকে।”

আমি বললেম,

“আমি যে খুঁজে বেড়াই  
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের  
সবচেয়ে গোপন কথা ;  
ও-কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে  
যার আপন বেদনার,  
আমি জানি  
আমার গোপন মিল আছে তারি ভিতর।”  
কোনো কথা সে বলল না।

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

কচি শ্রামল তার রঙটি;  
 গলায় সৰু সোনার হারগাছি,  
 শরতের মেঘে লেগেছে  
 ক্ষীণ রোদের রেখা।

চোখে ছিল  
 একটা দিশাহারা ভয়ের চমক  
 পাছে কেউ পালায় তাকে না বলে  
 তার ছুটি পায়ে ছিল বিধা,  
 ঠাহর পায়নি  
 কোন্‌খানে সীমা  
 তার আড়িনাতে।

দেখা হল।

সংসারে আনাগোনার পথের পাশে  
 আমার প্রতীক্ষা ছিল  
 শুধু ঐটুকু নিয়ে।  
 তার পরে সে চলে গেছে।

## একত্রিশ

পাড়ায় আছে ক্লাব,  
 আমার একতলার ঘরখানা  
 দিয়েছি ওদের ছেড়ে।  
 কাগজে পেরেছি প্রশংসাবাদ,  
 ওরা মীটিং করে আমাকে পরিবেশে মালা।

আজ আট বছর থেকে  
 শূন্য আমার ঘর।  
 আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি  
 সেই ঘরের একটা ভাগে

টেবিলে পা তুলে

কেউ পড়ছে ধবরের কাগজ,

কেউ খেলছে তাস,

কেউ করছে তুমুল ডর্ক ।

তামাকের ধোঁয়ার

ধনিরে ওঠে বন্ধ হাওয়া,

ছাইদানিতে জমতে থাকে,

ছাই, দেশলাইকাঠি,

পোড়া সিগারেটের টুকরো ।

এই প্রচুর পরিমাণ ঘোলা আলাপের

গোলমাল দিয়ে

দিনের পর দিন

আমার সজ্জার শূন্যতা দিই ভরে ।

আবার রাত্তির দশটার পরে

খালি হয়ে যায়

উপুড়-করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ ।

বাইরে থেকে আসে ট্রামের শব্দ,

কোনোদিন আপন মনে শুনি

গ্রামোফোনের গান,

যে কয়টা রেকর্ড আছে

ঘুরে ফিরে তারি আবৃত্তি ।

আজ ওরা কেউ আসে নি ;

গেছে ছাবড়া স্টেশনে

অভ্যর্থনার ;

কে সচ্চ এনেছে

সমুদ্রপারের হাতভালি

আপন নামটার সঙ্গে বেঁধে ।

নিবিড়ে দিবেছি বাতি ।

যাকে বলে 'আজকাল'

অনেকদিন পরে

সেই আজকালটা, সেই প্রতিদিনের নকীব  
আজ নেই সন্ধ্যায় আমার ঘরে ।

আটবছর আগে

এখানে ছিল হাওয়ার-ছড়ানো যে স্পর্শ,

চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,

তারি একটা বেদনা লাগল

ঘরের সব কিছুতেই ।

যেন কী শুনব বলে

রইল কান পাতা ;

সেই ফুলকাটা ঢাকাওআল্লা

পুরোনো খালি চৌকিটা

যেন পেয়েছে কার খবর ।

পিতামহের আমলের

পুরোনো মুচকুন্দ গাছ

দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে

রুম রাতের অন্ধকারে ।

রাস্তার ওপারের বাড়ি

আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু আকাশ আছে

সেখানে দেখা যায়

জলজল করছে একটি তারা ।

তাকিয়ে রইলেম তার দিকে চেয়ে,

টনটন করে বুকের ভিতরটা ।-

যুগল জীবনের জোয়ার জলে

কত সন্ধ্যায় তুলেছে ঐ তারার ছায়া ।

অনেক কথার মধ্যে

মনে পড়েছে ছোট্ট একটি কথা ।

সেদিন সকালে

কাগজ পড়া হয়নি কাজের ভিড়ে ;

সন্ধ্যাবেলায় সেটা নিয়ে

বসেছি এই ঘরেতেই,

এই জানলার পাশে

এই কেদারায় ।

চুপি চুপি সে এল পিছনে

কাগজখানা দ্রুত কেড়ে নিল হাত থেকে ।

চলল কাড়াকাড়ি

উচ্চ হাসির কলরোলে ।

উদ্ধার করলুম লুপ্তের জিনিস,

স্পর্ধা করে আবার বসলুম পড়তে ।

হঠাৎ সে নিবিয়ে দিল আলো ।

আমার সেদিনকার

সেই হার-মানা অঙ্ককার

আজ আমাকে সর্বান্তে ধরেছে ঘিরে,

যেমন করে সে আমাকে ঘিরেছিল

দুয়ো-দেওয়া নীরব হাসিতে ভরা

বিজয়ী তার দুই বাহু দিয়ে,

সেদিনকার সেই আলো-নেবা নির্জনে ।

হঠাৎ ঝরঝরিয়ে উঠল হাওয়া

গাছের ডালে ডালে,

জানলাটা উঠল শব্দ করে,

দরজার কাছে পর্দাটা

উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থির হয়ে ।

আমি বলে উঠলেম,

“ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি

মরণলোক থেকে

তোমার বাদামি রঙের পাড়িখানি পরে ?”

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

একটা নিঃশ্বাস লাগল আমার গায়ে,

শুনলেম অশ্রুতবাণী,

“কার কাছে আসব ?”

আমি বললেম,

“দেখতে কি পেলো না আমাকে ?”

শুনলেম,

“পৃথিবীতে এসে

যাকে জেনেছিলেম একান্তই,

সেই আমার চিরকিশোর বঁধু

তাকে তো আর পাইনে দেখতে

এই ঘরে ।”

শুধালেম, “সে কি নেই কোথাও ?”

মৃদু শাস্ত্রসূত্রে বললে,

“সে আছে সেইখানেই

যেখানে আছি আমি ।

আর কোথাও না ।”

দরজার কাছে শুনলেম উত্তেজিত কলরব,

হাবড়া স্টেশন থেকে

ওরা ফিরেছে ।

## বত্রিশ

পিলসুজের উপর পিভলের প্রদীপ,

খড়কে দিলে উসকে দিলে থেকে থেকে ।

হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা

পঙ্খের কাজ-করা মেজে ;

তার উপরে খান-দুয়েক মাদুর পাতা ।

ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে

মিটমিটে আলোয় ।

বুড়ো মোহন সর্দার

কলপ-লাগানো চুল বাবরি-করা,  
 মিশকালো রং,  
 চোখ দুটো ঘেন বেরিয়ে আসছে,  
 শিথিল হয়েছে মাংস,  
 হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,  
 কণ্ঠস্বর সঙ্ক-মোটায় ভাঙা ।  
 রোমাঞ্চ লাগবার মতো তার পূর্ব-ইতিহাস ।  
 বসেছে আমাদের মাঝখানে,  
 বলছে রোঘো ডাকাতের কথা ।  
 আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি ।  
 দক্ষিণের হাওয়া-লাগা ঝাউড়ালের মতো  
 ছলছে মনের ভিতরটা ।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,  
 একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি  
 দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো ।  
 পথের নী ধারটাতে জমেছে ছায়া ।  
 গলির মোড়ে সদর রাস্তায়  
 বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী ।  
 পালের বাড়ি থেকে  
 কুকুর ডেকে উঠল অকারণে ।  
 নটার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে ।

অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিত্রকথা ।

ভস্মরত্নের ছেলের পৈতে,  
 রোঘো বলে পাঠাল চরের মুখে,  
 “নমো নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর,  
 ভেবো না খরচের কথা ।”  
 মোড়লের কাছে পত্র দেয়  
 পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে ব্রাহ্মণের অন্তে ।



## রবীন্দ্র-রচনাবলী

রাজার খাজনা-বাকির দায়ে

বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে,

ইঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে

দেনা শোধ ক'রে দেয় রঘু।

বলে—“অনেক গরিবকে দিয়েছ ফাঁকি,

কিছু হালকা হ'ক তার বোঝা।”

একদিন তখন মাঝরাাত্রি,

কিরছে রোঘো লুঠের মাল নিয়ে,

নদীতে তার ছিপের নৌকো

অঙ্ককারে বটের ছায়ায়।

পথের মধ্যে শোনে—

পাড়ায় বিয়েবাড়িতে কান্নার শ্বনি,

বর কিরে চলেছে বচসা করে ;

কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।

এমন সময় পথের ধারে

ঘন বাঁশ বনের ভিতর থেকে

হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে।

আকাশের তারাগুলো

যেন উঠল ধরধরিয়ে।

সবাই জানে রোঘো ডাকাতির

পাঁজর-কাটানো ডাক।

বরসুদ পালকি পড়ল পথের মধ্যে ;

বেহারী পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।

ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা

অঙ্ককারের মধ্যে উঠল তার কান্না—

“দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।”

রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—

পালকি থেকে টেনে বের করলে বরকে,

বরকর্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,  
পড়ল সে মাথা ঘুরে ।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁখ উঠল বেজে,  
জাগল হলুধনি ;  
দলবল নিয়ে রোষো দাঁড়াল সভায়,  
শিবের বিয়ের রাতে ভৃত্যপ্রভের দল যেন ।  
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেলমাখা সর্বাঙ্গে,  
মুখে ভুসোর কালি ।

বিয়ে হল সারা ।

তিন প্রহর রাতে  
ঘাবার সময় কনেকে বললে ডাকাতি  
“তুমি আমার মা,  
দুঃখ যদি পাও কখনো  
স্মরণ করো রঘুকে ।”

তারপরে এসেছে যুগান্তর ।  
বিছাভের প্রগর আলোতে  
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে  
পড়ে ডাকাতির খবর ।  
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধ্যাবেলাগুলো  
সংসার থেকে গেল চলে,  
আমাদের স্মৃতি  
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে ।

### তেরিংশ

বাদশাহের হুকুম,—  
সৈন্যদল নিয়ে এল আক্রাসায়ের খাঁ, মুজফ্ফর খাঁ,  
মহম্মদ আমিন খাঁ,  
সঙ্গে এল রাজা গোপাল সিং ভদৌরিয়া,  
উদইং সিং বৃন্দলা ।

গুরুদাসপুর ঘেরাই করল মোগল সেনা ।

শিখদল আছে কেজার মধ্যে,

বন্দা সিং তাদের সর্দার ।

ভিতরে আসে না রসদ,

বাইরে যাবার পথ সব বন্ধ ।

থেকে থেকে কামানের গোলা পড়ছে

প্রাকার ভিড়িয়ে,—

চারদিকের দিকসীমা পৰ্ব্বস্ত

রাত্রির আকাশ মশালের আলোয় রক্তবর্ণ ।

ভাগ্যে না রইল গম, না রইল যব,

না রইল জোয়ারি ;—

জালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে ।

কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,

কেউ বা খায় নিজের জন্তা থেকে মাংস কেটে ।

গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে

তাই দিয়ে বানায় রুটি ।

নরক-যন্ত্রণায় কাটল আট মাস,

মোগলের হাতে পড়ল

গুরুদাসপুর গড় ।

মৃত্যুর আসর বসে হল আকণ্ঠ পঙ্কিল,

বন্দীরা চোংকার করে

“ওয়াহি গুরু, ওয়াহি গুরু,”

আর শিখের মাথা স্থলিত হয়ে পড়ে

দিনের পর দিন ।

নেহাল সিং বালক ;

স্বচ্ছ ভরণ সোম্যমুখে

অস্তরের দীপ্তি পড়েছে ফুটে ।

চোখে যেন স্তব্ধ আছে  
 সকালবেলার তীর্থযাত্রীর গান ।  
 সুকুমার উজ্জল দেহ,  
 দেবশিল্পী কুঁদে বের করেছে  
 বিছাভের বাটালি দিয়ে ।  
 বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে,  
 শালগাছের চারা,  
 উঠেছে ঋতু হয়ে,  
 তবু এখনো  
 হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায় ।  
 প্রাণের অজস্রতা  
 দেহে মনে রয়েছে  
 কানায় কানায় ভরা ।

ঘেঁষে আনলে তাকে ।  
 সত্যার সমস্ত চোখ  
 ওর মুখে তাকাল বিশ্বরে ককণায় ।  
 ক্ষণেকের অন্তে  
 ঘাতকের খড়্গ যেন চায় বিমুখ হতে  
 এমন সময় রাজধানী থেকে এল দূত,  
 হাতে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁয়ের  
 স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র ।

যখন খুলে দিলে তার হাতের বন্ধন;  
 বালক শুধাল, আমার প্রতি কেন এই বিচার ?  
 সুনল, বিধবা মা আনিয়েছে  
 শিশুধর্ম নয় তার ছেলের,  
 বলছে, শিখেরা তাকে জোর করে রেখেছিল  
 বন্দী করে ।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হল

বালকের মুখ ।

বলে উঠল, “চাইনে প্রাণ মিথ্যার কুপায়,

সত্যে আমার শেষ মুক্তি,

আমি শিখ ।”

### চৌত্রিশ

পথিক আমি ।

পথ চলতে চলতে দেখেছি

পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব ।

দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের

অবমানিত ভগ্নশেষ,

তার বিজয় নিশান

বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো

গেছে উড়ে ;

বিরাট অহংকার

হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধূলায় প্রণত,

সেই ধুলার 'পরে সন্ধ্যাবেলায়

ভিক্ষুক তার জীর্ণ কাঁধা মেলে বসে,

পথিকের শ্রান্ত পদ

সেই ধূলায় ফেলে চিহ্ন,—

অসংখ্যের নিত্য পদপাতে

সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে ।

দেখেছি স্তম্ভর যুগান্তর

বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,

যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে

কোন মহাতরী

হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,

সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে  
অসুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে  
অসীমের স্তব্ধতা ।

### পঁয়ত্রিশ

অন্ধের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ  
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়  
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,  
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য ।  
—যে কথা দেহের অতীত ।

খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী  
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,  
তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্য-মর্মর,  
আছে করুণ বিস্মৃতি ।

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি—  
এ তো কেবলি দেখার জাল-বোনা নয় ।—  
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষে  
দেশ-পারানো কোন্ দেশের দিকে,  
দিগন্তের ইঙ্গিতলীন  
কোন্ করলোকের অদৃষ্ট সংকেতে ।

দীর্ঘপথ ভালোমনের বিকীর্ণ,  
রাত্রিদিনের যাত্রা হৃৎস্পন্দনের বজুর পথে ।  
শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য ?  
ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান,  
তার সত্য মিলাবে কোন্‌খানে ?

মাটির তলায় স্তূপ আছে বীজ ।

তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,

মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা ।

অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন ।

স্বপ্নেই কি তার শেষ ?

উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ ;

আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই ?

ছত্রিশ.

শীতের রোদুর ।

সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ

স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে ।

বেগনি-ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা

ঝুরি-নামা বৃদ্ধ বট

ডাল মেলেছে রাস্তার ওপার পৰ্বন্ত ।

কলসাগাছের ঝরা পাতা

হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে

ধুলোর সাঙাত হয়ে ।

কাজ-ভোলা এই দিন

উধাও বলাকার মতো

লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায় ।

ঝাউগাছের মর্মরধ্বনিতে মিশে,

মনের মধ্যে এই কথাটি উঠছে বেজে,

“আমি আছি ।”

কুয়োতলার কাছে

সামান্য ঐ আমের গাছ ;

সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্মৃত,

বনের সাধারণ সবুজের আবরণে

ও থাকে ঢাকা ।

এমন সময় মাঘের শেষে  
 হঠাৎ মাটির নিচে  
 শিকড়ে শিকড়ে তার শিহর লাগে,  
 শাখায় শাখায় মুকুণ্ডিত হয়ে ওঠে বাণী—  
 “আমি আছি,”  
 চন্দ্রসূর্যের আলো আপন ভাষায়  
 স্বীকার করে তার সেই ভাষা ।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে  
 হাসেন অন্তর্যামী,  
 হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি  
 প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,  
 কবির গানের সুর দিয়ে  
 ভখন যে-আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির  
 মধ্যে মিলিয়ে ছিল,  
 সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে ।  
 সে-সব ছুমূল্য নিমেষ  
 কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানিনে ;  
 এইটুকু জানি—  
 তারা এসেছে আমার আত্মবিশ্বতির মধ্যে,  
 জাগিয়েছে আমার মর্মে  
 বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী  
 “আমি আছি ।”

### সাঁইত্রিশ

বিশ্বলক্ষী,  
 তুমি একদিন বৈশাখে  
 বসেছিলে দাক্ষণ ডপস্টায়  
 ক্ষত্রেয় চরণতলে ।



তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ,  
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ ।

দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে  
দুঃখেরি দহনে,  
শুষ্ককে জালিয়ে ভস্ম করে দিলে  
পূজার পুণ্যধূপে ।  
কালোকে আলো করলে,  
তেজ দিলে নিশ্চেষ্টকে,  
ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হল  
ত্যাগের হোমায়িত্তে ।

দিগন্তে রুদ্ধের প্রসন্নতা

ঘোষণা করলে মেঘগর্জনে,  
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ  
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে ।  
মরুবক্ষে তৃণরাজি  
শ্রাম আন্তরগ দিল পেতে,  
সুন্দরের করুণ চরণ  
নেমে এল তার 'পরে ।

### আটত্রিশ

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের  
বন্ধ ছিল আপনাতাই  
পদ্যকুঁড়ির মতো ।

সেদিন সংকীর্ণ সংসারে

একান্তে ছিল তোমার প্রেমসী  
যুগলের নির্জন উৎসবে,  
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,  
প্রাণের মেঘমালা

যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে  
আপনারি আলিঙ্গনের  
আচ্ছাদনে ।

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল,  
বর হয়ে,  
কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে ।  
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা  
পাপড়িগুলি,  
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল  
বিশ্বের মাঝখানে ।  
বৃষ্টির জলে ভিজে' সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই  
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি ।  
রেণুর ভারে মধুর বাতাস  
তাকে জানিয়ে দিল  
নীপ-নিকুঞ্জের আকৃতি ।

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের  
দীক্ষা পেলে তুমি ;  
নিজের অস্তর-আঙিনায়  
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি  
স্বর্গীয় গরিমায় কাস্তিমতী ।  
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী  
তার রসরূপটিকে আসন দিলে  
অনন্তের আনন্দমন্দিরে  
ছন্দেব শব্দ বাজিয়ে ।

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,  
আজ তুমি হয়েছ কবি,  
ধ্যানোন্মত্তা প্রিয়া

বন্ধ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মভলে  
 বিরহের বীণা হাতে ।  
 আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি  
 বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা

### উনচল্লিশ

ওরা এসে আমাকে বলে,  
 কবি, মৃত্যুর কথা শুনে চাই তোমার মুখে ।  
 আমি বলি,  
 মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,  
 জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু ।  
 তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,  
 আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ ।  
 বলছে সে,—চলো চলো,  
 চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,  
 চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে  
 আমারি টানে, আমারি বেগে ।  
 বলছে, চূপ করে বস যদি  
 যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধরে  
 তবে দেখবে, তোমার জগতে  
 ফুল গেল বাসি হয়ে,  
 পাক দেখা দিল শুকনো নদীতে,  
 স্নান হল তোমার তারার আলো ।  
 বলছে, “থেমো না, থেমো না,  
 পিছনে কিরে তাকিয়ো না,  
 পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে ক্লান্তকে অচলকে ।  
 “আমি মৃত্যু-রাখাল  
 সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি  
 যুগ হতে যুগান্তরে  
 নব নব চারণ-ক্ষেত্রে ।

“বধন বইল জীবনের ধারা

আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,

দিইনি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে ।

তীরের বাধন কাটিয়ে কাটিয়ে

ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,

সে সমুদ্র আমিই ।

“বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে ।

সে চাপাতে চায়

তার সব বোঝা তোমার মাথায়,

বর্তমান গিলে ফেলতে চায়

তোমার সব-কিছু আপন জঁঠরে ।

তার পরে অবিচল থাকতে চায়

আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো .

জাগরণহীন নিদ্রায় ।

তাকেই বলে প্রলয় ।

এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে

আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি,

অন্তহীন নব নব অনাগতে ।”

### চল্লিশ

পরি জ্ঞা বা পৃথিবী সত্ত্ব আরম্

উপাতিষ্ঠে প্রথমজাতস্ত ।

—অথর্ববেদ

ঋষি কবি বলেছেন—

ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,

শেষকালে এসে দাঁড়ালেন

প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে ।

কে এই প্রথমজাত অমৃত,  
 কী নাম দেব তাকে ?  
 তাকেই বলি নবীন,  
 সে নিত্যকালের ।

কত জরা কত মৃত্যু  
 বারে বারে ঘিরল তাকে চারদিকে,  
 সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে  
 বারে বারে সে বেরিয়ে এল,  
 প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে  
 ধ্বনিত হল তার বাণী—  
 “এই আমি প্রথমজাত অমৃত ।”

দিন এগোতে থাকে,  
 তপ্ত হয়ে ওঠে বাতাস,  
 আকাশ আবিল হয়ে ওঠে ধুলোয়,  
 বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল  
 আবর্তিত হতে থাকে  
 দূর হতে দূরে ।

কখন দিন আসে আপন শেষপ্রান্তে,  
 ধেমে যায় তাপ,  
 নেমে যায় ধুলো,  
 শান্ত হয় কর্কশ কণ্ঠের পরিণামহীন বচসা,  
 আলোর যবনিকা সরে যায়  
 দিক্‌সীমার অন্তরালে ।

অস্তহীন নক্ষত্রলোকে,  
 মানিহীন অন্ধকারে

জেগে ওঠে বাণী—  
 “এই আমি প্রথমজাত অমৃত ।”

শতাব্দীর পর শতাব্দী

আপনাকে ঘোষণা করে

মানুষের তপস্শায় ;

সে-তপস্শা

ক্লান্ত হয়,

হোমায়ি যায় নিবে,

মজ্জ হয় অর্থহীন,

জীর্ণ সাধনার শতছিন্ন মলিন আচ্ছাদন

ত্রিয়মাণ শতাব্দীকে কেসে ঢেকে ।

অবশেষে কখন

শেষ সূর্যাস্তের তোরণদ্বারে

নিঃশব্দচরণে আসে

যুগাস্তের রাত্রি,

অন্ধকারে জপ করে শাস্তিমন্ত্র

শবাসনে সাধকের মতো ।

বহুবর্ষব্যাপী প্রহর যায় চলে,

নবযুগের প্রভাত

শুভ্র শব্দ হাতে

দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,

দেখা যায়,

তিমিরধারায় ক্ষালন করেছে কে

ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জনা ;

ব্যাপ্ত হয়েছে অপরিসীম ক্ষমা

অস্তহিত অপরাধের

কলকচিহ্নের 'পরে ।

পেতেছে শাস্ত জ্যোতির আসন

প্রথমজাত অমৃত ।

বালক ছিলাম,

নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে

ধরণীর সবুজে,  
আকাশের নীলিমায় ।

দিন এগোল ।

চলল জীবনযাত্রার রথ

এ-পথে ও-পথে ।

ক্ষুধ অস্তরের তাপতপ্ত নিঃশ্বাস

শুকনো পাতা ওড়াল দিগন্তে ।

চাকার বেগে

বাতাস ধুলায় হল নিবিড় ।

আকাশচর কল্পনা

উড়ে গেল মেঘের পথে,

ক্ষুধাতুর কামনা

মধ্যাহ্নের রৌদ্রে .

ঘুরে বেড়াল ধরাতলে

ফলের বাগানে ফসলের খেতে

আহুত অনাহুত ।

আকাশে পৃথিবীতে

এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা

পথে বিপথে ।

আজ এসে দাঁড়ালেম

প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে ।

১ বৈশাখ, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন

একচল্লিশ

হালকা আমার স্বভাব,

মেঘের মতো না হ'ক

গিরিনদীর মতো ।

আমার মধ্যে হাসির কলরব

আজ্ঞাও থামল না ।

বেদীর থেকে নেমে আসি,

রক্তমঞ্চে বসে বাঁধি নাচের গান,

তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে ।

কবিতা লিখি,

তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়

ভাষণ্য ওঠে মুখর হয়ে,

ঝাঁঝিট বাঁধাজের ঝংকার দিতে

আজ্ঞা সে সংকোচ করে না ।

আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের

রহস্য-সখা ।

তিনি অবাচীন নবীনদের কাছে

প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে

ভুলেই গেছেন ।

তরুণের উচ্ছ্বল হাসিতে

উত্তরোল তাঁর কৌতুক,

তাদের উদ্দাম নৃত্যে

বাজান তিনি দ্রুততালের মৃদঙ্গ ।

তাঁর বজ্রমস্ত্রিত গান্ধীর্ষ মেঘমেঘুর অশ্বরে,

অজস্র তাঁর পরিহাস

বিকশিত কালবনে,

শরতের অকারণ হাস্তহিলোলে ।

তাঁর কোনো লোভ নেই

প্রধানদের কাছে মর্ষাদা পাবার ;

তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না

চাপল্যের ঝরনার মুখে ।

তাঁর বেলাভূমিতে

ভদ্রুর সৈকতের ছেলেমাছষি

প্রতিবাদ করে না সমুদ্রের ।



আমাকে চান টেনে রাখতে তাঁর বয়স্কদলে,

তাই আমার বার্ষিক্যের নিরোপা

হঠাৎ নেন কেড়ে

ফেলে দেন ধুলোয়—

তার উপর দিয়ে নেচে নেচে

চলে যায় বৈরাগী

পাঁচ রঙের তালি-দেওয়া আলখাল্লা পরে ।

যারা আমার মূল্য বাড়াতে চায়,

পরায় আমাকে দামি সাজ,

তাদের দিকে চেয়ে

তিনি ওঠেন হেসে,

ও সাজ আর টিকতে পায় না

আনমনার অনবধানে ।

আমাকে তিনি চেয়েছেন

নিজের অব্যাহত মজলিসে,

তাই ভেবেছি যাবার বেলায় যাব

মান খুইয়ে,

কপালের তিলক মুছে,

কৌতুকে রসোলাসে ।

এস আমার অমানী বন্ধুরা

মন্দিরা বাজিয়ে—

তোমাদের ধুলোমাখা পায়ে

যদি ঘুড়ুর বাঁধা থাকে

লজ্জা পাব না

## বিয়াল্লিশ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত প্রিয়বরেষু

তুমি গল্প জমাতে পার ।

বসো তোমার কেদারায়,  
ধীরে ধীরে টান দাও গুড়গুড়িতে,  
উছলে ওঠে আলাপ

তোমার ভিতর থেকে

হালকা ভাষায়,

যেন নিরাসক্ত ঔৎসুক্যে,

তোমার কৌতুকে-কেনিল মনের

কৌতূহলের উৎস থেকে ।

ঘুরেছ নানা জায়গায়, নানা কাজে,

আপন দেশে, অন্য দেশে ।

মনটা মেলে রেখেছিলে চারদিকে,

চোখটা ছিলে খুলে ।

মানুষের যে-পরিচয়

তার আপন সহজভাবে,

যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায়

দিনে দিনে যা গাঁথা হয়ে ওঠে,

সামান্য হলেও যাতে আছে

সত্যের ছাপ,

অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব,

সেটা এড়ায়নি তোমার দৃষ্টি ।

সেইটে দেখাই সহজ নয়,

পণ্ডিতের দেখা সহজ ।

শুনেছি তোমার পাঠ ছিল সায়াসে,

শুনেছি শাস্ত্রও পড়েছ সংস্কৃত ভাষায় ;

পার্সি জবানিও জানা আছে ।

গিয়েছ সমুদ্রপারে,  
 ভারতে রাজসরকারের  
 ইম্পীরিয়ল রথযাত্রায় লম্বা দড়িতে  
 'হেঁইয়ো' ব'লে দিতে হয়েছে টান।  
 অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি  
 মগজে বোঝাই হয়েছে কম নয়,  
 পুঁথির থেকেও কিছু,  
 মানুষের প্রাণযাত্রা থেকেও বিস্তর।

তবু সব-কিছু নিয়ে  
 তোমার যে পরিচয় মূখ্য  
 সে তোমার আলাপ-পরিচয়ে।  
 তুমি গল্প জমাতে পার।  
 তাই যখন-তখন দেখি,  
 তোমার ঘরে মানুষ লেগেই আছে,  
 কেউ তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো  
 কেউ বয়সে বেশি।

গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না,  
 এই তোমার বাহাদুরি।  
 তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানাও,  
 জীবলীলার মানুষকে।

একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,—  
 সব-কিছুর কাছে-থাক।।  
 তুমি জমা করেছ তোমার মনে  
 নানা লোকের সঙ্গ,  
 সেইটে দিতে পার সবাইকে  
 অনায়াসে,—

সেইটেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের তকমা পরিয়ে  
পণ্ডিত-পেয়াদা সাজাও না  
ধমকিয়ে দিতে ভালোমানুষকে ।

তোমার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারটা  
পূর্ণ আছে যথাস্থানেই ।  
সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা করে রাখেনি ।  
যেখানে আসন পাত  
গল্পের ভোজ্যে  
সেখানে ক্ষুধিতের পাতের থেকে ঠেকিয়ে রাখ  
লাইব্রেরি ল্যাবরেটরিকে ।

একটিমাত্র কারণ,—

মানুষের 'পরে আছে তোমার দরদ,—  
যে-মানুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে  
সুখদুঃখের দুর্গম পথে,  
বাঁধা পড়ে নানা বন্ধনে  
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়,—  
যে-মানুষ বাঁচে,  
যে-মানুষ মরে  
অদৃষ্টের গোলকধাঁদার পাকে ।  
সে-মানুষ রাজাই হ'ক ভিখিরিই হ'ক  
তার কথা শুনতে মানুষের অসীম আগ্রহ ।

তার কথা যে-লোক পারে বলতে সহজেই  
সে-ই পারে,  
অন্তে পারে না ।  
বিশেষ এই হাল-আমলে ।  
আজ মানুষের জানাশোনা  
তার দেখাশোনাকে  
দিয়েছে আপাদমস্তক ঢেকে ।

একটু ধাক্কা পেলে

তার মুখে নানা কথা অনর্গল ছিটকে পড়ে

নানা সমস্যা, নানা তর্ক,

একান্ত মানুষের আসল কথাটা

যায় খাটো হয়ে ।

আজ বিপুল হল সমস্যা,

বিচিত্র হল তর্ক,-

দুর্ভেদ্য হল সংশয়,—

আজকের দিনে

সেইজন্মেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,

মানুষের সহজ বন্ধুকে

যে গল্প জমাতে পারে ।

এ দুদিনে

মাস্টারমশায়কেও অত্যন্ত দরকার ।

তার জন্মে ক্লাস আছে

পাড়ায় পাড়ায়—

প্রায়মারি, সেকেণ্ডারি ।

গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ ।

সমুদ্রের ওপারে

একদিন ওরা গল্পের আসর খুলেছিল,

তখন ছিল অবকাশ ;

ওরা ছেলেদের কাছে শুনিয়েছিল,

রবিন্সন্ ক্রুসো,

সকল বয়সের মানুষের কাছে

ডন্ কুইক্সোট্ ।

দুর্লভ ভাবনার আধি লাগল

দিকে দিকে ;

লেকচারের বান ডেকে এস,  
জলে স্থলে কাদায় পাঁকে  
গেল ঘুলিয়ে।

অগত্যা

অধ্যাপকেরা জানিয়ে দিলে  
একেই বলে গল্প।

বন্ধু,

ছঃখ জানাতে এলুম  
তোমার বৈঠকে।  
আজকাল-এর ছাত্রেরা দেয়  
আজকাল-এর দোহাই।  
আজকাল-এর মুগ্ধতায়  
তাদের অটুট বিশ্বাস।

হায় রে আজকাল

কত ডুবে গেল কালের মহাপ্রাবনে  
মোটাদামের মার্ক-মারা।  
পসরা নিয়ে।

যা চিরকাল-এর

তা আজ যদি বা ঢাকা পড়ে  
কাল উঠবে জেগে।

তখন মাহুস আবার বলবে খুশি হয়ে,—  
গল্প বলো।

তেতাল্লিশ

শ্রীমান অমিরচন্দ্র চক্রবর্তী কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে

জন্মদিনের ধারাকে বহন করে  
মৃত্যুদিনের দিকে।

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

সেই চলতি আসনের উপর বসে  
কোন কারিগর গাঁথছে  
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানার  
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা ।

রথে চড়ে চলেছে কাল ;  
পদাতিক পথিক চলতে চলতে  
পাত্র তুলে ধরে,  
পায় কিছু পানীয় ;—  
পান সারা হলে  
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;  
চাকার তলায়  
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে ।  
তার পিছনে পিছনে  
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,  
পায় নতুন রস,  
একই তার নাম,  
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন ।

একদিন ছিলেম বালক ।  
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে  
সেই যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া  
তোমরা তাকে কেউ জান না ।  
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে  
কেউ নেই তারা ।

সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে  
না আছে কারো স্মৃতিতে ।  
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ;  
তার সেদিনকার কান্না-হাসির  
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো ছাওয়ায় ।

তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও

দেখিনে ধুলোর 'পরে ।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্কের কাছে

সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে ।

তার বিশ্ব ছিল

সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে ।

তার অবোধ চোখ-মেলে চাওয়া

ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে

সারি সারি নারকেল গাছে ।

সঙ্কোবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড় ;

বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে

বেড়া ছিল না উচু,

মনটা এদিক থেকে ওদিকে

ভিড়িয়ে যেত অনায়াসেই ।

প্রদোষের আলো-আধারে

বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,

দুইই ছিল একগোত্রের ।

সে-কয়দিনের জন্মদিন

একটা দ্বীপ,

কিছুকাল ছিল আলোতে,

কাল-সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে ।

ভাঁটার সময় কখনো কখনো

দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,

দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা ।

পাঁচিলে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল

আর-এক কালান্তরে,

কালান্তরের প্রত্যাষে

রঙিন আভার অস্পষ্টতায় ।



তখন যৌবনের বাউল

সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,  
ডেকে বেড়াল

নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে  
অনির্দেশ্য বেদনার খাপা সুরে ।

সেই শুনে কোনো-কোনোদিন বা

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,  
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন

তার কোনো কোনো দূতীকে

পলাশবনের রংমাতাল ছায়াপথে

কাজ-ভোলানো সকাল বিকালে ।

তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,

কিছু বুঝেছি কিছু বুঝিনি ।

দেখেছি কালো চোখের পদ্মরেখায়

জলের আভাস ;

দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর

বেদনা ;

শুনেছি কণিত কঙ্কণে

চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার ।

তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে

পঁচিশে বৈশাখের

প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে

নতুন কোটা বেলফুলের মালা ;

ভোরের স্বপ্ন

তারি গঞ্জে ছিল বিহ্বল ।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ

ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,

জানা না-জানার সংশয়ে ।

সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে  
 কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,  
 কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে'  
 সোনার কাঠির পরশ লেগে ।

দিন গেল ।

সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের  
 রং-করা প্রাচীরগুলো  
 পড়ল ভেঙে ।

যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে  
 ছায়ায় লাগত কাঁপন,  
 হাওয়ায় জাগত মর্মর,  
 বিরহী কোকিলের  
 কুঁহুরবের মিনতিতে  
 আতুর হত মধ্যাহ্ন,  
 মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন  
 ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,  
 সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা  
 পৌছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে ।

সেদিনকার কিশোরক

স্মর সেধেছিল যে-একতারায়  
 একে একে তাতে চড়িয়ে দিল  
 তারের পর নতুন তার ।  
 সেদিন পঁচিশে বৈশাখ  
 আমাকে আনল ডেকে  
 বন্ধুর পথ দিয়ে  
 তরঙ্গমল্লিত জনসমুদ্রতীরে ।

বেলা-অবেলায়  
 ধ্বনিতে ধ্বনিতে গৌণে  
 জাল ফেলেছি মাঝদরিয়ায় ;  
 কোনো মন দিয়েছে ধরা,  
 ছিন্ন আলোর ভিতর থেকে  
 কেউ বা গেছে পালিয়ে ।

কখনো দিন এসেছে স্নান হয়ে,  
 সাধনায় এসেছে নৈরাশ্র,  
 ঘানিভারে নত হয়েছে মন ।  
 এমন সময়ে অবসাদের অপরাধে  
 অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে  
 অমরাবতীর মর্ত্যপ্রতিমা ;  
 সেবাকে তারা স্নন্দর করে,  
 তপঃক্লান্তের জন্মে তারা  
 আনে সুধার পাত্র ;  
 ভয়কে তারা অপমানিত করে  
 উল্লোল হাশ্বের কলোচ্ছ্বাসে ;  
 তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা  
 ভস্মে-ঢাকা অজ্ঞারের থেকে ;  
 তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে  
 প্রকাশের তপস্তায় ।  
 তারা আমার নিবে-আসা দীপে  
 জালিয়ে গেছে শিখা,  
 শিথিল-হওয়া তারে  
 বেঁধে দিয়েছে সুর,  
 পঁচিশে বৈশাখকে  
 বরণমালা পরিয়েছে  
 আপন হাতে গৌণে ।

তাদের পরশমণির ছোঁওয়া

আজ্ঞা আছে

আমার গানে আমার বানীতে ।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে

দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত

গুরু গুরু মেঘমস্ত্রে ।

একতারা কলে দিয়ে

কখনো বা নিতে হল ভেরী ।

খর মধ্যাহ্নের তাপে

ছুটতে হল

জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে ।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,

ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা ।

নির্মম কঠোরতা ঘেরেছে ঢেউ

আমার নৌকার ভাইনে বায়ে,

জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে

নিন্দার তলার, পঙ্কের মধ্যে ।

বিষেবে অহুরাগে

ঈর্ষার মৈত্রীতে,

সংগীতে পঙ্কষ কোলাহলে

আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে

আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে ।

এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংকোভের মধ্যে

পঁচিলে বৈশাখের প্রৌঢ় গ্রহরে

ভোমরা এসেছে আমার কাছে ।

জেনেছি কি,

আমার প্রকাশে

অনেক আছে অসমাপ্ত

অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

অনেক উপেক্ষিত ?

অস্তরে বাহিরে

সেই ভালো মন্দ,

স্পষ্ট অস্পষ্ট,

খ্যাত অখ্যাত,

ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে

যে আমার মূর্তি

তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,

তোমাদের ক্ষমায়

আজ প্রতিকলিত,

আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,

তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের

শেষবেলাকার পরিচয় বলে

নিলেম স্বীকার করে,

আর রেখে গেলেম তোমাদের অন্তে

আমার আশীর্বাদ ।

ষাবার সময় এই মানসী মূর্তি

রইল তোমাদের চিন্তে,

কালের হাতে রইল বলে

করব না অহংকার ।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি

জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা

সকল পরিচয়ের অন্তরালে ;

নির্জন নামহীন নিভুতে ;

নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে

সুর মিলিয়ে নিতে দাও

এক চরম সংগীতের গভীরতায় ।

## চুয়াল্লিশ

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি  
 বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,  
 তার নাম দেব শ্রামলী ।

ও যখন পড়বে ভেঙে

সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,  
 মাটির কোলে মিশবে মাটি ;  
 ভাঙা ধামে নালিশ উচু করে  
 বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;  
 ফাটা দেয়ালের পাজর বের ক'রে  
 তার মধ্যে বাধতে দেবে না  
 মৃতদিনের প্রেতের বাসা ।

সেই মাটিতে গাঁধব

আমার শেষ বাড়ির ভিত  
 যার মধ্যে সব বেদনার বিন্যাস,  
 সব কলঙ্কের মার্জনা,  
 যাতে সব বিকার সব বিজ্ঞপকে  
 ঢেকে দেয় দুর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্তে ;  
 যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর  
 রক্তলোলুপ হিংস্র নির্যোষ  
 গেছে নিঃশব্দ হয়ে ।

সেই মাটির ছাদের নিচে বসব আমি

রোজ সকালে শৈশবে যা ভরেছিল  
 আমার গাঁটবাধা চাদরের কোনা  
 এক-একমুঠো টাপা আর বেল ফুলে ।  
 মাঘের শেষে যার আমার বোল  
 দক্ষিণের হাওয়ায়  
 অলক্ষ্য দূরের দিকে ছড়িয়েছিল  
 ব্যথিত যৌবনের আয়তন ।

আমি ভালোবেসেছি

বাংলাদেশের মেয়েকে ;

যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে

তাতে আছে যেন এই মাটির শ্রামল অঙ্কন,

ওর কচি ধানের চিকন আভা ।

তাদের কালো চোখের কঙ্কণ মাধুরীর উৎপমা দেখেছি

ঐ মাটির দিগন্তে

নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির

নিমীলনে ।

প্রতিদিন আমার ঘরের সুপ্ত মাটি

সহজে উঠবে জেগে

ভোরবেলাকার সোনার কাঠির

প্রথম ছোঁওয়ায় ;

তার চোখ-জুড়ানো শ্রামলিমায়

স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে

চৈত্ররাতের চাঁদের

নিদ্রাহারা মিতালিতে ।

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে

পদ্মার ভাঙনলাগা

খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,

গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায় ;

সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে

গ্রামের সন্ধ বাঁকা পথের ধারে,

পুকুরের পাড়ির উপরে ।

আমার দু-চোখ ভরে

মাটি আমার ডাক পাঠিয়েছে

শীতের শুষ্ক ডাক দুপুরবেলায়,

রাঙা পথের ওপারে,

যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে  
চরে বেড়ায় ছুটি-চারটি গোক  
নিরুৎসুক আলস্তে,  
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে ।

যেখানে সাধিবিহীন  
ভালগাছের মাথায়  
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা ।

আজ আমি তোমার ডাকে  
ধরা দিয়েছি শেষবেলায় ।  
এসেছি তোমার ক্ষমানিষ্ঠ বৃকের কাছে,  
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে,  
নবদুর্বাশ্রামলের  
করণ পদস্পর্শে  
চরম মুক্তি-আগরণের প্রতীক্ষায়,  
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে ।

### পঁয়তাল্লিশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু  
তখন আমার আয়ুর তরণী  
ষৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে ।  
ষে-সব কাজ প্রবীণকে প্রাজ্ঞকে মানায়  
তাই নিয়ে পাকা করছিলাম  
পাকা চুলের মর্দাদা ।

এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে  
তোমার সবুজপত্রের আসরে ।  
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক,  
ধবর দিলে  
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলেনি ।



দ্বিধার মধ্যে মুখ কিরালাম

পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে ।

পর্যাপ্ত তাঁকণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি

দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে ।

ভরা যৌবনের দিনেও

যৌবনের সংবাদ

এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে ।

আমার মন বুকল

যৌবনকে না ছাড়ালে

যৌবনকে যায় না পাওয়া ।

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে ।

পূবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে

পিছু ডাক,

দাঁড়াই মুখ কিরিয়ে ।

আজ সামনে দেখা দিল

এ জন্মের সমস্তটা ।

যাকে ছেড়ে এলাম

তাকেই নিচ্ছি চিনে ।

সরে এসে দেখছি

আমার এতকালের সুখ দুঃখের ঐ সংসার,

আর তার সঙ্গে

সংসারকে পেরিয়ে কোন্‌ নিকৃদ্ভিষ্ট ।

ঋষি-কবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন-

“ভুবন সৃষ্টি করেছ

তোমার এক অর্ধেককে দিয়ে,-

বাকি আধখানা কোথায়

তা কে জানে ।”

সেই একটি-আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে

আপন প্রান্তরেথায় ;

দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ;  
 দুই বিরাট আধখানা,—  
 তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে  
 শেষকথা বলি যাব—  
 দুঃখ পেয়েছি অনেক,  
 কিন্তু ভালো লেগেছে,  
 ভালোবেসেছি।

### ছেচল্লিশ

তখন আমার বয়স ছিল সাত।  
 ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে  
 অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,  
 বেরিয়ে আসছে কোমল আলো  
 নতুন কোটা কাঁটালিটাপার মতো।

বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে  
 কাক ডাকবার আগে,  
 পাছে বঞ্চিত হই  
 কম্পমান নারকেল শাখাগুলির মধ্যে  
 সুর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।

তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।  
 যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে  
 আলোতে স্নান করে আসত  
 রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,  
 সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,  
 হাসত আমার মুখে চেয়ে।—  
 আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে

তারপরে বয়স হল

কাজের দায় চাপল মাথার 'পরে ।

দিনের পরে দিন তখন হল ঠাসাঠাসি ।

তারা হারাল আপনার স্বতন্ত্র মৰ্যাদা ।

একদিনের চিন্তা আর-একদিনে হল প্রসারিত,

একদিনের কাজ আর-একদিনে পাতল আসন ।

সেই একাকার-করা সময় বিস্তৃত হতে থাকে

নতুন হতে থাকে না

একটানা বয়েস কেবলি বেড়ে ওঠে,

ক্ষণে ক্ষণে সমে এসে

চিরদিনের ধুমোটির কাছে

ফিরে ফিরে পায় না আপনাকে

আজ আমার প্রাচীনকে নতুন ক'রে নেবার দিন এসেছে ।

ওঝাকে ডেকেছি, ভূতকে দেবে নামিয়ে ।

গুণীর চিঠিখানির জন্তে

প্রতিদিন বসব এই বাগানটিতে,

তার নতুন চিঠি

ঘুম-ভাঙার জানলাটার কাছে ।

প্রভাত আসবে

আমার নতুন পরিচয় নিতে,

আকাশে অনিমেষ চক্ষু মেলে

আমাকে শুধাবে

“তুমি কে ?”

আজকের দিনের নাম

খাটবে না কালকের দিনে ।

সৈন্যদলকে দেখে সেনাপতি,

দেখে না সৈনিককে ;—

দেখে আপন প্রয়োজন,

দেখে না সত্য,

দেখে না স্বভঙ্গ মাছুষের  
 বিধাতাকৃত আশ্চর্যরূপ ।  
 এতকাল ভেমনি করে দেখেছি সৃষ্টিকে,  
 বন্দিদলের মতো  
 প্রয়োজনের এক শিকলে বাধা ।  
 তার সঙ্গে বাধা পড়েছি  
 সেই বন্ধনে নিজে ।

আজ নেব মুক্তি ।  
 সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে  
 নতুন পার ।  
 তাকে জড়াতে যাব না  
 এ পারের বোঝার সঙ্গে  
 এ নৌকোর মাল নেব না কিছুই  
 যাব একলা  
 নতুন হয়ে নতুনের কাছে ।

---

# સંયોજન

## স্মৃতি-পাথের

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে  
 সে কোন্ অভাবনীয় স্থিতহাসে  
 অশ্রুমনা আত্মভোলা  
 ঘোবনেরে দিয়ে ঘন দোলা  
 মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিত কী অমৃত-রেখা,  
 কভু যার পাই নাই দেখা,  
 দুর্লভ সে প্রিয়  
 অনির্বচনীয় ।

হে মহা অপরিচিত  
 এক পলকের লাগি হয় সচকিত  
 গভীর অন্তরতর প্রাণে  
 কোন্ দূর বনাস্তের পথিকের গানে ;  
 সে অপূর্ব আসে ঘরে  
 পথহারা মুহূর্তের ভরে ।  
 বৃষ্টিধারামুখরিত নিজ্রন প্রবাসে  
 সঙ্ঘাবেলা যুধিকার সঙ্কল্প নিষ্ঠ গঙ্ঘাসে,  
 চিস্তে রেখে দিয়ে গেল চিরস্পর্শ স্বীয়  
 তাহারি অলিত উত্তরীয় ।

সে বিস্মিত ক্ষণিকেরে পড়ে মনে  
 কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে  
 নীতের মধ্যাহ্নকালে গোকচরা শস্তরিক্ত মাঠে  
 চেয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে ।  
 সঙ্ঘহারা সারাহের অঙ্ককারে সে স্মৃতির ছবি  
 সূর্যাস্তের পার হতে বাজার পুরবী ।

পেয়েছি যে-সব ধন যার মূল্য আছে  
 ফেলে যাই পাছে  
 সেই যার মূল্য নাই, জানিবে না কেও  
 সঙ্গে থাকে অখ্যাত পাথের ।

শেষ সপ্তকের দুই-সংখ্যক কবিতা তুলনীয় ।

## বাতাবির চারা

একদিন শাস্ত হলে আষাঢ়ের ধারা  
 বাতাবির চারা  
 আসন্ন-বর্ষণ কোন্ শ্রাবণ প্রভাতে  
 রোপণ করিলে নিজহাতে  
 আমার বাগানে ।

বহুকাল গেল চলি ; প্রথর পৌষের অবসানে  
 কুহেলি ঘুচাল যবে কোঁতুহলী ভোরের আলোক,  
 সহসা পড়িল চোখ,—  
 হেরিছু শিশিরে ভেজা সেই গাছে  
 কচিপাতা ধরিয়াছে,  
 যেন কী আগ্রহে  
 কথা কহে,  
 যে-কথা আপনি শুনে পুলকেতে তুলে ;  
 যেমন একদা কবে তমসার কূলে  
 সহসা বাঙ্গীকি মূনি  
 আপনার কণ্ঠ হতে আপন প্রথম ছন্দ শুনি'  
 আনন্দ সঘন  
 গভীর বিষয়ে নিমগন ।

কোথায় আছ না-জানি এ সকালে  
 কী নিহঁর অন্তরালে,—

সেথা হতে কোনো সজ্জাষণ  
 পরশে না এ প্রান্তের নিভৃত আসন ।  
 হেনকালে অকস্মাৎ নিঃশব্দের অবহেলা হতে  
 প্রকাশিল অরুণ আলোতে  
 এ কয়টি কিশলয় ।  
 এরা যেন সেই কথা কর  
 বলিতে পারিতে যাহা তবু না বলিয়া  
 চলে গেছে প্রিয়া ।

সেদিন বসন্ত ছিল দূরে  
 আকাশ জাগেনি সুরে,  
 অচেনার ষবনিকা কেঁপেছিল ক্ষণে ক্ষণে  
 তখনো যায়নি সরে দূরন্ত দক্ষিণ সমীরণে ।  
 প্রকাশের উচ্ছ্বাস অবকাশ না ঘটিলে,  
 পরিচয় না রটিতে,  
 ঘণ্টা গেল বেজে  
 অব্যক্তের অনালোকে সায়াহ্নে গিয়েছ সভা ভোজে ।

তিন-সংখ্যক কবিতা তুলনীয় ।

## শেষ পর্ব

যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা  
 সেথা হতে শেষ অরুণিমা  
 নীর্ণপ্রায়  
 আজি দেখা যায় ।

সেথা হতে ভেসে আসে  
 চৈত্রদিবসের দীর্ঘশ্বাসে  
 অশ্রুট মর্ম্মর,  
 কোকিলের ক্লাস্ত স্বর,



ক্ষীণশ্রোত তটিনীর অলস কল্লোল,—  
রক্তে লাগে মৃদুমন্দ দোল ।

এ আবেশ মুক্ত হ'ক ;  
ঘোরভাঙা চোখ  
স্তম্ভ স্পষ্টের মাঝে জাগিয়া উঠুক ।  
রঙকরা দুঃখ সুখ  
সঙ্ঘার মেঘের মতো যাক সরে  
আপনারে পরিহাস করে ।  
মুছে যাক সেই ছবি—চেয়ে থাক পথপানে,  
কথা কানে কানে,  
মৌনমুখে হাতে হাত ধরা,  
রজনীগন্ধায় সাজি ভরা,  
চোখে চোখে চাওয়া  
দুঃখ দুঃখ বন্ধ নিয়ে আসা আর যাওয়া ।

যে-খেলা আপনা সাথে সকালে বিকালে  
ছায়া-অস্তরালে,  
সে খেলার ঘর হতে  
হল আসিবার বেলা বাহির-আলোতে ।  
ভাঙিব মনের বেড়া কুসুমিত কাঁটালতা ঘেরা,  
যেথা স্বপনেরা  
মধুগন্ধে মরে ঘুরে ঘুরে  
গুন গুন সুরে ।  
নেব আমি বিপুল বৃহৎ  
আদিম প্রাণের দেশ— তেপান্তর মাঠের সে-পথ  
সাত সমুদ্রের তটে তটে  
যেখানে ঘটনা ঘটে,  
নাই তার দায়,  
যেতে যেতে দেখা যায়, লোনা যায়,

দিনরাত্রি যায় চলে  
নানা ছন্দে নানা কলরোলে ।

ধাক্ মের ভরে  
আপক ধানের খেত অজ্ঞানের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে ;  
সোনার তরঙ্গদোলে  
মুগ্ধ দৃষ্টি যার 'পরে ভেসে যায় চলে  
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে,  
যেথায় অদৃশ্য সাধি লীলাভরে  
সারাদিন ভাসায় প্রহর যত  
খেলার নৌকার মতো ।  
দূরে চেয়ে রব আমি স্থির

বিস্তীর্ণ বন্ধের কাছে  
যেথা আল গাছে  
সহস্র বর্ষের প্রাণ সমাহিত রয়েছে নীরবে  
নিশ্চল গৌরবে ।  
কেটে যাক আপনা-ভোলানো মোহ,  
কেটে যাক আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,  
প্রতি বৎসরের আয়ু কর্তব্যের আবর্জনাভার  
না করুক স্তুপাকার,—  
নির্ভাবনা তর্কহীন শাস্ত্রহীন পথ বেয়ে বেয়ে  
যাই চলে অর্থহীন গান গেয়ে গেয়ে ।

প্রাণে আর চেতনায় এক হয়ে ক্রমে  
অনায়াসে মিলে যাব মৃত্যুমহাসাগর-সংগমে,  
আলো-আধারের দ্বন্দ্ব হয়ে কীণ  
গোধূলি নিঃশব্দ রাত্রি যেমন অতলে হয় লীন ।

ছোড়াসাঁকো  
৫ এপ্রিল, ১৯৩৪

চায়-সংখ্যক কবিতা তুলনীয় ।

## যর্মবাণী

শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্তিমতী,  
 গানে যাহা করে বারনায়,  
 সে বাণী হারায় কেন জ্যোতি,  
 কেন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়  
 মুখের কথায়  
 সংসারের মাঝে  
 নিরন্তর প্রয়োজনে জনতার কাজে ?  
 কেন আজ পরিপূর্ণ ভাষা দিয়ে  
 পৃথিবীর কানে কানে বলিতে পারিনে “প্রিয়ে  
 ভালোবাসি” ?  
 কেন আজ সুরহারা হাসি  
 যেন সে কুয়াশা মেলা  
 হেমন্তের বেলা ?

### অনন্ত অস্বর

অপ্রয়োজনের সেখা অথও প্রকাণ্ড অবসর,  
 তারি মাঝে এক তারা অন্য তারকারে  
 জানাইতে পারে  
 আপনার কানে কানে কথা ।  
 তপস্বিনী নীরবতা  
 আসন বিস্তীর্ণ যার অসংখ্য যোজন দূর ব্যোমে  
 অন্তরে অন্তরে উঠে কেঁপে  
 আলোকের নিগূঢ় সংগীতে ।  
 খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভাষাকীর্ণ চিতে  
 নাই সেই অসীমের অবসর ;  
 তাই অবরুদ্ধ তার স্বর,  
 ক্ষীণসত্য ভাষা তার ।

প্রত্যাহের অভ্যন্তর কথার  
মূল্য যায় ঘুচে,  
অর্থ যায় মুছে ।

তাই কানে কানে  
বলিতে সে নাহি জানে  
সহজে প্রকাশি'  
“ভালোবাসি” ।

আপন হারানো বাণী, খুঁজিবারে,  
বনম্পতি, আসি তব দ্বারে ।  
তোমার পল্লবপুষ্প লাখাব্যহভার  
অনায়াসে হয়ে পার  
আপনার চতুর্দিকে মেলেছে নিস্তরক অবকাশ ।  
সেখা তব নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস  
সূর্যোদয় মহিমার পানে  
আপনারে মিলাইতে জানে ।

অজানা সাগর পার হতে  
দক্ষিণের বায়ুস্রোতে  
অনাদি প্রাণের যে বারতা  
তব নব কিশলয়ে রেখে যায় কানে কানে কথা,—  
তোমার অস্তরতম—  
সে কথা আশুক প্রাণে মম ;—  
আমার ভাবনা ভরি উঠুক বিকাশি'  
“ভালোবাসি” ।  
তোমার ছায়ায় বসে বিপুল বিরহ মোরে ঘেরে ;  
বর্তমান মুহূর্তেরে  
অবলুপ্ত করি দেয় কালহীনতায় ।  
অস্মার হতে যেন লোকাস্তরগত আধি চায়  
মোর মুখে ।

নিষ্কারণ হুখে

পাঠাইয়া দেয় মোর চেতনারে

সকল সীমার পারে ।

দীর্ঘ অভিসারপথে সংগীতের সুর

তাহারে বহিয়া চলে দূর হতে দূর ।

কোথায় পাথের পাবে তার

স্বধা পিপাসার,

এ সত্য বাণীর তরে তাই সে উদাসী

“ভালোবাসি” ।

ভোর হয়েছিল যবে যুগান্তের রাতি

আলোকের রশ্মিগুলি খুঁজি সাধি

এ আদিম বাণী

করেছিল কানাকানি

গগনে গগনে ।

নব সৃষ্টি যুগের লগনে

মহাপ্রাণ-সমুদ্রের কূল হতে কূলে

তরঙ্গ দিয়েছে তুলে

এ মন্ত্রবচন ।

এই বাণী করেছে রচন

সুবর্ণকিরণ বর্ণে স্বপ্ন-প্রতিমা

আমার বিরহাকাশে যেথা অন্তশিবরের সীমা ।

অবসাদ-গোধূলির ধূলিজাল তারে

ঢাকিতে কি পারে ?

নিবিড় সংহত করি এ-জগ্নের সকল ভাবনা

সকল বেদনা

দিনান্তের অন্ধকারে মম

সঙ্ঘাতারা সম

শেষবাণী উঠুক উদাসি—

“ভালোবাসি” ।

ছায়া-সংখ্যক কবিতা তুলসীর ।



## ঘট ভরা

আমার এই ছোটো কলসখানি  
সারা সকাল পেতে রাখি  
ঝরনাধারার নিচে ।  
বসে থাকি একটি ঘরে  
শেওলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে ।  
ঘট ভরে যায় বারে বারে—  
কেনিয়ে ওঠে, ছাপিয়ে পড়ে কেবলি ।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা  
শৈলশ্রেণীর নীল আকাশে  
ঝরঝরানির শব্দ ওঠে দিনে রাতে ।  
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার  
গাঁয়ের মেয়েরা ।  
জলের শব্দ যায় পেরিয়ে  
বেগনি রঙের বনের সীমানা,  
পাহাড়ভঙ্গির রাস্তা ছেড়ে  
যেখানে ঐ হাটের মানুষ  
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াইপথে,  
বলদ ছুটোর পিঠে বোঝাই  
শুকনো কাঠের আঁটি ;  
কুহুঝুঝু ঘন্টা গলায় বাঁধা ।

ঝরঝরানি আকাশ ছাপিয়ে  
ভাবনা আমার ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে  
পথহারানো দূর বিদেশে ।  
রাঙা ছিল সকালবেলার প্রথম রোদের রং,  
উঠল সাদা হয়ে ।



বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে ।

বেলা হল ডাক পড়েছে ঘরে ।

ওরা আশায় রাগ ক'রে কয়

“দেরি করলি কেন ?”

চূপ করে সব শুনি ;

ঘট ভরতে হয় না দেরি সবাই জানে,

উপচে-পড়া জলের কথা

বুঝবে না তো কেউ ।

[আশ্বিন, ১৩৪৩]

সাতাশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীর ।

## প্রশ্ন

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা

দেহের দেহলীতে আগায় দেহের অতীত কথা ।

খাঁচার পাখি যে বাণী কয়

সে তো কেবল খাঁচারি নয়,

তারি মধ্যে করুণ ভাষায় সুদূর অগোচর

বিস্মরণের ছায়ায় আনে অরণ্য মর্মর ।

চোখের দেখা নয় তো কেবল দেখারি জালবোনা,

কোন্ অলক্ষ্যে ছাড়িয়ে সে যায় সকল দেখাশোনা ।

শীতের রৌদ্রে মাঠের শেষে

দেশ-হারানো কোন্ সে দেশে

বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকে নিমেষ-হারা চোখে

দিখলয়ের ইন্ধিত-লীন উধাও কল্পলোকে ।

ভালোমন্দ বকীণ এই দীর্ঘ পথের বুকে

রাত্র-দিনের যাত্রা চলে কত দুঃখে সুখে ।

পথের লক্ষ্য পথ-চলাতেই

শেষ হবে কি ? আর কিছু নেই ?



দিগন্তে যার স্বর্ণ লিখন, সংগীতের আহ্বান,  
নিরর্থকের গহ্বরে তার হঠাৎ অবসান ?

নানা ঋতুর ডাক পড়ে যেই মাটির গহন তলে  
চৈত্রতাপে, মাঘের হিমে, শ্রাবণ বৃষ্টিজলে,  
স্বপ্ন দেখে বীজ সেখানে  
অভাবিতের গভীর টানে,  
অন্ধকারে এই যে ধ্যান স্বপ্নে কি তার শেষ ?  
উষার আলোর ফুলের প্রকাশ, নাই কি সে উদ্দেশ ?

১৫ নবেম্বর, ১৯৩৪

পঞ্জাব-সংখ্যক কবিতা তুলনীর ।

## আমি

এই যে সবার সামান্য পথ, পায়ে হাঁটার গলি  
সে পথ দিয়ে আমি চলি  
সুখে দুঃখে লাভ ক্ষতিতে,  
রাতের আঁধার নর জ্যোতিতে ।  
প্রতি তুচ্ছ মুহূর্তেরই বর্জনা করি আমি জড়ো,  
কারো চেয়ে নইকো আমি বড়ো ।  
চলতে পথে কখনো বা বিঁধছে কাঁটা পায়ে,  
লাগছে ধুলো গায়ে  
দুর্ভাসনার এলোমেলো হাওয়া,  
তারি মধ্যে কতই চাওয়া পাওয়া,  
কতই বা হারানো,  
খেয়া ধরে ঘাটে আঘাটায়  
নদী পারানো ।

এমনি করে দিন কেটেছে, হবে সে-দিন সারা  
বেয়ে সর্বসাধারণের ধারা ।

শুধাও যদি সবশেষে তার রইল কী ধন বাকি,  
 স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি তা কি ।  
 জানি, এমন নাই কিছু যা পড়বে কারো চোখে,  
 স্মরণ-বিস্মরণের দোলায় ছলবে বিশ্বলোকে ।  
 নয় সে মানিক, নয় সে সোনা,—  
 যায় না তারে ষাচাই করা, যায় না তারে গোনা ।

এই দেখো-না, শীতের রোদে দিনের স্বপ্নে বোনা  
 সেগুন বনে সবুজ-মেশা সোনা,  
 শঙ্কনে গাছে লাগল ফুলের রেশ,  
 হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ ।  
 বেগনি ছায়ায় ছোঁওয়া-লাগা শুক বটের শাখা  
 ঘোর রহস্তে ঢাকা ।

ফলসা গাছের ঝরা পাতা গাছের তলা জুড়ে  
 হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে ।  
 গোকুর গাড়ি মেঠো পথের তলে  
 উড়তি ধুলোয় দিকের আঁচল ধূসর ক'রে চলে ।  
 নীরবতার বুকের মধ্যখানে  
 দূর অজানার বিধুর বাঁশি ভৈরবী সুর আনে ।  
 কাজভোলা এই দিন  
 নীল আকাশে পাখির মতো নিঃসীমে হয় লীন ।  
 এরি মধ্যে আছি আমি,  
 সব হতে এই দামি ।

কেননা আজ বুকের কাছে যায় যে জানা,  
 আরেকটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডানা  
 অগতে অগতে  
 অস্তবিহীন ইতিহাসের পথে ।

ঐ যে আমার কুয়োতলার কাছে  
 সামান্ত ঐ আমার গাছে

কখনো বা রৌদ্র খেলার, কভু প্রাবণধারা,  
 সারা বরষ থাকে আপনহারা  
 সাধারণ এই অরণ্যানীর সবুজ আবরণে,  
 মাঘের শেষে অকারণে  
 ক্ষণকালের গোপন মন্ত্রবলে  
 গভীর মাটির তলে  
 শিকড়ে তার শিহর লাগে,  
 শাখায় শাখায় হঠাৎ বাণী জাগে,—  
 “আছি. আছি, এই যে আমি আছি।”  
 পুষ্পাঙ্কুরে ধায় সে বাণী স্বর্গলোকের কাছাকাছি  
 দিকে দিগন্তরে।

চন্দ্র সূর্য তারার আলো তারে বরণ করে।

এমনি করেই মাঝে মাঝে সোনার কাঠি আনে  
 —কভু প্রিয়ার মুখ চোখে, কভু কবির গানে—  
 অলস মনের শিয়রেতে কে সে অন্তর্ধামী ;  
 নিবিড় সত্যে জেগে ওঠে সামান্য এই আমি।

যে আমিরে ধূসর ছায়ায় প্রতিদিনের ভিড়ের মধ্যে দেখা  
 সেই আমিরে এক নিমেষের আলোয় দেখি একের মধ্যে এক।

সে-সব নিমেষ রয় কি না রয় কোনোখানে,  
 কেউ তাহাদের জানে বা না-ই জানে,

তবু তারা জীবনে মোর দেয় তো আনি

ক্ষণে ক্ষণে পরম বাণী

অনন্তকাল যাহা বাজে

বিশ্বচরাচরের মর্মমাঝে

“আছি আমি আছি”—

যে বাণীতে উঠে নাচি

মহাগগন-সভাক্ষনে আলোক-অঙ্গুরী

তারার মাল্য পরি।

ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলসীর।

## আষাঢ়

নব বরষার দিন  
 বিশ্বলক্ষ্মী তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন  
 রিক্ত তপ্ত দিবসের নীরব প্রহরে  
 ধরণীর দৈন্ত্য 'পরে  
 ছিলে তপস্রায় রত  
 ক্রতুর চরণতলে নত ।  
 উপবাসশীর্ণ তনু, পিঙ্গল জটিল কেশপাশ,  
 উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ।  
 দুঃখেতে করিলে দগ্ধ দুঃখেরি দহনে  
 অহনে অহনে ;  
 শুষ্কে জ্বালায়ে তীব্র অগ্নিশিখারূপে  
 ভস্ম করি দিলে তারে তোমার পূজার পুণ্যধূপে ।  
 কালোরে করিলে আলো,  
 নিস্তেজেরে করিলে তেজালো ;  
 নির্মম ত্যাগের হোমানলে  
 সন্তোগের আবর্জনা লুপ্ত হয়ে গেল পলে পলে ।  
 অবশেষে দেখা দিল ক্রতুর উদার প্রসন্নতা,  
 বিপুল দান্ধিগো অবনতা  
 উৎকণ্ঠিতা ধরণীর পানে ।  
 নির্মল নবীন প্রাণে  
 অরণ্যানী ।  
 লভিল আপন বাণা ।  
 দেবতার বর  
 মুহূর্তে আকাশ ঘিরি রচিল সজ্জল মেঘস্তর ।  
 মরুবক্ষে তৃণরাজ  
 পেতে দিল আজি  
 শ্রাম আস্তরণ,  
 নেমে এল তার 'পরে স্নানরের ককণ চরণ ।

সফল উপস্কা তব  
 জীর্ণতারে সমর্পিল রূপ অভিনব ;  
 মলিন দৈন্তের লঙ্কা ঘুচাইয়া  
 নব ধারাজলে তারে স্নাত্ত করি দিলে মুছাইয়া  
 কলঙ্কের গ্লানি ;  
 দীপ্তভেঙ্গে নৈরাশ্রে হানি  
 উদ্বেগ উৎসাহে  
 রিক্ত ষড় নদীপথ ভরি দিলে অমৃতপ্রবাহে ।  
 জয় তব জয়  
 গুরুগুরু মেঘগর্জে ভরিয়া উঠিল বিশ্বময় ।

সাঁইজি-সংখ্যক কবিতা তুলনায় ।

## যক্ষ

হে যক্ষ তোমার প্রেম ছিল বন্ধ কোরকের মতো,  
 একান্তে প্রেমসী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত  
 সংকীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেঁটনে তুমি যবে  
 বন্ধ রেখেছিলে তারে দু-জনের নির্জন উৎসবে  
 সংসারের নিভৃত সীমায়, শ্রাবণের মেঘজাল  
 কুপণের মতো যথা লশাকের রচে অস্তুরাল  
 আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারিয়ে ফেলে তারে,  
 সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে  
 অন্ধ মোহাবেশে । বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে,  
 সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হ'ল, বিরহের দুঃখতাপে  
 প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত ; আনিল সে আপনারে  
 বিশ্বধরিত্রীর মাঝে । নির্বাধে তাহার চারিধারে  
 সাক্ষ্য অর্ঘ্য করে দান বৃষ্টিজলে সিক্ত বনযুথী  
 গন্ধের অঞ্জলি ; নীপনিহুয়ের আনাল আকৃতি

রেণুভারে মম্বর পবন । উঠে গেল যবনিকা  
 আত্মবিশ্বাতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা  
 উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামগ্ন বিশ্বপথিকের  
 মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্ধ-প্রাঙ্গণ হতে নির্ভীকের  
 শূন্যপথে অভিসার । আষাঢ়ের প্রথম দিবসে  
 দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের ; নিত্যরসে  
 আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব মুরতি  
 অস্তুহীন গরিমায় কাস্তিময়ী । এক দিন ছিল সেই সতী  
 গৃহের সঙ্গিনী, তারে বসাইলে ছন্দশঙ্করবে  
 আলোক-আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে  
 অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে । প্রেম তব ছিল বাক্যহীন,  
 আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন  
 সংগীত ভরজে আনন্দোন্মিত । তুমি আজ হলে কবি,  
 মুক্ত তব দৃষ্টিপথে উদ্বারিত নিখিলের ছবি  
 শ্রামমেঘে স্নিগ্ধচ্ছায়া । বন্ধ ছাড়ি মর্মে অধ্যাসীনা  
 প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা ।  
 অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে  
 তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে ।

দার্জিলিং

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতা ভুলনীয় ।

## দুঃখ যেন জাল পেতেছে

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারদিকে ;

চেয়ে দেখি যার দিকে

সবাই যেন ছুর্গ্রহদের মঙ্গলায়

ভ্রমরে কাঁদে বঙ্গায় ।

লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই,

আজকে দিনের চিন্তদাহের তুল্য নেই ।

যেন এ দুঃখ অস্বহীন,

ঘরছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন ।

এমন সময় অকস্মাৎ

মনের মধ্যে হানল চমক তড়িদ্ঘাত,

এক নিমেষেই ভাঙল আমার বন্ধ ঘর,

ঘুচল হঠাৎ অন্ধকার ।

সুদূর কালের দিগন্তলীন বাগ্‌বাদিনীর পেলেম সাড়া,

শিরায় শিরায় লাগল নাড়া ।

যুগান্তরের ভয়শেষে

ভিত্তিছায়ায় ছায়ামূর্তি মুক্তকেশে

বাজায় বীণা ; পূর্বকালের কী আখ্যানে

উদার সুরের তানের তন্তু গাঁথছে গানে ;

দুঃসহ কোন্ দারুণ দুখের স্মরণ-গাঁথা

কল্পণ গাঁথা ;

দুর্দাম কোন্ সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের

মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের

গর্জয়বে

রক্তরঙিন যে-উৎসবে

কল্পদেবের ঘূর্ণিনৃত্যে উঠল মাতি

প্রলয়রাতি,

ভাহারি ঘোর শঙ্কাঁপন বারে বারে  
ঝংকারিয়া কাঁপছে বীণার তারে তারে ।

জানিয়ে দিলে আমার, অগ্নি  
অতীতকালের হৃদয়পদ্মে নিত্য-আসীন ছায়াময়ী,  
আজকে দিনের সকল লজ্জা সকল গ্লানি  
পাবে যখন তোমার বাণী,  
বর্ষশতের ভাসান-খেলার নৌকা যবে  
অদৃশ্যেতে মগ্ন হবে,  
মর্মদহন দুঃখশিখা  
হবে তখন জলনবিহীন আখ্যায়িকা,  
বাজবে তারা অসীম কালের নীরব গীতে  
শাস্ত গভীর মাধুরীতে ;  
ব্যথার ক্ষত মিলিয়ে যাবে নবীন ঘাসে,  
মিলিয়ে যাবে সুদূর যুগের শিশুর উচ্চহাসে ।

২৮ আষাঢ়, ১৩৪১

শেষ সপ্তকের দশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয় ।



নাটক ও প্রহসন

শেষ বর্ষণ

# শেষ বর্ষণ

রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকা

গান আরম্ভ

রাজা। ওহে ধামো তোমরা, একটু ধামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই।  
নটরাজ, তোমাদের পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ। ( পুঁথি দিয়া ) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভাল বুঝতে পারিনে। কী লিখেছে? “শেষবর্ষণ”।

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা বেশ ভালো। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ। কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে খেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য  
লিখেই কবি খালাস, তার পরে জগতে তার মতো অদরকারি আর কিছু নেই। আখের  
রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালাল কেন?

নটরাজ। পাছে মহারাজ বলে বসেন, ভাব অর্থ সুর তান নয়, কিছুই বোঝা  
যাচ্ছে না সেই ভয়ে। লোকটা বড়ো ভিত্তু।

রাজকবি। এ তো বড়ো কোতুক। পাজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে  
চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব’লে বসে তাঁর আলো ঝাপসা।

রাজা। তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপতনের রাজার কাছ থেকে তাঁর  
গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ। ক্ষতি হবে না, গানগুলো শুধু পালাননি। অন্তঃসূর্য নিজে লুকিয়েছেন  
কিন্তু মেঘে মেঘে রং ছড়িয়ে আছে।

রাজকবি। তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড়ো সাদা।

নটরাজ। ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রং খুলতে থাকবে।

রাজা। কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে  
বোঝাবে কে?

নটরাজ । সে ভার আমার উপর । ইশারায় বুঝিয়ে দেব ।

রাজা । আমার কাছে ইশারা চলবে না । বিছাডের ইশারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই । আমি স্পষ্ট কথা চাই । পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে ?

নটরাজ । বর্ষাকে আহ্বান ক'রে ।

রাজা । বর্ষাকে আহ্বান ? এই আশ্বিন মাসে ?

রাজকবি । ঋতু-উৎসবের শব্দসাধনা ? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে ভুলবেন । অদ্ভুত রসের কীর্তন ।

নটরাজ । কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শব্দকে চেনা যায় না । আগে আবরণ তার পরে আলো ।

রাজা । ( পারিষদের প্রতি ) মানে কী হে ?

পারিষদ । মহারাজ, আমি ঠুঁদের দেশের পরিচয় জানি । ঠুঁদের হৈয়ালি বরফ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয় ।

রাজকবি । যেন দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, টানলে আরও বাড়তে থাকে ।

নটরাজ । বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তাহলেই সহজে বুঝবেন । দুই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায় । আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি ।

রাজা । রসো রসো । বর্ষাকে ডাকা কী রকম ? বর্ষা তো নিজেই ডাক দিয়ে আসে ।

নটরাজ । সে তো আসে বাইরের আকাশে । অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয় ।

রাজা । গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেই বাধা ?

নটরাজ । হাঁ মহারাজ ।

রাজা । এই আর এক বিপদ ।

রাজকবি । নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিনীর দুর্গতি ঘটাবেন । এখন রাজার কর্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা । মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্বদলকে খবর দিন না । দুই পক্ষের লড়াই বাধুক তা হলে কবির পক্ষে “শেষ বর্ষণ” নামটা সার্থক হবে ।

নটরাজ । রাগিনী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চল । উলটে, রাগিনীর হুকুমে ভাব যদি

পায়ে পায়ে নাকে খত দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অস্তিত্ব আমার দেশের চাল এ রকম নয়।

রাজা। ওহে নটরাজ, রস জিনিসটা স্পষ্ট নয়, রাগিনী জিনিসটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা না পাই, রাগিনীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তা হলে তো আমার মতো লোকের মুশকিল।

নটরাজ। মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্ম।

পারিষদ। অলমতিবিস্তরেণ। তোমাদের ধর্মে যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মতো সহ্য করব।

নটরাজ। ( গায়কগায়িকাদের প্রতি ) ঘনমেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। প্রাণের ধারায় তাঁর বাণী কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাতো, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এস নীপবনে ছায়াবীণিতলে,  
এস করো স্নান নবধারাজলে।  
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,  
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;  
কাজল নয়নে যুধীমালা গলে  
এস নীপবনে ছায়াবীণিতলে।  
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী,  
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।  
মল্লারগানে শুব মধুস্বরে  
দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে।  
ঘন বরিষনে জল-কলকলে  
এস নীপবনে ছায়াবীণিতলে।

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাউন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শব্দে বরিষে'।

রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অল্পভব করছেন কি প্রাণের আকাশের পূব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অঙ্ককার ঘনিষেছে। ওগো

সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিনীর মিল করো। ধরো ধরো,  
'ঝরে ঝর ঝর'।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,  
বিরহকাতর শব্দরী।  
ফিরিছে এ কোন অসীম রোদন  
কানন কানন মর্মরি।  
আমার প্রাণের রাগিনী আজি এ  
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।  
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে  
সমীরে সমীরে সঞ্চরি।

নটরাজ। শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুধালু তার জটা, চোখে তার বিছাৎ।  
অশ্রাস্ত ধারায় একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার  
সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ওই শুভ্র মহারাজ মেঘমল্লার।

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী  
আজি ভরা বাদরে।  
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,  
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,  
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে  
অশাস্ত বাতাসে।

রাজা। পূব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আসে?

নটরাজ। শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজকবি। শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো ঝাপটাই দেখা যাবে,  
তলোয়ারটা রইবে ইশারায়।

রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবল-  
মাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার জিত, কান্না বলছে আমার।  
ফুল ফোটান সঙ্গে ফুল ঝরার মালাবদল। ওগো কলধরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো,  
ও কী আনলে।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল,  
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্‌ নয়নের জল।

বাতল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে  
 যুধীবনের বেদন আসে,  
 ফুল-ফোটারোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।  
 কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,  
 ফেরে সে কোন স্বপনলোকে।  
 মন বসে রয় পথের ধারে,  
 জানে না সে পাবে কারে,  
 আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

রাজা। বেশ, বেশ, এটা মধুর লাগল বটে।  
 নটরাজ। কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?  
 রাজা। ওই দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই বুঝি?  
 নটরাজ। মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা  
 আঘাট তোমার মালা।  
 তোমার স্তামল শোভার বুকে  
 বিছাতেরি জ্বালা।  
 তোমার মস্তবলে  
 পাষণ গলে, কসল ফলে,  
 মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।  
 মরমর পাতায় পাতায়  
 ঝরঝর বারির রবে,  
 গুরু গুরু মেঘের মাদল  
 বাজে তোমার কী উৎসবে।  
 সবুজ সুধার ধারায় ধারায়  
 প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,  
 বামে রাখ ভয়ংকরী  
 বলা মরণ-ঢালা।



রাজা। সব রকমের খাপামিই তো হল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী ?

নটরাজ। বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে শ্রুতী মাহুঘও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে “অনুধাবৃষ্টি চেতঃ”, সেই যে পথ-চেয়ে-ধাকা আনমনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য, ধরো হে —

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি ।  
 হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী ।  
 পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে  
 বিনা কাজে সময় কাটে,  
 পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী ।  
 ব্যথা আমার কুল মানে না বাধা মানে না,  
 পরান আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না ।  
 মিলবে যে আজ অকুল পানে,  
 তোমার গানে আমার গানে,  
 ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী ।

নটরাজ। বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়াল, ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশাস্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল কিন্তু ওর বাণীটি আছে তোমার কণ্ঠে, মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে ।  
 আজি শ্রামল মেঘের মাঝে  
 বাজে কার কামনা ।  
 চলিছে ছুটিয়া অশাস্ত বায়,  
 ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,  
 করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ।

রাজা। আর নয় নটরাজ, বিরহের পালাটাই বড়ো বেশি হয়ে উঠল, ওজন ঠিক থাকছে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসৌম্য অঙ্ককার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারিদিকে ছলছল করছে, মিলনপদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।



রাজকবি । তাই না হয় হল কিন্তু অশ্রুবাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্যটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেললে তো চলবে না ।

নটরাজ । মিলনের আয়োজনও আছে । খুব বড়ো মিলন, অবনী'র সঙ্গে গগনের ।  
নাট্যাচার্য একবার শুনিয়ে দাও তো ।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে  
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে ।  
উৎসবসভা মাঝে  
শ্রাবণের বীণা বাজে,  
শিহরে শ্রামল মাটি প্রাণের আনন্দে ।  
তুই বৃল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে  
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে ।  
কাঁপিছে বনের হিয়া  
বরষনে মুখরিয়া,  
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবধন মঞ্চে ।

রাজা । আঃ, এতক্ষণে একটু উৎসাহ লাগল । ধামলে চলবে না । দেখো না, তোমাদের মাদলওআলার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একটু কাজ দাও ।

নটরাজ । বলি ও ওস্তাদ, ওই যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল, ওরা যে ব্যাপার মতো চলছে । ওদের সঙ্গে পালা দিয়ে চলো না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক না সুরে কথায় মেঘে বিছাতে ঝড়ে ।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অন্ধনে ।  
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিকরদেশের সঙ্গ নে ।  
দিক-হারানো দুঃসাহসে  
সকল বীধন পড়ুক খসে,  
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে ।  
বেদনা তোর বিজুলশিখা জলুক অস্তরে ;  
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্র-মস্তুরে ।  
অজানাতে করবি গাহন,  
ঝড় সে পথের হবে বাহন,  
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে ।

রাজকবি। ওই যে আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরি নেই, আবার কান্না নামল বলে।

নটরাজ। ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্ছে চোখের জলেরই জিত। বর্ষার রাতে সাধিহারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো; আজ বুঝি বা জীবনের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে কল্পণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে  
আজি এ সঘন জীবনপ্রাতে।  
ছিলে কি মোর স্বপ্নে  
সাধিহারা রাতে।  
বন্ধু, বেলা বুধা যায় রে  
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।  
কথা কও মোর হৃদয়ে  
হাত রাখো হাতে।

রাজা। কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য, তবে ওইটে শুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,  
জলসিক্ত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,  
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,  
স্ফাম গম্ভীর সরসা।  
শুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে  
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;  
নিখিল-চিন্ত-হরষা  
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।  
কোথা তোরা অগ্নি তরুণী পথিক-মলনা,  
জনপদবধু তড়িত-চকিত-নয়না,  
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,  
কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনঘনভঙ্গে এস ঘননীলবসনা,

মলিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশ্মনা,

আনো বীণা মনোহারিকা ।

কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ।

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,

বাজাও শব্দ, ছলুরব করো বধুরা,

এসেছে বরষা, ওগো নব অমুরাগিণী,

ওগো প্রিয়সুখভাগিণী ।

কুঞ্জকুটিরে, অগ্নি ভাবাকুললোচনা,

ভূজপাতায় করো নবগীত রচনা

মেঘমল্লার রাগিণী ।

এসেছে বরষা, ওগো নব অমুরাগিণী ।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,

ক্ষীণ কটিতটে গাঁধি লয়ে পরো করবী,

কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,

অঞ্জন আঁকো নয়নে ।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া,

ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া

স্মিত-বিকসিত বয়নে ;

কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে ।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,

গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,

তুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা,

গীতময় তরঙ্গলতিকা ।

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে

ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমন্দির বাতাসে

শতেক যুগের গীতিকা,

শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা ।

রাজা । বাঃ, বেশ জমেছে । আমি বলি আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক ।

নটরাজ । কিন্তু মহারাজ দেখছেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব । শেষ

কেয়াফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ার ভরে উঠল। ওই যে 'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।

একলা বসে বাদলশেষে শুনি কত কী।

'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।

বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে

ডেকে গেল আকাশপারে,

তাই তো সে যে উদাস হল

নইলে যেত কি।

ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,

উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।

শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে

গন্ধ যেত অভিসারে,

সঙ্ঘাতারা আড়াল থেকে

খবর পেত কি।

রাজা। নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।

নটরাজ। তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।

রাজা। তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মান, রাজার কথা মান না? আমি যদি বলি যেতে দেব না?

নটরাজ। তাহলে আমিও তাই বলব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো কল্পনিকা, বাদলের শ্রামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য। নটরাজ, ও বলছে ওর সময় গেল।

নটরাজ। গেলই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনই তো শুরু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোর কালোর যুগল মিলন।

শ্রামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে

সজল বিলোল আঁচল মেলে।

পুব হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে',

শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল বলে,

বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা

‘অসময়ের খেলা খেলে’ ।

কালো মেঘের আর কি আছে দিন ।

ও যে হল সাধিহীন ।

পূব হাওয়া কর, “কালোর এবার যাওয়াই ভালো”,

শব্দ বলে, “মিলবে যুগল কালোর আলো,

সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে

কালিমা ওর ঘুচিয়ে কেলে” ।

নটরাজ । শরতের প্রথম প্রভাতে ওই যে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে ।

মহারাজ দয়া করবেন, কথা কবেন না ।

রাজা । নটরাজ, তুমিও তো কথা কইতে কসুর কর না ।

নটরাজ । আমার কথা যে পালারই অঙ্গ ।

রাজা । আর আমার হল তার বাধা । তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না হয় হল ছড়ি, দুইয়ে মিলেই তো বরনা । সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ । যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে ।

নটরাজ । এবার বুঝছি আপনি ছন্দরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন ।  
আর আমার জয় রইল না । গীতাচার্য গান ধরো ।

দেখো শুকতারা আঁধি মেলি চায়

প্রভাতের কিনারায় ।

ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে

আয় আয় আয় ।

ও যে কার লাগি জ্বলে দীপ,

কার ললাটে পরায় টিপ,

ও যে কার আগমনী গায়—

আয় আয় আয় ।

জাগো জাগো, সখী,

কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি ।

মাণ্ডীর বনে বনে

ওই গুন ক্ষণে ক্ষণে

কহিছে শিশিরবার

আয় আয় আয় ।

নটরাজ । ওই দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌঁছেছে । আকাশের আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিল ওই শেকালি । সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অশ্রান্ত বরা আর কোটা । দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্যে, তার ব্যথা কখন বোঝে ? সেই করুণার গান সজ্জার সুরে তোমরা ধরো ।

ওলো শেকালি,

সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বলিস দীপালি ।

তারার বাণী আকাশ থেকে

তোমার রূপে দিল এঁকে

জ্বামল পাতায় ধরে ধরে আখর রূপালি ।

বুকের ধসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে

কাননবীধির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে ।

সারাটা দিন বাটে বাটে

নানা কাজে দিবস কাটে,

আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি ।

রাজা । নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেকালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে ?

নটরাজ । আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে । যে মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়ারূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে । সেই ছায়ারূপিনীর নূপুর বাজল, করুণ চমক দিল কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো ।

যে-ছায়ায় ধরব বলে করেছিলেন পণ

আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন ।

আকাশে যার পরশ মিলার

শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলার

আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন ।

অলস দিনের হাওয়ায়

গন্ধধানি মেলে যেত গোপন আসাযাওয়ায় ।

আজ শরতের ছায়ানটে

মোর রাগিণীর মিলন ঘটে

সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে করুণ ।

নটরাজ । শুভ শাস্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎকালী । সজল হাওয়ায় দোল



ধেমি ঘাক—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে  
বিকলিত হয়ে উঠুক।

এস শরতের অমল মহিমা,

এস হে ধীরে।

চিন্তা বিকাশিবে চরণ ধীরে।

বিরহ-ভরসে অকুলে সে যে দোলে

দিবাধামিনী আকুল সমীরে।

### বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই  
অবগুষ্ঠন। রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল  
হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে  
আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে, তাই  
আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা,

কেন সূদূর গগনে গগনে

আছ মিলায়ে পবনে পবনে

কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া

ঘাও শিখিরে শিখিরে গলিয়া

কেন চপল আলোতে ছায়াতে

আছ লুকায়ে আপন মায়াতে

তুমি মূরতি ধরিয়া চকিতে নামো না।

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,

তুণ উঠুক শিহরি শিহরি।

নামো তালপল্লববীজনে,

নামো জলে ছায়াছবি সৃজনে,

এস সৌরভ ভরি আঁচলে,

আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে,

যম চোখের সমুখে অনেক নামো না ॥

ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা ।

কত আকুল হাসি ও রোদনে,  
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,  
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,  
ভরি নিশীথ-তিমির ধালিকা,  
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,  
সাজে ঝিল্লি-কাঁকর বাজায়ে,

কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা ।

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা ।

ওই বসেছ শুভ্র আসনে  
আজি নিখিলের সম্ভাষণে ।  
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে  
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে ?  
আহা বরিল তোমারে কে আজি  
তার হৃৎ-শয়ন তেয়াজি',

তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা ।

নটরাজ । প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুষ্ঠন খুলে দেখো ।  
চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎ-প্রতিমা । বর্ষার ধারায় যার কণ্ঠ গদগদ, শিউলি-  
বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি ।

এবার অবগুষ্ঠন খোলো ।

গহন মেঘমায়ায় বিজ্ঞান বনছায়ায়  
তোমার আলসে অবলুষ্ঠন সারা হল ।  
শিউলি-স্বরভি রাতে  
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে  
মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী ব'লো ।  
গোপন অশ্রুজলে মিলুক শরৎ-হাসি—  
মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি ।  
শিশিরসিক্ত বায়ে  
বিজড়িত আলোছায়ে

বিরহমিলনে গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো ।

[ অবগুষ্ঠন মোচন



নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী ?  
এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে ?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।  
তুমি শরৎপ্রান্তের আলোর বাণী।  
সারাবেলা শিউলিঘনে  
আছি মগন আপন মনে,  
কিসের ভুলে রেখে গেলে  
আমার বুকে ব্যথার বাঁশিধানি।  
আমি যা বলিতে চাই হল বলা,  
ওই শিশিরে শিশিরে অঙ্গগলা।  
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে  
সেই মুরতি এই বিরাজে,  
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা  
আমার অকারণ বেদনার বীণাপানি।

রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে ? বলো তো এবার কে আসবে ?  
নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর  
ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

### সুন্দরের প্রবেশ

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে ?  
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিক।।  
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,  
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে  
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল

মধুর শেকালিকা।।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষীর সহচরটি এরই মধ্যে চকল হয়ে উঠলেন কেন ?  
নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি করে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোর  
যায় মিলিয়ে। কবিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিবে চলে যান।  
এই বাওয়াআসার স্বর্গমর্ত্যের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,  
 এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,  
 ঝরা শেকালির পথ বাহিয়া ।  
 কোন্ অমরার বিরহিণীয়ে  
 চাহনি কিরে,  
 কার বিষাদের শিশিরনীরে  
 এলে নাহিয়া ।  
 ওগো অকরণ, কী মায়ী আন,  
 মিলনছলে বিরহ আন ।  
 চলেছ পথিক আলোক-যানে  
 আঁধারপানে,  
 মন-ভুলানো মোহন ভানে  
 গান গাহিয়া ।

নটরাজ । এইবার কবির বিদায় গান । বাঁশি হবে নীরব । যদি কিছু থাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে ।

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে ।  
 বাঁশি, তোমায় দিবে যাব কাহার হাতে ।  
 তোমার বুকে বাজল ধ্বনি  
 বিদায়গাথা, আগমনী, কত যে,  
 কাস্তানে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে ।  
 যে কথা কর প্রাণের ভিতর অগোচরে  
 গানে গানে নিরেছিলে চুরি করে ।  
 সময় যে তার হল গত  
 নিশিষেষের তারার মতো

তারে শেষ করে দাও নিউলিফুলের মরণ সাথে ।

রাজা । ও কী । একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি ? কেবল দুঃখের অস্ত্রে গান বাঁধা হল, গান সারা হল ! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকর্ষা—তার পরে ?

নটরাজ । ‘তার পরে’ প্রশ্নের উত্তর নেই সব চূপ । এই তো সৃষ্টির লীলা এ তো রূপণের পূজি নয় । এ যে আনন্দের অমিতব্যয় । মুহূর্ত ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি । বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম । তার পরে ? কেউ চূপ করে শোনে,

কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোগে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে  
কী আসে যায় ?

গান আমার যায় ভেসে যায়,  
চাঙ্গনে কিরে দে তারে বিদায়।  
সে যে দখিন হাওয়ার মুকুল করা,  
ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,  
সে যে শিলিরকোটের মালা গাঁথা বনের আউনিয়।  
কাদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,  
মেঘের গায়ে রঙের মায়ী খেলার পরে খেলা  
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি  
গেল চলে কতই তরী  
উজানবায়ের ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।  
রাজা। উত্তম হয়েছে।  
রাজকবি। আরও অনেক উত্তম হতে পারত।

---

# নটীর পূজা

## নাট্যোল্লিখিত পাত্রীগণ

লোকেশ্বরী

রাজমহিষী, মহারাজ বিধিসারে পত্নী

মল্লিকা

মহারানী লোকেশ্বরীর সহচরী

বাসবী, নন্দা, রত্নাবলী, অজিতা, ভদ্রা

রাজকুমারীগণ

উৎপলপর্ণা

বৌদ্ধ ভিক্ষুণী

শ্রীমতী

বৌদ্ধধর্মব্রতা নটী

মালতী

বৌদ্ধধর্মাম্বুবাগিনী পল্লীবালা, শ্রীমতীর সহচরী

রাজকিংকরী ও রক্ষণীগণ

# সূচনা

ভিক্ষু উপালির প্রবেশ

গান

পূর্বগগনভাগে

দীপ্ত হইল সুপ্রভাত

তরুণারুণরাগে ।

শুভ শুভ মুহূর্ত আজি

সার্থক কর রে,

অমৃতে ভর রে

অমিত পুণ্যভাগী কে

জাগে, কে জাগে ।

কে আছ ? ভিক্ষা চাই, ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা আমার ।

নটীর প্রবেশ ও প্রণাম

শুভস্ববতু কল্যাণম্ । বংসে, তুমি কে ?

নটী । আমি এই রাজবাড়ির নটী ।

উপালি । এই পুরীতে আজ একা কেবল তুমিই জেগে ?

নটী । রাজকন্টারা সকলেই ঘুমিয়ে আছেন ।

উপালি । ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই ।

নটী । প্রভু, অমুম ত করুন, রাজকন্টারদের ডেকে আনি ।

উপালি । আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি ।

নটী । আমি যে অভাগী । প্রভুর ভিক্ষাপাত্রে আমার দান কুষ্ঠিত হবে । কী দেব অমুমতি করুন ।

উপালি । তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান ।

নটী । আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী সে তো আমি জানিনে ।

উপালি । না, ভগবান তোমাকে দয়া করেছেন, তিনি জানেন ।

নটী । প্রভু, তাহলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন যা আছে আমার ।

উপালি। তাই নেবেন, তোমার পূজার ফুল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে পুষ্প-বনের আশ্রদানকে আপনিই আগিয়ে তোলেন। তোমার সেইদিন এসেছে আমি তোমাকে আনিরে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী।

নটী। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

[ প্রস্থান ]

### রাজকন্যাদের প্রবেশ

প্রভু, ভিক্ষা নিয়ে যান। কিরে যাবেন না, কিরে যাবেন না। এ কী হল? চলে গেলেন?

রত্নাবলী। ভয় কী তোমাদের, বাসবী? ভিক্ষা নেবার লোকের অভাব নেই—ভিক্ষা দেবার লোকই কম।

নন্দা। না রত্না, ভিক্ষা নেবার লোককেই সাধনা করে খুঁজে পেতে হয়। আজকের দিন ব্যর্থ হল।

[ প্রস্থান ]

---

# নটীর পূজা

## প্রথম অঙ্ক

মগধপ্রাসাদ কুঞ্জবনে

মহারানী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা

লোকেশ্বরী। মহারাজ বিধিসার আজ আমাকে স্মরণ করেছেন ?

ভিক্ষুণী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। আজ তাঁর অনোকটৈতো পূজা-আয়োজনের দিন— সেইজন্মেই বুদ্ধি ?

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমা।

লোকেশ্বরী। পূজা ? কার পূজা ?

ভিক্ষুণী। আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মাংসব— তাঁর উদ্দেশে পূজা।

লোকেশ্বরী। আর্থপুত্রকে ব'লো গিয়ে আমার সব পূজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি।

কেউ বা ফুল দেয় দীপ দেয়—আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি।

ভিক্ষুণী। কী বলছ মহারানী ?

লোকেশ্বরী। আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র—রাজপুত্র আমার,— তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।

ভিক্ষুণী। যাকে দিয়েছ তাকে হারাওনি। কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিধে তাকেই পেয়েছ।

লোকেশ্বরী। নারী, তোমার ছেলে আছে ?

ভিক্ষুণী। না।

লোকেশ্বরী। কোনোদিন ছিল ?

ভিক্ষুণী। না। আমি প্রথমযয়সেই বিধবা।

লোকেশ্বরী। তাহলে চুপ করো। যে-কথা জান না সে-কথা ব'লো না।

ভিক্ষুণী। মহারানী, সত্যধর্মকে তুমিই তো রাজ্যান্তঃপুরে সকলের প্রথমে আহ্বান করে এনেছিলে ? তবে কেন আজ—



লোকেশ্বরী। আশ্চর্য—মনে আছে তো দেখি! ভেবেছিলেম সে-কথা বুঝি তোমাদের গুরু ভুলে গিয়েছেন। ভিক্ষু ধর্মকটিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, এক-শ ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতিবৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বুদ্ধের ধর্মবৈরী দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলমল, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উচ্চানের অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই পুরস্কার আমারই! যে-মহিষীরা বিদ্বেষে জলেছিল, আমার অগ্নে বিষ মিশিয়েছে যারা, তাদের তো কিছুই হল না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

ভিক্ষুণী। সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয় মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

লোকেশ্বরী। যেদিন দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কুমার অজাতশত্রু, আমি নিবোধ সেদিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সমুদ্র পার হতে চায়। দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভয়ে সগর্বে বললেম, দেবদত্তের চেয়েও যে-গুরুর পুণ্যের জোর বেশি তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার। ভগবান বুদ্ধকে—শাক্যসিংহকে—আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্ষপুত্রকে আশীর্বাদ করালেম। তবু জয় হল কার?

ভিক্ষুণী। তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিও না।

লোকেশ্বরী। আমারই!

ভিক্ষুণী। নয় তো কী! পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিধিসার স্বৈচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে রাজ্য জয় করেছিলেন—

লোকেশ্বরী। সে রাজ্য মুখের কথা, কৃত্রিম রাজ্যের পক্ষে সে বিজয়। আর আমার দিকে তাকাও দেখি। আমি আজ স্বামীসঙ্গে বিধবা, পুত্রসঙ্গে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা। এটা তো মুখের কথা নয়। যারা তোমাদের ধর্ম কোনো দিন মানেনি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে। তোমরা যাকে বল শ্রীবজ্রসব্ব, আজ কোথায় তিনি—পড়ুক না তাঁর বজ্র এদের মাথায়।

ভিক্ষুণী। মহারানী, এর মধ্যে সত্য আছে কোথায়। এ তো ক্ষণকালের স্বপ্ন—যাক না ওয়া হেসে।

লোকেশ্বরী। স্বপ্ন বটে! তা এই স্বপ্নটা আমি চাইনে। আমি চাই অস্ত্র স্বপ্নটা,

যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে বলে মান। সেই স্বপ্নে বিকশিত হয়ে ওইদিকে ধারা মাথা উচু করে বেড়াচ্ছেন, বলো না তাঁদের গিয়ে পূজা দিন না তাঁরা।

ভিক্ষুণী। যাই তবে।

লোকেশ্বরী। যাও, কিন্তু আমার মতো নির্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছুই হারাবে না, সবই থাকবে,—ওরা তো বুদ্ধকে মানেনি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়েনি, তাই বেঁচে গেল, বেঁচে গেল ওরা। অমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ধৈর্যের ভান করতে শিখেছ?

ভিক্ষুণী। কেমন করে বলব? এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী। ধৈর্য ভঙ্গ হয় তবু মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করছ। তোমাদের এই নীরব স্পর্ধা অসহ্য। যাও। [ ভিক্ষুণীর প্রস্থানোত্তম

শোনো শোনো, ভিক্ষুণী। চিত্র কী একটা নতুন নাম নিয়েছে। জান তুমি?

ভিক্ষুণী। জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী। যে-নামে তার যা তাকে ডেকেছে সেটা আজ তার কাছে অশুচি! তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল।

ভিক্ষুণী। মহারানী যদি ইচ্ছা কর তাঁকে একদিন তোমার কাছে আনতে পারি।

লোকেশ্বরী। আমি ইচ্ছা করতে যাব কোন্ লজ্জায়। আর আজ তুমি আনবে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেছে তাকে এই পৃথিবীতে!

ভিক্ষুণী। তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী। একটু ধামো। তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

ভিক্ষুণী। হয়।

লোকেশ্বরী। আচ্ছা, একবার না হয় তাকে—যদি সে—না, থাক।

ভিক্ষুণী। আমি তাঁকে বলব। হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। [ প্রস্থান

লোকেশ্বরী। হয়তো, হয়তো, হয়তো! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে ‘হয়তো’ ছিল না। এতদিনের সেই মাতৃস্নেহের দাবি আজ এই একটু খানি হয়তো-র এসে ঠেকল। একেই বলে ধর্ম! মল্লিকা।

### মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। দেবী।

লোকেশ্বরী। কুমার অজাতকাত্তর সংবাদ পেলে?

মল্লিকা। পেয়েছি। দেবদত্তকে আনতে গেছেন। এ-রাজ্যে ত্রিরত্ন-পূজার কিছুই বাকি থাকবে না।

লোকেশ্বরী। ভীক! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে। বুদ্ধ-ধর্মের কত যে শক্তি তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তবু ওই অপদার্থ দেবদত্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হল না।

মল্লিকা। মহারানী যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সম্বন্ধেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অমনি উনি দেবদত্ত শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরও বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী। আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা। দেবী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণীর মতোই তোমার একথা। তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারানীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে সব খোঁটায় মানুষকে বাঁধে, ভগবান মহাবোধির কৃপায় সেই সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী। দেখো ওই সব বানানো কথা শুনলে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতিনির্মল ফাঁকা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ওই মাটিতে মাথা খুঁটি কটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তাহলে আবার না হয় অশোকচৈত্যে দ্বীপ জালব, এক-শ শ্রমণকে অন্ন দেব, ওদের যত মন্ত্র আছে সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর তা যদি না হয় তো আসন্ন দেবদত্ত, তা তিনি সাঁচ্চাই হ'ন আর বুঁটোই হ'ন। যাই, একবার প্রাসাদ শিখরে গিয়ে দেখিগে এঁরা কতদূরে। [ উভয়ের প্রস্থান

### বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ

শ্রীমতী। ( সত্যাবিতানতলে আসন বিছাইয়া, দূরে চাহিয়া ) সময় হল, এস তোমরা।

আপন মনে গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,

কী জানি কী জানি।

সে কি ঘুমে সে কি আগরণে,

কী জানি কী জানি।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। তুমি শ্রীমতী?

শ্রীমতী। হাঁ গো, কেন বলো তো।

মালতী । প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে ।

শ্রীমতী । প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্বে কখনো দেখিনি ।

মালতী । নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী ।

শ্রীমতী । কেন এলে বাছা ? সেখানে কি দিন কাটছিল না ? ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুশি ; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে । বার্থ হবে তোমার বসন্ত । গান শিখতে এসেছ ? এইটুকু তোমার আশা ?

মালতী । সত্যি বলব ? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা । বলতে সংকোচ হয় ।

শ্রীমতী । ও, বুঝেছি । রাজরানী হবার ছুরাশা । পূর্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি করে থাক তো হতেও পার । বনের পাখি সোনার বাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুটু বুদ্ধি । যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে ।

মালতী । কী তুমি বলছ, দিদি, ভালো বুঝতে পারছি নে ।

শ্রীমতী । আমি বলছি—

গান

বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায়,  
হায় অভাগী ।

মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,  
হায় অভাগী ।

মালতী । তুমি আমাকে কিছুই বোঝনি । তবে স্পষ্ট করে বলি । শুনেছি একদিন ভগবান বুদ্ধ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায় । মহারাজ বিদ্বিসার সেইখানেই নাকি বেদী গড়ে দিয়েছেন ।

শ্রীমতী । হাঁ, সত্য ।

মালতী । রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন ।—আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধূলা কাঁট দেব এই আশা করে এখানে গায়িকার দলে ভরতি হয়েছি ।

শ্রীমতী । এস এস বোন, ভালো হল । রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোওয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম । তোমার নির্মল হাতদুখানির জন্তে অপেক্ষা ছিল । কিন্তু এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে ?

মালতী । কেমন করে বলব, দিদি । আজ বাতাসে বাতাসে যে আঙনের মতো কী এক মত্ত লেগেছে । সেদিন আমার ভাই গেল চলে । তার বয়স আঠারো । হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, “কোথায় যাচ্ছিস ভাই”, সে বললে, “খুঁজতে ।”



শ্রীমতী। নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ একতাকে ডেকেছে। পূর্ণ চাঁদ উঠল।—  
এ কী। তোমার হাতে যে আংটি দেখি। কেমন লাগছে যে। স্বর্গের মন্দিরকুঁড়ি  
তো ধুলোর দামে বিক্রিয়ে গেল না?

মালতী। তবে ধুলে বলি—তুমি সব কথা বুঝবে।

শ্রীমতী। অনেক কৈদে বোঝবার শক্তি হয়েছে।

মালতী। তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চূপ করে তাঁকে দেখেছি।  
একদিন নিজে এসে বললেন “মালতীকে আমার ভালো লাগে।” বাবা বললেন,  
“মালতার সৌভাগ্য।” সব আয়োজন সারা হল যেদিন এলেন তিনি দ্বারে। বরের  
বেশে নয় ভিক্ষুর বেশে। কাষায়বস্ত্র, হাতে দণ্ড। বললেন, “যদি দেখা হয় তো মুক্তির  
পথে, এখানে নয়।”—দিদি, কিছু মনে ক’রো না—এখনো চেখে জল আসছে, মন  
যে ছোটো।

শ্রীমতী। চোখের জল বয়ে থাক না। মুক্তিপথের ধুলো ওই জলে মরবে।

মালতী। প্রণাম করে বললেন, “আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয়নি। যে আংটি  
পরাবে কথা দিয়েছিল সেটি দিয়ে যাও।” এই সেই আংটি। ভগবানের আরতিতে এটি  
যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খসে পড়বে সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী। কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চাঁবর  
পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে, না পথিকের টানে? কতবার হাত  
জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি—বলি, “মহাপুরুষ, উদাসীন থেকে না। আজ ঘরে  
ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শাস্তি দাও।”  
রাজবাড়ির মেয়েরা ওই আসছেন।

বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ

বাসবী। এ মেয়েটি কে, দেখি দেখি। চুল চূড়া করে বেঁধেছে, অলকে দিয়েছে  
জবা। নন্দা, দেখে যাও, আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কী করম উচু করে জড়িয়েছে।  
গলায় বুঝি কুঁচকলের হার? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এল?

শ্রীমতী। গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী। পেয়েছ একটি শিকার! ওকে শিষ্টা করবে বুঝি? আমাদের উদ্ধার  
করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধরে মুক্তির ব্যবসা চালাবে!

শ্রীমতী। গ্রামের মেয়ের মুক্তির ভাবনা কী। ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা  
পড়েনি—না ধুলায়, না মণিমানিক্যে—স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেন।

রত্নাবলী। স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাইনে। গণেশের ইচ্ছার কুপায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই, বরঞ্চ যমরাজের মহিষটাকে মানতে রাজি আছি।

নন্দা। রত্না তোমার বাহন তো তৈরিই আছে,—লক্ষ্মীর পৈচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিজ্রপ। ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী। ওর চূপ করে থাকাই তো রানীকৃত উপদেশ। ওই দেখো না, চূপি চূপি হাসছে। ওটা কি উপদেশ হল না?

রত্নাবলী। মহৎ উপদেশ। অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে ভয় করবে, হাশুর দ্বারা ভাবকে।

বাসবী। একটু ঝগড়া কর না কেন শ্রীমতী? এত মধুর কি সহ্য হয়? মাহুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মাহুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী। ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভান করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কের ভান করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু অমাবস্তা! সে যদি মেঘের মুখোশ পরে?

অজিতা। ওই দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে, রাজবাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম ভুলে গেছি।

মালতী। মালতী।

অজিতা। কী ভাবছিলে বলো না।

মালতী। দিদিকে ভালোবেসেছি, তাই ব্যথা লাগছিল।

অজিতা। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলংকারশাস্ত্রের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা। মালতী, কী একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিলে। বলেই ফেলো না। আমাদের তুমি কী ভাব জানতে তারি কৌতূহল হয়।

মালতী। আমি বলতে চাচ্ছিলেম, “হাঁ গা, তোমরা নিজের কথা শুনেই এত ভালোবাস, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।”

### সকলের উচ্চহাস্য

বাসবী। হাঁ গা, হাঁ গা। রাজবাড়ির ব্যাকরণচক্রে ডাকো, তাঁর শিক্ষা সম্বোধনের শেষ পর্যন্ত পৌছয়নি।

রত্নাবলী। হাঁ গা বাসবী, হাঁ গা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা।

বাসবী । ইঁ গা রত্নাবলী, ইঁ গা ভুবনমোহনলাবণ্যকৌমুদী—ব্যাকরণের এ কী নূতন সম্পদ । সন্মোদনে ইঁ গা ।

মালতী । দিদি, এঁরা কি আমার উপরে রাগ করেছেন ?

নন্দা । ভয় নেই তোমার মালতী । দিগ্বালিকারা শিউলিবনে যখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ ক'রে করে না, তাদের আদর করবার প্রথাই ওই ।

অজিতা । ওই দেখো, শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্ছে । আমাদের কথা ওর কানেই পৌঁছচ্ছে না । শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাও না, আমরাও যোগ দেব ।

### শ্রীমতীর গান

নিশীথে কী করে গেল মনে,

কী জানি, কী জানি ।

সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে

কী জানি কী জানি ।

নানাকাজে নানামতে

কিরি ঘরে, কিরি পথে

সে-কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে

কী জানি, কী জানি ।

সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,

একি ভয়, একি জয় ।

সে-কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়

“আর নয়, আর নয় ।”

সে-কথা কি নানাসুরে

বলে মোরে, “চলো দূরে,”

সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,

কী জানি, কী জানি ।

বাসবী । মালতী, তোমার চোখে যে জল ভরে এল । এ-গানের মধ্যে কী বুঝলে বলো তো ।

মালতী । শ্রীমতী ডাক শুনেছে ।

বাসবী । কার ডাক ?

মালতী । যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে । যার ডাকে আমার—

বাসবী । কে, কে তোমার ?

শ্রীমতী । মালতী, বোন আমার, চূপ, আর বলিসনে । চোখ মুছে ফেল, এ কাঁদবার জায়গা নয় ।

বাসবী । শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন ? তুমি কি মনে ভাব আমরা কেবল হাসতেই জানি ?

ভদ্রা । আমরা কি একেবারেই জানিনে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না ?

মালতী । রাজকুমারী, আজ ভেঁ বাতাসে বাতাসে কথা চলছে তোমরা শোননি ?

নন্দা । সকালের আলোতে পদ্যের পাপড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল তো খোলে না ।

### লোকেশ্বরীর প্রবেশ । সকলের প্রণাম

লোকেশ্বরী । আমি সহ করতে পারছি নে । ওই শুনছ না রাস্তার রাস্তার স্তবের ধ্বনি—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সংঘায় মহত্তমায় । শুনলে এখনো আমার বুকের ভিতর ঢুলে ওঠে ।

( কানে হাত দিয়া ) আজই ধামিয়ে দেওয়া চাই । এখনই, এখনই ।

মল্লিকা । দেবী শাস্ত হ'ন ।

লোকেশ্বরী । শাস্ত হব কিসে ? কোন্ মন্ত্রে শাস্ত করবে ? সেই, নমঃ পরমশাস্তার মহাকাঙ্ক্ষনিকায়—এ মন্ত্র আর নয়, আর নয় । আমার মন্ত্র, নমো বজ্রক্রোধডাকিনী, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায় । অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শাস্তি আসবে । নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের মতো ধসে ধসে পড়বে ।—তোমরা কুমারীরা এখানে কী করছ ?

রত্নাবলী । ( হাসিয়া ) অপেক্ষা করছি উদ্ধারের । মলিন মনকে নির্মল করে এই শ্রীমতীর শিষ্টা হবার পথে একটু একটু করে এগোচ্ছি ।

বাসবী । অশ্রাব্য তোমার এই অভ্যুক্তি ।

লোকেশ্বরী । এই নটীর শিষ্টা । শেষকালে তাই ঘটবে, সেই ধর্মই এসেছে । পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে । শ্রীমতী বুদ্ধি আজ হঠাৎ সাধবী হয়ে উঠেছে । যেদিন ভগবান বুদ্ধ অশোকবনে এসেছিলেন রাজপুরীর সকলেই তাঁকে দেখতে এল, একেও দূর করে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন । পাপিষ্ঠা এলই না । তবু আজ নাকি ভিক্ষু উপালি রাজবাড়িতে একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায় । মুঢ়, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম । যেখানে রাজ্যের



প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে—একে ধর্ম বলিস তোরা আত্মঘাতিনীরা ?  
উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর দেখি নটী। দেখি কতবড়ো সাহস।  
পাপরসনার পঙ্কাঘাত হবে না ?

শ্রীমতী। ( করজোড়ে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া )

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে  
নমো ধর্মায় তারিণে

নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ ।

লোকেশ্বরী। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—ধাক ধাক ধাম ধাম ।

শ্রীমতী। মন্দিতার অনাথায় অলুকাপায় যে বিভো—

লোকেশ্বরী। ( বক্ষে করাঘাত করিয়া ) ওরে অনাথা, অনাথা । শ্রীমতী একবার  
বলো তো, মহাকারুণিকো নাথো—

উভয়ে আরতি

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সৰ্বপাণিনঃ

পূরেত্বা পারমী সৰ্বা পন্তো সঙ্ঘোধিমুক্তমম্ ।

লোকেশ্বরী। হয়েছে, হয়েছে, থাক আর নয় । নমো বজ্রকোষডাকিনী ।

অনুচরীর প্রবেশ

অনুচরী। মহারানী, এইদিকে আসুন নিভূতে ।

( জনান্তিকে ) রাজকুমার চিত্র এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ।

লোকেশ্বরী। কে বলে ধর্ম মিথ্যা। পুণ্যমঞ্জের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল ।  
ওরে বিশ্বাসহীনরা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি । মহাকারুণিকো  
নাথো, তাঁর করুণার কতবড়ো শক্তি । পাথর গলে যায় এই আমি তোদের সবাইকে  
বলে যাচ্ছি, পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন । যারা ভগবানকে অপমান  
করছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে ।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধর্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি । [ বলিতে বলিতে অনুচরীসহ প্রস্থান

রত্নাবলী। মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্‌দিক থেকে বইল ?

মল্লিকা। আজকাল আকাশ জুড়ে এ যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির

স্থিরতা আছে ? হঠাৎ কাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। সেই যে কলন্দক আজ চল্লিশ বছর জুয়ো খেলে কাটালে, সে হঠাৎ শুনি নাকি ওদের অর্ধৎ হয়ে উঠেছে। আবার নন্দিবর্ধন, যজ্ঞে যে সর্বস্ব দিতে পণ করলে আজ ব্রাহ্মণ দেখলে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী। তাহলে রাজকুমার চিত্র কিরে এলেন।

মল্লিকা। দেখো না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মালতী। ভগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন সেদিন শ্রীমতীদিদি তাঁকে দেখতে যাওনি, একি সত্য ?

শ্রীমতী। সত্য। তাঁকে দেখা দেওয়াই যে পূজা দেওয়া। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না !

মালতী। হায় হায়, তবে কী হল দিদি।

শ্রীমতী। অভ সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখলেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুনলেই কি শোনা যায় ?

রত্নাবলী। ইস, এটা আমাদের 'পরে কটাক্ষপাত হল। একটু প্রভয়ের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্মের আবরণ উড়ে যায়।

শ্রীমতী। কৃত্রিম সৌজন্মের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পষ্টই বলব, তোমাদের চোখ যাকে দেখেছে তোমরা তাঁকে দেখনি।

রত্নাবলী। বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্ধা সহ্য করছ কেমন করে ?

বাসবী। বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তাহলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর-একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার ধয়ে থাক।

শ্রীমতী।

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে

নমো ধর্মায় তারিণে

নমঃ সংসার মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা। ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অস্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী। বিনয় ভুলেছ নটী ! এ-কথার প্রতিবাদ করবে না ?

শ্রীমতী। কেন করব রাজকুমারী ? তিনি যদি আমারও অস্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই ?

বাসবী। থাক থাক মুখের কথার কথা বেড়ে যায়। ভূমি গান গাও।

## শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে  
খুঁজিতে আমার আপনারে ?

তোমারি যে ডাকে  
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নয় আঁধে আঁধে,  
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে ।  
তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে,  
শ্রামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে ।  
সে-ডাকে তোমারি  
মহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,  
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে ।

নেপথ্যে । ওঁ নমো রত্নত্রয়ার বোধিসত্ত্বায় মহাসত্ত্বায় মহাকারুণিকায় ।

## উৎপলপর্ণার প্রবেশ

সকলে । ভগবতী, নমস্কার ।

ভিক্ষুণী । ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্ষতু সৰ্বদেবতা  
সৰ্ববুদ্ধাত্মভাবেন সদা সোখী ভবতু তে ।

শ্রীমতী ।

শ্রীমতী । কী আদেশ ?

ভিক্ষুণী । আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব । অশোকবনে

তীর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর ।

রত্নাবলী । বোধ হয় ভুল শুনলেম । কোন্ শ্রীমতীর কথা বলছেন ?

ভিক্ষুণী । এই যে, এই শ্রীমতী ।

রত্নাবলী । রাজবাড়ির এই নটী ?

ভিক্ষুণী । হাঁ, এই নটী ।

রত্নাবলী । স্ববিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন ?

ভিক্ষুণী । তাঁদেরই এই আদেশ ।

রত্নাবলী । কে তাঁরা ? নাম শুনি ।

ভিক্ষুণী । একজন তো উপালি ।

রত্নাবলী । উপালি তো নাপিত ।

ভিক্ষুণী। সুনন্দও বলছেন।

রত্নাবলী। তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষুণী। সুনীতেরও এই আদেশ।

রত্নাবলী। তিনি নাকি জাতিতে পুকুস।

ভিক্ষুণী। রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।

রত্নাবলী। নিশ্চয় জানিনে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন?

ভিক্ষুণী। সে-কথা সত্য। রাজপিতা বিহিসার রাজগৃহ-নগরীর নির্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে ত্রুতপালন করবেন। তাঁকে সংবর্ধনা করে আনিগে। [ প্রস্থান

অজিতা। কোথায় চলেছ শ্রীমতী?

শ্রীমতী। অশোকবনের আসনবেদী ধোঁত করতে যাব।

মালতী। দিদি আমাকে সঙ্গে নিয়ো।

নন্দা। আমিও যাব।

অজিতা। ভাবছি গেলে হয়।

বাসবী। আমিও দেবিগে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কী রকম।

রত্নাবলী। কী শোভা! শ্রীমতী করবে পূজার উদ্‌ঘোষ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবীজন।

বাসবী। আর এখান থেকে তুমি অভিশাপের উচ্চ নিশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দগ্ধ হবে না, শ্রীমতীর শাস্তিও থাকবে অক্ষুণ্ণ।

রত্নাবলী ও মল্লিকা ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। সইবে না! সইবে না! এ একেবারে সমস্তর বিরুদ্ধ। মল্লিকা, পুরুষ হয়ে জন্মানুম না কেন। এই কঙ্কণপরা হাতের পরে ধিক্কার হয়। যদি থাকত তলোয়ার! তুমিও তো মল্লিকা সমস্তক্ষণ চূপ করে বসে ছিলে, একটি কথাও কওনি। তুমিও কি ওই নটীর পরিচারিকার পদ কামনা কর?

মল্লিকা। করলেও পাব না। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী। চূপ করে সঙ্কল্প কর কী করে বুঝতে পারিনে। ধৈর্য নিকুপায় ইতর লোকের অন্ত, রাজার ঘেরেদের না।

মল্লিকা। আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপব্যয় করিবেন।

রত্নাবলী। নিশ্চিত জান ?

মল্লিকা। নিশ্চিত।

রত্নাবলী। গোপন কথা যদি হয় ব'লো না। কেবল এইটুকু জানতে চাই ওই নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় পূজা করবে আর রাজকন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

মল্লিকা। না কিছুতেই না। আমি কথা দিচ্ছি।

রত্নাবলী। রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সার্থক করুন।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### রাজোচ্চান

#### লোকেশ্বরী ও মল্লিকা

মল্লিকা। পুত্রের সঙ্গে তো দেখা হল মহারানী। তবে এখনো কেন—

লোকেশ্বরী। পুত্রের সঙ্গে ? পুত্র কোথায় ? এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি। আগে বুঝতে পারিনি।

মল্লিকা। এমন কথা কেন বলছেন।

লোকেশ্বরী। পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মার কাছে আসে তার মতো দুঃখ আর নেই। কী রকম করে সে চাইলে আমার দিকে। তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে— কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই। নিজের এতবড়ো নিঃশেষে সর্বনাশ করনাও করতে পারতুম না।

মল্লিকা। রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্মল নূতন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী। হায় রে রক্তমাংস। হায় রে অসহ ক্ষুধা, অসহ বেদনা। রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শূণ্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম !

মল্লিকা। কিন্তু যাই বল দেবী, তাঁকে দেখলেম, সে কী রূপ। আলো দিয়ে ধোওয়া যেন দেবমূর্তিখানি।

লোকেশ্বরী। ওই রূপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল। যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হৃদয়ে, তাকে ওই রূপ ধিক্কার দিলে। যে-জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে-জন্মের সঙ্গে তার এ জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ। দেখ্ মল্লিকা আজ খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেম এ ধর্ম পুরুষের তৈরি।



এ ধর্মে যা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক ; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না পুত্র না স্বামী না ভাই সেই সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে গুণিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব। মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব।

মল্লিকা। কিন্তু দেবী, দেখনি, মেয়েরাই যে দলে দলে চলেছে বুদ্ধকে পূজা দেবার জন্যে।

লোকেশ্বরী। মৃত ওরা, ভক্তি করবার ক্ষমতা ওদের অস্ত নেই। যা ওদের সব চেয়ে মারে তাকেই ওরা সব চেয়ে বেশি করে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিইনে।

মল্লিকা। মুখে বলছ, মহারানী। নিশ্চয় জানি, তোমার ওই পুত্র আজ তোমার সেবাক্ষেত্রের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার পূজাক্ষেত্রের দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তোমার মানব-পুত্র কোল থেকে নেমে আজ দেবতা-পুত্র হয়ে তোমার হৃদয়ের পূজাবেদীতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী। চুপ চুপ। বলিসনে। আমি হাত জোড় করে তাকে অমরোধ করলেম, বললেম, “একরাত্রির জন্যে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।” সে বললে, “আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই—আছে আকাশ।” মল্লিকা, যদি মা হতিস তো বুঝতিস কতবড়ো কঠিন কথা। বজ্র দেবতার হাতের কিন্তু সে তো বজ্র। বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়নি! সেই বিদীর্ণ বকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ওই যে রাস্তার ভ্রমণদের গর্জন আমার পাঞ্জরগুলোর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধর্ম্যং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

মল্লিকা। একি মহারানী, মনোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজো আপনি যে নমস্কার করেন!

লোকেশ্বরী। ওই তো বিপদ। মল্লিকা, দুর্বলের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বলবে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বলবে ভিক্ষা করো। এই ধর্মের বিষ অনেকদিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেছি। সেইজন্যে আজ আমিই একে সব চেয়ে ভয় করি। ওই কে আসছে?

মল্লিকা। রাজকুমারী বাসবী। পূজাশূলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

বাসবীর প্রবেশ

লোকেশ্বরী। পূজায় চলেছ?

বাসবী। হ্যাঁ।

লোকেশ্বরী। তোমাদের তো বয়স হয়েছে।

বাসবী। আমাদের ব্যবহারে তার কি কোনো বৈলক্ষণ্য দেখছেন?

লোকেশ্বরী। শিশু! তোমরা নাকি বলে বেড়াচ্ছ, অহিংসা পরমো ধর্ম!

বাসবী। আমাদের চেয়ে যাদের বয়স অনেক বেশি তাঁরাই বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা তো কেবল মুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী। নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইত্যরের ধর্ম। হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মানিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।

বাসবী। শক্তির কি কোমল রূপ নেই?

লোকেশ্বরী। আছে, যখন সে ডোবার। যখন সে দৃঢ় করে বাঁধে তখন না। পর্বতকে সৃষ্টিকর্তা নির্দয় পাথর দিয়ে গড়েছেন, পাক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুর কৃপায় উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সবই কি হবে পাক? রাজবাড়িতে মানুষ হয়েও এই কথাটা মানতে ঘৃণা হয় না? চূপ করে রইলে যে?

বাসবী। ভেবে দেখছি, মহারানী।

লোকেশ্বরী। ভাববার কা আছে। চোখের সামনে দেখলে তো রাজপুত্র একমুহূর্তে রাজা হতে ভুলে গেল। বলে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব। শোননি, বাসবী?

বাসবী। শুনেছি।

লোকেশ্বরী। তাহলে নির্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ করবে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি? যত সব মাথা-হেঁট করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্রিয়ান নির্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে? তোরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেকছে কেন বাসবী?

বাসবী। এই পুরানো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিনে ঢাকা পড়ে গেছে বসন্তে নিষ্পন্ন কিংবদন্তের শাখা যেমন করে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী। কখনো কখনো বুদ্ধিব্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম ভুলে যায় কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুলতে দেয় তাহলে মরণ যে সেই নারীর। মহালতার জন্মে কি মহাবৃক্ষের দরকার নেই? সব গাছই শুষ্ক হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো? বল না। মুখে যে উত্তর নেই।

বাসবী। মহাবৃক্ষ চাই বই কি।

লোকেশ্বরী। কিন্তু বনস্পতি নির্মূল করবার জন্তই এসেছেন তোমাদের গুরু। তাও যে পরপুত্রামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের

গোকা ভলার ভলার লাগিয়ে দিবে মল্লুস্ত্রের মল্লাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে। তার আগেই যেন মর, আমার এই আশীর্বাদ। কী ভাবছ? কথাটা মনে লাগছে না?

বাসবী। ভালো করে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী। ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্যপুত্র বিহিসার, ক্ষত্রিয় রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিস নয়, তাতেই তাঁর ধর্মসাধনা। কিন্তু কোন্ মন্ত্রর ধর্ম কানে মন্ত্র দিল অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি ধসে পড়লেন— অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, একদিন তুমিও রাজার মহিষী হবে এ আশা কি ত্যাগ করেছ?

বাসবী। কেন ত্যাগ করব?

লোকেশ্বরী। তাহলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে-রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, রাজদণ্ড বার হাতে শিথিল, জয়ভিলক বার ললাটে স্নান তাকে শ্রদ্ধা করে বরণ করতে পারবে?

বাসবী। না।

লোকেশ্বরী। আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিহিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবছ ওঁর জন্তে সাজব! যে মাল্লুষ রাজাও নয় ভিক্ষুও নয়, যে-মাল্লুষ ভোগেও নেই ত্যাগেও নেই তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না। বাসবী, তোমাকে বার বার বলছি, এই পৌরুষহীন আত্মা-বমাননার ধর্মকে কিছুতে স্বীকার ক'রো না।

মল্লিকা। রাজকুমারী, কোথায় চলেছ?

বাসবী। ঘরে।

মল্লিকা। এদিকে নটী যে প্রস্তুত হয়ে এল।

বাসবী। থাক থাক।

[প্রস্থান]

মল্লিকা। মহারানী, শুনতে পাচ্ছ?

লোকেশ্বরী। শুনছি বই কি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা। নিশ্চয় এঁরা এসে পড়েছেন।

লোকেশ্বরী। কিন্তু ওই যে এখনো শুনছি, নমো—

মল্লিকা। সুর বদলেছে। 'নমো বুদ্ধায়' গর্জন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ওই শোনো—'নমঃ পিনাকহস্তায়'। আর ভয় নেই।



লোকেশ্বরী। ভাঙল রে ভাঙল। যখন সব ধুলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে  
ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম। হায় রে, কত ভক্তি। মল্লিকা, ভাঙার  
কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে ঝাচি—ওর ভিতরটা যে আমার বুকের মধ্যে।

### রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্না, তুমিও চলেছ পূজায় ?

রত্নাবলী। ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার  
অপরাধ আমার দ্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী। তবে কোথায় যাচ্ছ ?

রত্নাবলী। মহারানীর কাছেই এখানে এসেছি। আবেদন আছে।

লোকেশ্বরী। কী, বলো।

রত্নাবলী। ওই নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায় তাহলে এই অশুচি রাজ-  
বাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী। আশ্বাস দিচ্ছি আজ এ পূজা ঘটবে না।

রত্নাবলী। আজ না হ'ক কাল ঘটবে।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই, কল্যা, পূজ্যকে সমূলে উচ্ছেদ করব।

রত্নাবলী। যে অপমান সহ করেছি তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী। তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্বাসন, এমন কি,  
প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

রত্নাবলী। তাতে ওর গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী। তবে তোমার কী ইচ্ছা ?

রত্নাবলী। ও যেখানে পূজারিনী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী  
হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চূপ করে রইলে-বে। তুমি কী বল ?

মল্লিকা। প্রস্তাবটা কোতুকজনক।

লোকেশ্বরী। আমার মন সার্ব দিচ্ছে না রত্না।

রত্নাবলী। ওই নটীর 'পরে মহারানীর এখনো দয়া আছে দেখছি।

লোকেশ্বরী। দয়া ! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়াতে পারি। আমার  
দয়া। অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েছি। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে  
সেও সহ্যেতে পারি। কিন্তু রাজরানীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত !

রত্নাবলী। প্রগল্ভতা মাপ করবেন। ওইটুকু ব্যথাকে যদি প্রজ্ঞা দেন তবে ওই  
ব্যথার উপরেই ভাঙা পূজার বেদী বারেকারে গড়ে উঠবে।

লোকেশ্বরী । সে-ভয় মনে একেবারে নেই তা নয় ।

রত্নাবলী । মোহে পড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না । সেই মিথ্যাকে অপমান করুন তবে মুক্তি পাবেন ।

লোকেশ্বরী । মল্লিকা, ওই শোনো । উদ্ভানের উত্তর দিক থেকে শব্দ আসছে । ভেঙে ফেললে, সব ভেঙে ফেললে । ওঁ নমো—যাক যাক ভেঙে যাক ।

রত্নাবলী । চলো না, মহারানী, দেখে আসি গে ।

লোকেশ্বরী । যাব যাব, কিন্তু এখনো না ।

রত্নাবলী । আমি দেখে আসি গে ।

[ প্রস্থান

লোকেশ্বরী । মল্লিকা, ষাঁধন ছিঁড়তে বড়ো বাজে ।

মল্লিকা । তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে ।

লোকেশ্বরী । ওই শোনো না, ‘জয় কালী করালী’—অন্য ধনিটা ক্ষীণ হয়ে এল, এ আমি সহিতে পারছি নে ।

মল্লিকা । বুদ্ধের ধর্মকে নির্বাসিত করলে আবার কিরে আসবে—অন্য ধর্ম দিয়ে চাপা না দিলে শাস্তি নেই । দেবদত্তের কাছে যখন নূতন মন্ত্র নেবে তখনই সাধনা পাবে ।

লোকেশ্বরী । ছি ছি, ব’লো না, ব’লো না, মুখে এনো না । দেবদত্ত জ্বর সর্প, নরকের কীট । যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলেন তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দন্দ করেছি, বিদ্র ক রেছি । আর আজ ! যে-আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব ! ( জাঙ্ঘ পাতিয়া ) ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো । স্বারত্রেয়ং কৃতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো ।

উষ্টিয়া । ভয় নেই, মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে সে ভিতরেই থাক, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধু তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না । মল্লিকা, আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বসি গে, যখন ধুলার সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরঙ্গী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকে ।

[ উভয়ের প্রস্থান

ধূপ দীপ গন্ধ মালা মঙ্গলঘট প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া রাজবাটীর

একদল নারীর প্রবেশ । পুষ্পপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে

বল্ল-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসম্ভতিং

পূজয়ামি মুনিন্দ্রম্ সিরি-পাদ-সম্মোহকে ।

প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি । ধূপপাত্রকে ঘিরিয়া

গন্ধ-সম্ভার-মুগ্ধেন ধূপেনাহং স্নগন্ধিনা  
পূজয়ে পূজনেয্যস্তাং পূজাতাজনমুত্তমং ।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম

শ্রীমতী প্রদীপের থালা ঘেরিয়া

ঘনসারঙ্গদিস্তেন দীপেন তমধঃসিনা  
ভিলোকদীপং সমুদ্রং পূজয়ামি তমোজ্জ্বলং ।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম । আহাৰ্য নৈবেদ্য ঘেরিয়া

অধিবাসেতু নো ভস্তু ভোজনং পরিকল্পিতং  
অনুকম্পং উপাদায় পতিগণহাতুমুত্তমং ।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম । জানু পাতিয়া

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে  
মারং সসেনং মহতিং বিজ্ঞেত্বা  
সম্বোধিমাগচ্ছি অনন্তপ্রাণো  
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ।

বনের প্রবেশপথে পূজা সমাধা হল । এবার চলো কুপমূলে ।

মালতী । কিন্তু শ্রীমতীদিদি ওই দেখো, এদিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ  
শ্রীমতী । বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো ।

নন্দা । বোধ হচ্ছে রাজার নিষেধ ।

শ্রীমতী । কিন্তু প্রভুর আদেশ আছে ।

নন্দা । কী ভয়ংকর গর্জন । একি রাষ্ট্রবিপ্লব ?

শ্রীমতী । গান ধরো ।

গান

বীধন-ছেড়ার সাধন হবে ।

ছেড়ে যাব তীর মাঠে রবে ।

ধাহার হাতের বিজয়মালা

কদ্রদাহের বহিঃজালা,

নমি নমি নমি সে ভৈরবে ।

কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী :

শূন্যে যে যায় দিবসরাত্রি ।

ডাক এল তার ডরঝেরি,

বাজুক বন্ধে বজ্রভেরী

অকুল প্রাণের সে উৎসবে।

একদল অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। ফেরো তোমরা এখান থেকে।

শ্রীমতী। আমরা প্রভুর পূজার চলেছি।

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।

মালতী। আজ প্রভুর জন্মোৎসব।

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।

শ্রীমতী। এও কি সম্ভব?

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানিনে। দাও তোমাদের অর্ঘ্য।

[পূজার থালা প্রভৃতি ছিনাইয়া লইল]

শ্রীমতী। এ কী পরীক্ষা আমার। অপরাধ কি ঘটেছে কিছু?

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুন্তমং।

বুদ্ধে ঘো খলিতো দোসো বুদ্ধো ধমতু তং মম।

রক্ষিণী। বন্ধ করো স্তব।

শ্রীমতী। ঘরের কাছেই অবরোধ! প্রবেশ আমার ঘটল না ঘটল না।

মালতী। কাদ কেন শ্রীমতীদিদি। বিনা অর্ঘ্যে বিনা মন্ত্রে কি পূজা হয় না?

ভগবান তো আমাদের মনের ভিতরেও জন্মলাভ করেছেন।

শ্রীমতী। শুধু তাই নয় মালতী, তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মোৎসব।

নন্দা। শ্রীমতী, হঠাৎ একমুহূর্তে আজ এমন দুর্দিন ঘনিষে এল কেন?

শ্রীমতী। দুর্দিনই যে সূদিন হয়ে ওঠবার দিন আজ। যা ভেঙেছে তা জোড়া লাগবে, যা পড়েছে তা উঠবে আবার।

অজিতা। দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যে পূজার ভার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে নিশ্চয় তুল আছে। সব তাই নষ্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

শ্রীমতী। আমি ভয় করিনে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পার না। ক্রমে দ্বার আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।

ভদ্রা । রাজার বাধাও সরাতে পারবে ?

শ্রীমতী । সেখানে রাজার রাজদণ্ড পৌছয় না ।

### রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী । কী বলছিলে, শুনেছি শুনেছি । তুমি রাজার বাধাও মান না এতবড়ো তোমার সাহস ।

শ্রীমতী । পূজাতে রাজার বাধাই নেই ।

রত্নাবলী । নেই রাজার বাধা ? সত্যি নাকি ? যেহেতু তুমি পূজা করতে, আমি দেখব তুমি চোখের আশ মিটিয়ে ।

শ্রীমতী । যিনি অসুখময়ী তিনিই দেখবেন । বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে । এখন

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে

সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সন্মদা ।

রত্নাবলী । তোমার দিন এবার হয়ে এসেছে, অহংকার ঘুচবে ।

শ্রীমতী । তা ঘুচবে । কিছুই বাকি থাকবে না, কিছুই না ।

রত্নাবলী । এখন আমার পালা, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি ।

[ প্রস্থান

ভদ্রা । কিছুই ভালো লাগছে না । বাসবী বুদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় সরে পড়েছে ।

অজিতা । আমার কেমন ভয় করছে ।

### উৎপলপর্ণীর প্রবেশ

নন্দা । ভগবতী, কোথায় চলেছেন ?

উৎপলপর্ণী । উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম পীড়িত, অমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষামন্ত্র পড়তে চলেছি ।

শ্রীমতী । ভগবতী, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না ?

উৎপলপর্ণী । কেমন করে নিয়ে যাই ? তোমার উপরে যে পূজার আদেশ আছে ।

শ্রীমতী । পূজার আদেশ এখনো আছে দেবী ?

উৎপলপর্ণী । সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে আদেশের তো অবসান নেই ।

মালতী । মাত, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে ।

উৎপলপর্ণী । ভয় নেই, ধৈর্য ধরো । সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে । [ প্রস্থান

ভদ্রা । শুনছ অজিতা, রাতার ও কি কন্দন, না গর্জন ।



নন্দা। আমার তো মনে হচ্ছে উজ্জানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর করেছে। শ্রীমতী, শীঘ্র চলো রাজমহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিইগে। [ প্রস্থান ভদ্রা। এস অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

[ রাজকুমারী প্রকৃতির প্রস্থান

মালতী। দিদি, বাইরে ওই যেন মরণের কারা গুনতে পাচ্ছি। আকাশে দেখছ ওই শিখা! নগরে আগুন লাগল বুঝি। জন্মোসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন।

শ্রীমতী। মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।

মালতী। মনে ভয় আসছে বলে বড়ো লজ্জা পাচ্ছি দিদি। পূজা করতে যাব ভয় নিয়ে যাব এ আমার সহ্য হচ্ছে না।

শ্রীমতী। তোর ভয় কিসের বোন।

মালতী। বিপদের ভয় না। কিছুই যে বুঝতে পারছিনে, অন্ধকার ঠেকছে; তাই ভয়।

শ্রীমতী। আপনাকে এই বাইরে দেখিসনে। আজ যার অক্ষয় জন্ম তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখু, তোর ভয় ঘুচে যাবে।

মালতী। তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

### শ্রীমতীর গান

আর রেখো না আধারে আমার  
দেখতে দাও।

তোমার মাঝে আমার আপনারে  
আমায় দেখতে দাও।

কঁদাও যদি কঁদাও এবার,  
স্বপ্নের গানি সয় না যে আর,  
যাক না ধূয়ে নয়ন আমার  
অশ্রুধারে,

আমায় দেখতে দাও।

জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,  
আপন বলে ভুলার বধন  
ঘনার বিষম মায়া।

স্বপ্নভারে জমল বোঝা,  
চিরজীবন শূন্য খোজা,

যে মোর আলো লুকিয়ে আছে

রাতের পারে

আমায় দেখতে দাও ।

### একজন অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী । শোনো, শোনো, শ্রীমতী ।

মালতী । কেন নিষ্ঠুর হচ্ছে তোমরা । আর আমাদের যেতে ব'লো না । আমরা দুটি মেয়ে এই উজানের কাছে মাটির 'পরে বসে থাকি না—তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে ।

রক্ষিণী । তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন ।

মালতী । ভগবান বুদ্ধ যে-উজানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন তার শেষপ্রান্তেও তাঁর পদধূলা আছে । তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও তাহলে আমরা এইখানে সেই ধূলায় বসে মনের মধ্যে তাঁর জন্মোৎসব গ্রহণ করি—মন্ত্রও বলব না, অর্ঘ্যও দেব না ।

রক্ষিণী । কেন বলবে না মন্ত্র । বলো, বলো । শুনতেও পাব না এত কী পাপ করেছি । অন্য রক্ষিণীরা দূরে আছে, এইবেলা আজ পূর্ণ্যদিনে শ্রীমতী তোমার মধুর কণ্ঠ থেকে প্রভুর শব্দ শুনে নিই । তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী । যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোকছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপচোখে দেখেছি তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন ।

শ্রীমতী ।

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়

নমো নমো গোতম-চন্দ্রিমায়,

নমো নমো নন্তগুণরবায়,

নমো নমো সাকিয়নন্দনায় ॥

রক্ষিণী, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো ।

রক্ষিণী । আমার মুখে কি পূণ্যমন্ত্র বের হবে ।

শ্রীমতী । ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই পূণ্য হবে । বলো

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায় । [ ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া লইল ।

রক্ষিণী । আমার বকের বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক



হল। যে-কথা বলতে এসেছিলেন এবার বলে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী। কেন।

রক্ষিণী। মহারাজ অজ্ঞাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোকতলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েছেন।

মালতী। হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হল না। আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেল সব।

শ্রীমতী। কী বলিস মালতী। তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিবিসার বা গড়েছিলেন তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে। ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।

রক্ষিণী। রাজা প্রচার করেছেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, শুভমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী, তাহলে তুমি আর কী করবে এখানে।

শ্রীমতী। অপেক্ষা করে থাকব।

রক্ষিণী। কতদিন।

শ্রীমতী। যতদিন না পূজার ডাক আসে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই।

রক্ষিণী। পূর্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কিসের ক্ষমা।

রক্ষিণী। হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী। ক'রো আঘাত।

রক্ষিণী। সে আঘাত হয়তো বাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী। আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। বুদ্ধো ধমতু, বুদ্ধো ধমতু।

### অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ

দ্বিতীয় রক্ষিণী। রোদিনী।

প্রথম রক্ষিণী। কী পাটলী।

পাটলী। ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে কেলেছে।

রোদিনী। কী সর্বনাশ!

শ্রীমতী। কে মারলে।

পাটলী। দেবদত্তের শিষ্যরা।

রোদিনী। রক্তপাত তবে শুরু হল। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সহ্য না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। শ্রীমতী ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।

শ্রীমতী। লোভ দেখিয়ে না রোদিনী। আমি নটী, তোমার ওই তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী। তাহলে এই নাও। [ তরবারি দান

শ্রীমতী। ( শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল ) না, না। প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলছে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হ'ক, প্রভুর জয় হ'ক।

পাটলী। চল রোদিনী, ভগবতীর দেহ বহন করে নিয়ে যেতে হবে স্বামীনে।

[ উভয়ের প্রস্থান

কয়েকজন রক্ষিণী সহ রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। এই যে এখানেই আছে। ওকে রাজ্যাদেশ শুনিয়ে দাও।

রক্ষিণী। মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে।

শ্রীমতী। নাচ! আজ!

মালতী। তোমরা এ কী কথা বলছ গো। মহারাজের ভয় হল না এমন আদেশ করতে?

রত্নাবলী। ভয় হবারই তো কথা। সেই দিনই তো এসেছে। তাঁর নটীদাসীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর! গ্রাম্য বর্বর।

শ্রীমতী। কখন নাচ হবে?

রত্নাবলী। আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী। প্রভুর আসনবেদির সামনে?

রত্নাবলী। হ্যাঁ।

শ্রীমতী। তবে তাই হ'ক।

[ সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

হিংসায় উন্নত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর স্ব

ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী

কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী।

• বিকলিত কর প্রেমপন্থ চির-মধুনিষ্ঠান।

শাস্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূণ্য,  
করণাঘন, ধরণীভঙ্গ কর কলঙ্কশূন্য।

এস দানবীর দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা,  
মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।

লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর মোহ,  
উজ্জল হ'ক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ,  
প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন ঝড়ুক অন্ধ।

শাস্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূণ্য,  
করণাঘন, ধরণীভঙ্গ কর কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,  
বিষয়বিষ-বিকারজীব দীর্ঘ অপরিভূপ্ত।

দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্রানি,  
তব মঙ্গলশব্দ আন তব দক্ষিণপানি,  
তব শুভসংগীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ।

শাস্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূণ্য,  
করণাঘন, ধরণীভঙ্গ কর কলঙ্কশূন্য।

## রাজোতান

### মালতী ও শ্রীমতী

মালতী। দিদি, শাস্তি পাচ্ছিনে।

শ্রীমতী। কী হয়েছে।

মালতী। তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করতে নিয়ে গেল আমি চুপি চুপি  
ওই প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেম। দেখি ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার  
মৃতদেহ নিয়ে চলেছে আর,—

শ্রীমতী। ধামলে কেন। বলো।

মালতী। রাগ করবে না দিদি? আমি বড়ো দুর্বল।

শ্রীমতী । কিছুতেই না ।

মালতী । দেখলেম অস্ত্যোষ্টিমন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন ।

শ্রীমতী । কে যাচ্ছিলেন ।

মালতী । দূর থেকে মনে হল যেন তিনি ।

শ্রীমতী । অসম্ভব নেই ।

মালতী । পণ করেছিলেম, মুক্তি যতদিন না পাই তাঁকে দূর থেকেও দেখব না ।

শ্রীমতী । রক্ষা করিস সেই পণ । সমুদ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকলেই তো পার দেখা যায় না । ছুরাশায় মনকে প্রভ্রয় দিসনে ।

মালতী । তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করছি মনে ক'রো না । ভয় হচ্ছে ওঁকে তারা মারবে তাই কাছে থাকতে চাই । পণ রাখতে পারছিনে বলে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না দিদি ।

শ্রীমতী । আমি কি তোর ব্যথা বুঝিনে ।

মালতী । তাঁকে বাঁচাতে পারব না কিন্তু মরতে তো পারব । আর পারলুম না দিদি, এবারকার মতো সব ভেঙে গেল । এ-জীবনে হবে না মুক্তি ।

শ্রীমতী । যার কাছে যাচ্ছিস তিনিই তোকে মুক্তি দিতে পারেন । কেননা তিনি মুক্ত । তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলুম ।

মালতী । কী বুঝলে দিদি ।

শ্রীমতী । এখনো আমার মনের মধ্যে পুরানো ক্ষত চাপা আছে সে আবার ব্যথিয়ে উঠল । বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে ।

মালতী । রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মানুষ আর কেউ নেই তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি । কিন্তু যেতে হল । যখন সময় পাবে আমার সঙ্গে ক্ষমার মন্ত্র পড়ো ।

শ্রীমতী । বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো ধমতু তং মম ।

মালতী । ( প্রণাম করিতে করিতে ) 'বুদ্ধো ধমতু তং মম ।' ষাবার মুখে একটা গান শুনিয়া দাও । তোমার ওই মুক্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না । একটা পথের গান গাও ।

### শ্রীমতীর গান

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে ।

পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে ।

এসেছে নিবিড় নিশি  
পথরেখা গেছে মিশি',  
সাড়া দাও, সাড়া দাও আধারের ঘোরে।  
ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে  
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।  
মনে করি আছি কাছে  
তবু ভয় হয় পাছে  
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে।

মালতী। শোনো দিদি, আবার গর্জন। দয়া নেই, কারো দয়া নেই। অনন্ত-  
কালগিক বৃদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না।  
আর দেরি করতে পারিনে। প্রণাম, দিদি। মুক্তি যখন পাবে আমাকে একবার ডাক  
দিয়ে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো।

শ্রীমতী। চল, তোকে প্রাচীরদ্বার পর্বস্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসিগে। [ উভয়ের প্রস্থান

### রত্নাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ

রত্নাবলী। দেবদত্তের শিষ্যরা ভিক্ষুণীকে মেরেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের ?  
ও তো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা। কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।

রত্নাবলী। মন্ত পড়ে কি রক্ত বদল হয় ?

মল্লিকা। আজকাল তো দেখছি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী। রেখে দে ও-সব কথা। প্রজারা উত্তেজিত হয়েছে বলে রাজার ভাবনা !  
এ আমি সহ্যে পারিনে। তোমার ভিক্ষুধর্ম রাজধর্মকে নষ্ট করছে।

মল্লিকা। উত্তেজনার আরও একটু কারণ আছে। মহারাজ বিহিসার পূজার জন্য  
যাত্রা করে বেরিয়েছেন কিন্তু এখনো পৌঁছননি, প্রজারা সন্দেহ করছে।

রত্নাবলী। কানাকানি চলছে আমিও শুনেছি। ব্যাপারটা ভালো নয় তা মানি।  
কিন্তু কর্মফলের মূর্তি হাতে হাতে দেখা গেল।

মল্লিকা। কী কর্মফল দেখলে ?

রত্নাবলী। মহারাজ বিহিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি  
পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয় ? আশ্চর্য্য তো তখন থেকেই বলছে, যে যজ্ঞের আগুন  
উনি নিবিয়েছেন সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ওঁকে ধাবে।



মল্লিকা। চূপ চূপ, আশু। জ্ঞান তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কী রকম অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

রত্নাবলী। কার অভিশাপ ?

মল্লিকা। বুদ্ধের। মনে মনে মহারাজ ঠেকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী। বুদ্ধ তো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মল্লিকা। তাই তার এত মান। দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় দামি অর্ঘ্য।

রত্নাবলী। যে-দেবতা হিংসা করতে জানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বুদ্ধ সিংহের মতো।

মল্লিকা। যাই হ'ক এই বলে যাচ্ছি, আজ সন্ধ্যাবেলায় ওই অশোকচৈত্যে পূজা হবেই।

রত্নাবলী। তা হয় হ'ক কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্ছি।

[ মল্লিকার প্রস্থান ]

### বাসবীর প্রবেশ

বাসবী। প্রস্তুত হয়ে এসেম।

রত্নাবলী। কিসের জন্তে ?

বাসবী। শোধ তুলব বলে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ওই নটী।

রত্নাবলী। উপদেশ দিয়ে ?

বাসবী। না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী। তাই ছুরি হাতে এসেছ ?

বাসবী। সেজন্তে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা ঘটেছে। বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী। নটীর উপর শোধ তুলবে কী দিয়ে ?

বাসবী। ( হার দেখাইয়া ) এই হার দিয়ে।

রত্নাবলী। তোমার হীরের হার !

বাসবী। বহুমূল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রত্নাবলী। ও যদি তিরস্কার ক'রে কিরে ফেলে দেয় তোমার গায়ে। যদি না নেয়।

বাসবী। ( ছুরি দেখাইয়া ) তখন এই আছে।

রত্নাবলী। শীঘ্র ডেকে আনো মহারানী লোকেস্বরীকে, তিনি খুব আমোদ পাবেন।

বাসবী । আসবার সময় খুঁজেছিলেম তাঁকে । গুনলেম ঘরে দ্বার দিয়ে আছেন ।  
একি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে না স্বামীর 'পরে অভিমানে ? বোঝা গেল না ।

রত্নাবলী । কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য, তাতে মহারানীর উপস্থিত থাকা চাই ।

বাসবী । নটীর নতিনাট্য । নামটি বেশ বানিয়েছ ।

### মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা । যা মনে করেছিলেম তাই ঘটেছে । রাজ্যে যেখানে ষত বুদ্ধের শিষ্য আছে  
মহারাজ অজ্ঞাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েছেন । এমনি করে গ্রহপূজা চলছেই,  
কখনো বা শনিগ্রহ কখনো বা রবিগ্রহ ।

রত্নাবলী । ভালোই হয়েছে । বুদ্ধের সব-কটি শিষ্যকেই দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে  
একসঙ্গে সমর্পণ করে দিন । তাতে সময়-সংক্ষেপ হবে ।

মল্লিকা । সেজ্ঞে নয় । ওরা রাজ্যের হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে  
আসছে । মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন ।

বাসবী । তাতে কী হয়েছে ?

মল্লিকা । কী আশ্চর্য । এখনো জনশ্রুতি তোমার কানে পৌঁছয়নি ! সবাই  
অমুমান করছে, পথের মধ্যে ওরা বিধিসার মহারাজকে হত্যা করেছে ।

বাসবী । সর্বনাশ । এ কখনো সত্য হতেই পারে না ।

মল্লিকা । কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে ।  
তিনি কোন্ একটা অমুশোচনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন ।

বাসবী । হায়, হায়, এ কী সংবাদ ।

রত্নাবলী । লোকেশ্বরী মহারানী কি শুনেছেন ?

মল্লিকা । অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে তাকে তিনি দুখানা করে ফেলবেন ।  
কেউ সাহস পাচ্ছে না ।

বাসবী । সর্বনাশ হল । এতবড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ির কেউ  
বাঁচবে না । ধর্মকে নিয়ে যা খুলি করতে গেলে কি সহ হয় ?

রত্নাবলী । ওই রে ! বাসবী আবার দেখছি নটীর চেলা হবার দিকে ঝুঁকছে ।  
ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মূর্ততার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে ।

বাসবী । কখনো না । আমি কিছু ভয় করিনে । ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে  
আসিগে ।



রত্নাবলী। মিথ্যা ছুতো করে পালিয়ে না। ভয় তুমি পেয়েছ। তোমাদের এই অবসাদ দেখলে আমার বড়ো লজ্জা করে। এ কেবল নীচসংসর্গের ফল।

বাসবী। অন্ত্রায় বলছ তুমি, আমি কিছুই ভয় করিনে।

রত্নাবলী। আচ্ছা তাহলে অশোকবনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী। কেন যাব না। তুমি ভাবছ আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ ?

রত্নাবলী। আর দেরি নয়, মল্লিকা, শ্রীমতীকে এখনই ডাকো, সাজ হ'ক বা না হ'ক। রাজকন্যারা যদি না আসতে চায় রাজকিংকরীদের সবাইকে চাই। নইলে কোতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী। ওই যে শ্রীমতী আসছে। দেখো, দেখো, যেন চলছে স্বপ্নে। যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই।

### ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,

লইলু শরণ, লইলু শরণ।

আধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,

পরাও, পরাও জ্যোতির টিকা,

করো হে আমার লজ্জা হরণ।

রত্নাবলী। এইদিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পৌঁছেছে না ? এই যে এইদিকে।

শ্রীমতী। পরশরতন তোমারি চরণ,

লইলু শরণ লইলু শরণ,

যা-কিছু মলিন, যা কিছু কালো

যা-কিছু বিক্লপ হোক তা ভালো,

ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।

রত্নাবলী। বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? চলো।

বাসবী। না, আমি যাব না।

রত্নাবলী। কেন যাবে না ?

বাসবী। তবে সত্য কথা বলি। আমি পারব না।

রত্নাবলী। ভয় করছে ?

বাসবী। হাঁ ভয় করছে।

রত্নাবলী । ভয় করতে লজ্জা করছে না ?

বাসবী । একটুমাত্রও না । শ্রীমতী, সেই ক্ষমার মন্ত্রটা ।

শ্রীমতী । উত্তমজেন বন্দেহং পাদপংসু-বন্ধনমং

বুদ্ধে যো বলিতো দোসো বুদ্ধো ধমতু তং মম ।

বাসবী । বুদ্ধো ধমতু তং মম, বুদ্ধো ধমতু তং মম,

বুদ্ধো ধমতু তং মম ।

### শ্রীমতীর গান

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান ।

ক্ষীণ হাতে জ্বালা

মান দীপের খালা

হল বান খান ।

এবার তবে জ্বালো

আপন তারার জ্বালো,

রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হ'ক অবসান ।

এস পারের সাধি ।

বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি ।

আজি বিজ্ঞান বাটে,

অন্ধকারের ঘাটে

সব হারানো নাটে

এনেছি এই গান ।

[ সকলের প্রশ্নান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

সকল কলুষ তামস হর,

জয় হ'ক তব জয়,

অমৃতবারি সিঞ্জন কর

নিখিল জ্বলনময় ।

মহাশক্তি মহাক্রম

মহাপূণ্য মহাপ্রেম ।

জ্ঞানসুধ-উদয়ভাতি

ধ্বংস কলক তিমির-রাতি ।

হুঃসহ হুঃস্বপ্ন ঘাতি'

অপগত কর ভয় ।

মহাশাস্তি মহাক্ষেম

মহাপুণ্য মহাপ্রেম ॥

মোহমলিন অতিদুর্দিন

শঙ্কিত চিত পাশ,

অটল-গহন পথসংকট

সংশয় উদ্ভ্রান্ত ।

করুণাময় মাগি শরণ

দুর্গতিভয় করহ হরণ,

দাও হুঃস্ববন্ধতরণ

মুক্তির পরিচয় ।

মহাশাস্তি মহাক্ষেম

মহাপুণ্য মহাপ্রেম ।

## চতুর্থ অঙ্ক

অশোকতল । ভাঙা স্তূপ । ভয়প্রায় আসনবেদি

রত্নাবলী । রাজকিংকরীগণ । একদল রক্ষিণী

প্রথম কিংকরী । রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হচ্ছে ।

রত্নাবলী । আর একটু অপেক্ষা করো । মহারানী লোকেস্বরী স্বয়ং এসে দেখতে চান । তিনি না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না ।

দ্বিতীয় কিংকরী । আপনার আদেশে এসেছি । কিন্তু অধর্মের ভয়ে মন ব্যাকুল ।

তৃতীয় কিংকরী । এইখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা । ছি ছি, কেমন করে এ পাপের ক্ষালন হবে ?

চতুর্থ কিংকরী । এতবড়ো বীভৎস ব্যাপার এখানে হবে জানতেম না । থাকতে পারব না আমরা, কিছুতে না ।

রত্নাবলী । মন্দভাগিনী তোরা শুনিসনি, বুদ্ধের পূজা এ-রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে ।

চতুর্থ কিংকরী। রাজাকে অমান্ত করা আমাদের সাধ্য নেই। ভগবানের পূজা - নাই করলেম কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারিনে।

প্রথম কিংকরী। রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্যা রাজবধূদেরই অঙ্গে। এ সম্ভার আমাদের কেন? চলো তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান সেখানে যাই।

রত্নাবলী। (রক্ষিণীদের প্রতি) যেতে দিয়ো না ওদের। এইবার শীঘ্র নটীকে ডেকে নিরে এস।

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, এ পাপ নটীকে স্পর্শ করবে না। এ পাপ তোমারই।

রত্নাবলী। তোরা ভাবিস তাদের নতুন ধর্মের নতুন-গড়া পাপকে আমি গ্রাহ্য করি।

দ্বিতীয় কিংকরী। মাহুষের ভক্তিকে অপমান করা এ তো চিরকালের পাপ।

রত্নাবলী। এই নটীসাধুর হাওয়া তোমাদের সবাইকে লাগল দেখছি। আমাকে পাপের ভয় দেখিয়ো না, আমি লিপ্ত নই।

রক্ষিণী। (প্রথম কিংকরীর প্রতি) বসুমতী, আমরা শ্রীমতীকে ভক্তি করেছি কিন্তু ভুল করেছি তো। সে তো নাচতে রাজি হল।

রত্নাবলী। রাজি হবে না? রাজার আদেশকে ভয় করবে না?

রক্ষিণী। ভয় তো আমরাই করি, কিন্তু—

রত্নাবলী। নটীর পদ কি তোমাদেরও উপরে?

প্রথম কিংকরী। আমরা তো ওকে নটী বলে আর ভাবতুম না। আমরা ওর মধ্যে স্বর্গের আলো দেখেছি।

রত্নাবলী। নটী স্বর্গে গিয়েও নাচে তা জানিসনে!

রক্ষিণী। শ্রীমতীকে পাছে রাজার আদেশে আঘাত করতে হয় এই ভয় ছিল কিন্তু আজ মনে হচ্ছে রাজার আদেশের অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

প্রথম কিংকরী। ও পানীয়সীদের কথা থাক। কিন্তু এই পাপদৃষ্টে দুই চোখকে কলঙ্কিত করলে আমাদের গতি হবে কী?

রত্নাবলী। এখনো নটীর সাজ শেষ হল না। দেখছ তো তোমাদের নটীসাধুর সাজের আনন্দ কত।

প্রথম কিংকরী। ওই যে এস! ইস, দেখেছিস ঝলমল করছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। পাপদেহে এক-শ বাতির আলো জালিয়েছে।

## শ্রীমতীর প্রবেশ

প্রথম কিংকরী। পাপিষ্ঠা, শ্রীমতী। ভগবানের আসনের সম্মুখে, নিলজ্জ, তুই আজ নাচবি! তোর ছুখানা পা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল না এখনো?

শ্রীমতী। উপায় নেই, আদেশ আছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। নরকে গিয়ে শতলক্ষ বৎসর ধরে জলন্ত অঙ্গারের উপরে তোকে দিনরাত নাচতে হবে এ আমি বলে দিলেম।

তৃতীয় কিংকরী। দেখো একবার। পাতকিনী আপাদমস্তক অলংকার পরেছে। প্রত্যেক অলংকারটি আগুনের বেড়ি হয়ে তোর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাকবে, তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালায় শ্রোত বইয়ে দেবে তা জানিস?

## মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। ( জনাস্তিকে, রত্নাবলীকে ) রাজ্যে বৃদ্ধপূজার ধে-নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দুন্দুভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলছে। হয়তো এখনই এখানেও আসবে তাই-সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরও একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন তার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছেন।

রত্নাবলী। একবার দৌড়ে যাও তাহলে মল্লিকা—শীঘ্র মহারানী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এস।

মল্লিকা। ওই যে তিনি আসছেন।

## লোকেশ্বরীর প্রবেশ

রত্নাবলী। মহারানী, এই আপনার আসন।

লোকেশ্বরী। ধামো। শ্রীমতীর সঙ্গে নিভৃতে আমার কথা আছে। ( শ্রীমতাকে জনাস্তিকে ডাকিয়া লইয়া ) শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কী মহারানী।

লোকেশ্বরী। এই লও, তোমার জন্তে এনেছি।

শ্রীমতী। কী এনেছেন?

লোকেশ্বরী। অমৃত।

শ্রীমতী। বুঝতে পারছিনে।

লোকেশ্বরী। বিষ। খেয়ে মরো, পরিত্রাণ পাবে।

শ্রীমতী। পরিত্রাণের আর উপায় নেই ভাবছেন?

লোকেশ্বরী। না। রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার অন্তে নাচার আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছুতেই কিরবে না জানি।

রত্নাবলী। মহারানী, আর সময় নেই, নৃত্য আরম্ভ হ'ক।

লোকেশ্বরী। এই নে, লীজ্ঞ ধেরে কেল। এখানে মলে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচলে যাবি অবাঁচি নরকে।

শ্রীমতী। সর্বাঙ্গে আদেশ পালন করে নিই।

লোকেশ্বরী। নাচবি?

শ্রীমতী। হাঁ নাচব।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই তোর?

শ্রীমতী। না, কিছু না।

লোকেশ্বরী। তবে তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

শ্রীমতী। যিনি উদ্ধারকর্তা তিনি ছাড়া।

রত্নাবলী। মহারানী, আর একমুহূর্ত দেরি চলবে না। বাইরে গোলমাল শুনছ না? হয়তো বিদ্রোহীরা এখনই রাজোত্থানে ঢুকে পড়বে। নটী, নাচ শুরু হ'ক।

#### শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ  
তোমার শ্রি, হে নিরুপম,  
নৃত্যরসে চিত্ত মম  
উছল হয়ে বাজে।

আমার সকল দেহের আকুল রবে  
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে  
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে  
নব জনমের মাঝে।

তোমার বন্দনা মোর ভক্তিতে আজ  
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচ? এ তো নাচের ভান। আর এই গানের অর্থ কী?

লোকেশ্বরী। না না বাধা দিয়ো না।

#### শ্রীমতীর গান ও নাচ

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়  
কাঁপন বন্ধে লাগে



শাস্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়

সুন্দর তার জাগে ।

আমার সব চেতনা সব বেদনা  
রচিল এ যে কী আরাধনা,  
তোমার পায়ে মোর সাধনা  
মরে না যেন লাজে ।

তোমার বন্দনা মোর ভক্তিতে আজ  
সংগীতে বিরাজে ।

রত্নাবলী । এ কী হচ্ছে ? গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ওই স্তূপের  
আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে । ওই গেল কঙ্কণ, ওই গেল কেয়ুর, ওই গেল হার ।  
মহারানী, দেখছেন এ সমস্ত রাজবাড়ির অলংকার—এ কী অপমান ! শ্রীমতী, এ আমার  
নিজের গায়ের অলংকার । কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনই ।

লোকেশ্বরী । শাস্ত হও, শাস্ত হও । ওর দোষ নেই, এমনি করে আভরণ ফেলে  
দেওয়া, এই নাচের এই তো অঙ্গ । আনন্দে আমারও শরীর দুলে উঠছে । ( গলা  
হইতে হার খুলিয়া ফেলিয়া ) শ্রীমতী, ধেমো না, ধেমো না ।

### শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমি কানন হতে তুলিনি ফুল,  
মেলেনি মোরে ফল ।

কলস মম শূন্যসম  
ভরিনি তীর্থজল

আমার তনু তনুতে বীধনহারি  
হৃদয় ঢালে অধরা-ধারা,  
তোমার চরণে হ'ক তা সারা  
পূজার পুণ্য কাজে ।

তোমার বন্দনা মোর ভক্তিতে আজ  
সংগীতে বিরাজে ।

রত্নাবলী । এ কী রকম নাচের বিড়ম্বনা । নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে ।  
দেখছ তো মহারানী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র । একেই কি পূজা বলে না ? রক্ষিণী,  
তোমরা দেখছ । মহারাজ কী দণ্ড বিধান করেছেন মনে নেই ?



রক্ষিণী । শ্রীমতী তো পূজার যন্ত্র পড়েনি ।

শ্রীমতী । ( জাহ্নু পাতিয়া ) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি—

রক্ষিণী । ( শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া ) ধাম্ ধাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো ধাম্ ।

রত্নাবলী । রাজার আদেশ পালন করো ।

শ্রীমতী । বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি—

কিংকরীগণ । সর্বনাশ করিসনে শ্রীমতী, ধাম্ ধাম্ ।

রক্ষিণী । যাসনে মরণের মুখে উন্নতা ।

দ্বিতীয় রক্ষিণী । আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ ।

কিংকরীগণ । চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা । [ পলায়ন

রত্নাবলী । রাজার আদেশ পালন করো ।

শ্রীমতী । বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি ।

লোকেশ্বরী । ( জাহ্নু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে )

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি ।

রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল । ‘ক্ষমা করো

ক্ষমা করো’, বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধূলা লইল ।

লোকেশ্বরী । ( শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া ) নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে  
দিবে গেলি । ( বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া ) এ আমার ।

[ রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল

মল্লিকা । কী ভাবছ ?

রত্নাবলী । ( বস্ত্রাঙ্কলে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া ) এইবার আমার ভয় হচ্ছে ।

### প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী । মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের পূজা নিয়ে কাননদ্বারে অপেক্ষা  
করছেন দেবীদের সম্মতি চান ।

মল্লিকা। চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসিগে। [ প্রস্থান  
লোকেশ্বরী। বলো তোমরা সবাই,

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। ধর্ম্যং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। ধর্ম্যং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নখি মে সরণং অত্র ঐতং বুদ্ধো মে সরণং বরং  
এতেন সচ্চব্ধেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

### মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। মহারাজ এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী। কেন?

মল্লিকা। সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী। কাকে তাঁর ভয়?

মল্লিকা। ওই হতপ্রাণ নটীকে।

লোকেশ্বরী। চলো পালক নিয়ে আসি। এর দেহকে সকলে বহন করে নিয়ে  
যেতে হবে। [ রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। ( শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম। জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া )

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধর্ম্যং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি

নটরাজ

ধাতুশালা

ମୃତ୍ୟୁ ଶୀତ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୮୩ ରେ "ବିପ୍ଳବ" (ସାମ୍ବାଦିକ)ଙ୍କ  
ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଚାରରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ମିଳିଲା ।

ବିପ୍ଳବର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସମାଜର ଆନ୍ଧାର  
ରହିତାବସ୍ଥାକୁ ଦୂରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ,  
ତାଙ୍କ ଗଭୀର ସମାଜର ଆନ୍ଧାରକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ମିଳାଇ  
ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମାଜର  
ଏହି-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ମାଗିଲେ  
ସମାଜ ୩ ଦିନର ଅନ୍ଧାର ଲୀନାବସ୍ଥାକୁ ଦୂରରେ  
ଆଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଦେଖି । "ବିପ୍ଳବ" ସାମ୍ବାଦିକର  
ଏହି ଶବ୍ଦ ।

ପ୍ରୋଫେସର ଶ୍ରୀମତୀ

# নটরাজ

## মুক্তিতত্ত্ব

মুক্তিতত্ত্ব শুনতে কিরিস

তত্ত্বশিরোমণির পিছে ?

হাস্য রে মিছে, হাস্য রে মিছে

মুক্ত যিনি দেখ-না তাঁরে,

আয় চলে তাঁর আপন দ্বারে,

তাঁর বাণী কি শুকনো পাতায়

হলদে রঙে লেখেন তিনি ।

মরা ডালের ঝরা ফুলের

সাধন কি তাঁর মুক্তি-কুলের ।

মুক্তি কি পণ্ডিতের হাতে

উক্তিরাশির বিকিকিনি ।

এই নেমেছে তাঁদের হাসি

এইখানে আয় মিলবি আসি,

বীণার তারে তারণ-মন্ত্র

শিখে নে ভোর কবির কাছে ।

আমি নটরাজের চেলা,

চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,

বাঁধন খোলার শিখছি সাধন

মহাকালের বিপুল নাচে ।

দেখছি, ও যার অসীম বিস্ত  
 সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,  
 আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ  
 আপনাতে যার আপনি আছে ।

যে-নটরাজ নাচের খেলায়  
 ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,  
 কবির বাণী অবাক মানি'  
 তারি নাচের প্রসাদ বাচে ।

শুনবি রে আর, কবির কাছে  
 শুক্ল মুক্তি ফুলের নাচে,  
 নদীর মুক্তি আশ্বহারা  
 নৃত্যধারার তালে তালে ।

রবির মুক্তি দেখু না চেয়ে  
 আলোক-জাগার নাচন গেষে,  
 তারার নৃত্যে শূন্য গগন  
 মুক্তি যে পায় কালে কালে ।

প্রাণের মুক্তি স্বত্বার্থে  
 নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,  
 জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সুতার  
 নিত্য-বোনা চিন্তাজালে ।

আয় তবে আর কবির সাথে  
 মুক্তি-দোলের শুক্লরাজে,  
 জলল আলো, বাজল মৃদু  
 নটরাজের নাট্যশালে ।

## উদ্বোধন

মন্দিরার মস্ত্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ,  
 নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,  
 ভুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে  
 বিশ্বের প্রাকগতলে তব নৃত্যচ্ছন্দের সঙ্কানে ।  
 মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে  
 যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে ;  
 স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি স্কন্ধ শুষ্ক ধূলি  
 আবর্তিত্বা উঠে প্রাণে অঙ্কতার জয়ধ্বজা তুলি  
 চতুর্দিকে । নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার  
 হুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার  
 চঞ্চল চরণভঙ্গি, রক্তেশ্বর, সকল বন্ধনে  
 উত্তাল নৃত্যের বেগে,—যে নৃত্যের অশাস্ত স্পন্দনে  
 ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশম্পদল ;  
 পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের ছরস্তু কোতুহল,  
 আপনারে সঙ্কানিতে ছুটে যায় দূর কালপানে,  
 দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে,  
 সৃষ্টির রহস্যঘারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে ,  
 যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঙ্করে কম্প আনে,  
 স্কন্ধ হয় শুষ্কতার সঙ্কাজীর্ণ লঙ্কাজীর্ণ সাদা,  
 উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধবাক্ বাধা,  
 বজ্রাতার অঙ্ক হুঃশাসন ; জ্ঞামলের সাধনাতে  
 দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে ; যে নৃত্য আঘাতে  
 বহিঃস্পন্দ-সরোবরে উর্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,  
 অতল আবর্তবক্ষে গ্রহনক্ষত্রের শতদল  
 প্রস্ফুটিয়া ফুরে নিত্যকাল ; ধূমকেতু অকস্মাৎ  
 উড়ার উত্তরী হাস্যবেগে, করে ক্ষিপ্ত পদপাত



তোমার ডঙ্কতালে, পূজা-নৃত্য করি দেয় সারা  
সূর্যের মন্দির-সিংহদ্বারে, চলে যায় লক্ষ্যহারা  
গৃহশূণ্য পাশে উদাসীন ।

নটরাজ, আমি তব  
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব ।  
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বঙ্কনগ্রন্থিগুলি  
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সত্তা যাবে খুলি ;  
সর্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্পে অবনম্র কণা  
আন্দোলিবে শাস্ত লয়ে ।

প্রভু, এই আমার বন্দনা  
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,  
আজিকে আনন্দে ভরে বন্ধ মোর করে ছন্দ ছন্দ ।  
পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠালে নিমজ্জনে  
বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণবায়ুর আলিঙ্গন,  
মল্লিকার গন্ধোন্মাদে, কিংকর দীপ্ত রক্তাংকুরে,  
বকুলের মস্ততার, অশোকের দোড়ল কোঁতুরে,  
বেণুবনবীধিকার নিরন্তর মর্মরে কম্পনে  
ইন্দ্রিতে ভজিতে, আম্রমঞ্জরীর সর্বভ্যাগপণে,  
পলাশের গরিমায় । অবসাদে যেন অন্তমনে  
তাল ভঙ্গ নাহি করি, তব নামে আমার আহ্বান  
জড়ের স্তব্ধতা ভেদি উৎসারিত করে দিক গান ।  
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হতে  
উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রসসুধাস্রোতে  
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দ মন্দাকিনীধারা,  
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণহারা ।

## নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,  
ঘুচাও সকল বন্ধ হে ।

সৃষ্টি ভাঙাও, চিত্তে আগাও  
মুক্ত সুরের ছন্দ হে ।

তোমার-চরণ-পবন-পরশে  
সরস্বতীর মানস সরসে

যুগে যুগে কালে কালে,  
সুরে সুরে তালে তালে,  
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে আগাও  
অমল কমল গন্ধ হে ।

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিস্ত  
ভরুক চিত্ত মম ।

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,  
নৃত্যে তোমার মায়্যা ।

বিশ্বতন্তুতে অণুতে অণুতে  
কাঁপে নৃত্যের ছায়া ।

তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়  
বীধন পরায়, বীধন খোলায়,

যুগে যুগে কালে কালে,  
সুরে সুরে তালে তালে ;  
অস্ত কে তার সন্ধান পায়  
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে ।

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিস্ত  
ভরুক চিত্ত মম ।

নৃত্যের বশে সুন্দর হল

বিদ্রোহী পরমাণু ;

পদযুগ ধিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে

বাজিল চক্ৰভাঙ্গু ।

তব নৃত্যের প্রাণবেদনার

বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,

যুগে যুগে কালে কালে

সুরে সুরে তালে তালে,

সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়

তোমার পরমানন্দ হে ।

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিস্ত

ভরুক চিত্ত মম ।

মোর সংসারে তাওব তব,

কম্পিত জটাজ্বলে ।

লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার

নাচের ঘূর্ণিতালে ।

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,

ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,

যুগে যুগে কালে কালে

সুরে সুরে তালে তালে,

জীবন-মরণ নাচের ডমরু

বাজাও অলদমঙ্গ হে ।

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিস্ত

ভরুক চিত্ত মম ।

## ঋতুনৃত্য বৈশাখ

ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন  
 নিশ্চল ভব চিত্ত ;  
 নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে  
 নিঃশেষ সব বিস্ত ।  
 রসহীন তরু, নির্জীব মরু,  
 পবনে গর্জে রুদ্ধ ডমরু,  
 ঐ চারিধার করে হাহাকার  
 ধরাভাঙার বিস্ত ।  
 ভব তপ-তাপে হেরো সবে কাঁপে,  
 দেবলোক হল ক্লাস্ত ।  
 ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,  
 বক্রণ কক্রণ শাস্ত ।  
 দুর্দিনে আনে নির্দয় বায়ু,  
 সংহার করে কাননের আয়ু,  
 ভয় হয় দেখি, নিখিল হবে কি  
 জড়দানবের ভূত্য ।  
 আগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে  
 তাপস, লোচন মেলো হে ।  
 আগো মানবের আশায় ভাষায়,  
 নাচের চরণ ফেলো হে ।  
 আগো ধনে ধানে, আগো গানে গানে,  
 আগো সংগ্রামে, আগো সঙ্কানে,  
 আশ্বাসহারা উদ্বাস পরানে  
 আগাও উদার নৃত্য ।  
 ভুলেছে হৃদয়, ভালোর মন্দ  
 একাকার তাই হার রে ।

কদম্ব তাই করিছে বড়াই,  
 ধরণী লজ্জা পায় রে ।  
 পিনাকে তোমার দাও টংকার,  
 ভীষণে মধুরে দিক ঝংকার,  
 ধূলায় মিশাক যা কিছু ধুলার,  
 জয়ী হ'ক যাহা নিত্য ।

## বৈশাখ-আবাহন

গান

এস, এস, এস, হে বৈশাখ ।  
 তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে  
 বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ।  
 যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি,  
 অশ্রুবাণ্ম স্নদূরে মিলাক ।  
 মুছে যাক সব গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,  
 অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হ'ক ধরা ।  
 রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,  
 আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শীথ,  
 মায়া'র কুজুঝাটি-জাল যাক দূরে যাক ।

## বৈশাখের প্রবেশ

গান

নমো, নমো, হে বৈরাগী ।  
 তপোবহির লিখা জালো জালো,  
 নির্বাণহীন নির্মল আলো  
 অস্তরে থাক্ জাগি ।  
 নমো নমো হে বৈরাগী ।

## সম্বোধন

ধূসরবসন, হে বৈশাখ,  
 রক্তলোচন, হে নির্বাক,  
 শুকপথের দানব দম্ভা,  
 শুধে নিভে চাও হাসি ও অশ্রু,  
 ইন্দিতে দাও দাক্ষণ ডাক ।  
 স্তম্ভিত হল সে ডাকে পৃথ্বী,  
 ভাঙারে তার কাপিল ভিত্তি,  
 শঙ্কায় তার শুকায় তালু,  
 অট্ট হাসিল মকুর বালু ।  
 হংকার সেই তপ্ত হাওয়ায়  
 প্রাস্তর হতে প্রাস্তরে ধায়,  
 দিগ্ধূদের নীরবে কাঁদায়,  
 শূন্যে শূন্যে উড়ায় ধূলি,  
 বিজয়পতাকা আকাশে তুলি ।

তুহিয়া লয়েছ গগন-ধেমুরে,  
 ঝরায়ে দিয়েছ শিরীষরেণুরে  
 উদাস করেছ রাখাল-বেণুরে  
 তুফাকরণ সারঙ-তানে ।  
 নীর্ণ নদীর গেল সঞ্চয়,  
 ঝিরিঝিরি জল ধীরি ধীরি বয়,  
 আকুলিয়া উঠে কাননের ভয়  
 ভীকু কপোতের কাকলি গানে ।

ধূসরবসন, হে বৈশাখ,  
 রক্তলোচন হে নির্বাক,  
 শুক পথের দানব দম্ভা,  
 শুধে নিভে চাও হাসি ও অশ্রু,  
 ইন্দিতে দাও দাক্ষণ ডাক ।

গান

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোম বৈশাখী ঝড় আসে,  
বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে ।

মোহন এল ভীষণ বেশে

আকাশ ঢাকা অটল কেশে,

এল তোমার সাধন-ধন চরম সর্বনাশে ।

বাতাসে তোম সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা ।

পিপাসাতে বুক-কাটা তোম শুষ্ক কঠিন ধরা ।

জাগু রে হতাশ, আয় রে ছুটে

অবসাদের বাধন টুটে,

এল তোমার পথের সাধি বিপুল অটুটহাসে ।

## কালবৈশাখী

ডাকো বৈশাখ, কালবৈশাখী,

করো তারে লীলাসজিনী,-

কেন সন্ন্যাসী রয়েছ একাকী

আনু ক প্রলয়-রাজিনী ।

হৃত-নিঃশ্বাস অধর ভলে

রুদ্ধ বাতাস তাপ-শৃঙ্খলে,

ঘন ঝঞ্ঝার দিক্ ঝংকার

অস্তর ভব চঞ্চলি,

মহি আনু ক মর্ত্যস্বর্গ

তোমার অর্ঘ্য-অঞ্জলি

বাজায় ডমরু ভব তাণ্ডবে

গুরু গুরু মেঘ-মঞ্জিরা,—

দিগ্ধু যত হাহাকার রবে

হৃদাম উঠে কন্দিয়া ।



গৈরিক ভব জয় পতাকায়  
 সঙ্ঘা-রবির রং সে মাধায়,  
 কুঞ্জে বাজায় মাধায় মাধায়  
 ভাল-ভমালের খঞ্জনি ।  
 সপ্ততারার লুপ্তির পরে  
 নাচে সে স্পৃশ্তি-ভঞ্জনী ॥  
 তপোভঙ্কের দিবে মঙ্গলা  
 ভব শাস্তিরে তর্জিয়া,  
 তন্ত্র পরাবে কদ্রবীণায়  
 রেখেছিলে যারে বর্জিয়া ।  
 দিগন্তের সঙ্ঘ টুটি  
 অঞ্চলে মেঘ আনিবে সে লুটি—  
 ব্যজিয়া উঠিবে কল-কল্লোল  
 বন-পল্লবে পল্লবে,—  
 শ্রাম উত্তরী নির্মল করি'  
 সাজাবে আপন বস্ত্রভে ।

## মাধুরীর ধ্যান

গান

মধ্যদিনে যবে গান  
 বন্ধ করে পাখি,  
 ছে রাখাল, বেণু ভব  
 বাজাও একাকী ।

শাস্ত প্রান্তরের কোণে  
 কদ্র বসি তাই শোনে,  
 মধুরের ধ্যানাবেশে  
 স্বপ্নময় আধি ;  
 ছে রাখাল, বেণু যবে  
 বাজাও একাকী ।

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে

ভরিয়া আকাশ

তুষাতপ্ত বিরহের

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস ।

অমরপ্রান্তের দূরে

ডম্বরু গন্তীর সুরে

আগায় বিদ্যাহ-ছন্দে

আসন্ন বৈশাখী ।

হে রাখাল, বেগু তব

বাজাও একাকী ।

পরানে কার ধ্যান আছে আগি,

জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী ।

সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে

পূরব কূলে বকুলবীষিমাঝে,

লুটায়-পড়া অমল-নীল সাজে

নবকেতকী-কেশর আছে লাগি ।

তাহারি ধ্যান পরানে তব আগি ।

রাখাল বেগু বাজায় তরুতলে

রাগিণী তার তাহারি কথা বলে ।

ভূতলে ধসি পড়িছে পাতাগুলি

চলিতে পাছে চরণে লাগে ধূলি,—

কুঞ্চুড়া রয়েছে খেলা ভূলি

পথে তাহারে ছায়া দিবারি লাগি ।

তাহারি ধ্যান পরানে আছে আগি ।

কাঁকন-ধ্বনি অপোবনের পারে

চপল বায়ে আসিছে বায়ে বায়ে,

কপোত দুটি তাহারি সাদা গেয়ে

চাপার ডালে উঠিছে গেয়ে গেয়ে,

মরমে তব মৌনী আছে চেয়ে  
 আপন মাঝে তাহারি বাণী মাগি ।  
 তাহারি ধ্যান পরানে আছে আগি ।  
 কঠোর, তুমি মাধুরী-সাধনাতে  
 মগন হয়ে রয়েছ দিনে রাতে ।  
 নীরস কাঠে আগুন তুমি আলো,  
 আধার যাহা করিবে তারে আলো,  
 অশুচি যাহা, যা-কিছু আছে কালো  
 দহিবে তারে, সূদূরে যাবে ভাগি,—  
 মাধুরী-ধ্যান পরানে তব আগি ।

## ব্যঞ্জনা

স্তম্ভে কি পাস  
 এই যে স্বসিঁছে রক্ত শূন্যে শূন্যে সস্তপ্ত নিশ্বাস  
 এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত ধ্বনি,  
 মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি ?  
 রৌদ্রদগ্ধ তপস্কার মৌনস্তম্ভ অলক্ষ্য আড়ালে  
 স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে  
 অর্ঘ্যমাল্য সাজ হয় সংগোপনে স্নানরের লাগি ।  
 ময় যেথা ধ্যানের সর্বশূন্য গহনে বৈরাগী,  
 সেথা কে বুতুসু আসে ভিক্ষা-অবেষণে ;  
 জীর্ণ পর্ণশয্যা'পরে একা বহে আগি  
 কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পদস্পর্শ মাগি  
 ভাপিত আকাশে  
 হঠাৎ নীরবে চলে আসে  
 একটি কল্প ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,  
 কে অভিসারিণী ঘেন পথে এসে পায় না কিনারা ।

অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে  
 শাস্ত্রের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে  
 ক্রকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;  
 বিদ্যাৎ বিচ্ছুরি উঠে দিগন্তের ভালে,  
 রোমাঞ্চ-কম্পন লাগে অশ্বখের তন্তু ডালে ডালে ;  
 মুহূর্তে অস্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্রামা  
 বাজায় বৈশাখী-সঙ্ক্যা ঝঞ্ঝার দামামা,  
 দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন,  
 ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় ঐদাসীন্দ্ৰ কঠোর বন্ধন ।

### বর্মার প্রবেশ

গান

নমো, নমো করুণাঘন নম হে ।  
 নয়ন ত্রিধ্ব অমৃতাজ্ঞান পরশে,  
 জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,  
 তব দর্শন-ধন-সার্থক মন হে,  
 অকুপণবর্ষণ করুণাঘন হে ।

### প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বীধন কাটুক  
 রসের বর্ষণে,  
 হৃদয় আমার শ্রামল-বঁধুর  
 করুণ স্পর্শ নে ॥

ঐ কি এলে আকাশ-পারে  
 দিক্-ললনার প্রিয়,  
 চিত্তে আমার লাগল তোমার  
 ছায়ার উত্তরীর

অঝোর-ঝরণ জীবনজলে,  
তিমির-মেঘর বনাঞ্চলে  
ফুটুক সোনার কদম্বফুল  
নিবিড় হর্ষণে ।

মেঘের মাঝে মৃদঙ, জোয়ার  
বাজিয়ে দিলে কি ও  
ঐ তালেতেই ভাতিয়ে আমার  
নাচিয়ে দিয়ে দিয়ে ।

ভরুক গগন, ভরুক কানন  
ভরুক নিখিল ধরা,  
দেখুক ভুবন মিলন-স্বপন  
মধুর বেদন ভরা ।  
পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল  
বাহির আকাশ করুক আড়াল,  
নয়ন ভুলুক বিজুলি ঝলুক  
পরম দর্শনে ।

## আষাঢ়

কোন্ বারতীর করিল প্রচার  
দূর আকাশের ইজিতে  
ঐরাবতের বৃংহিতে ।  
নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন  
ধরণী উপস্থিনী,  
কক্ষ অঙ্গ পাংক্ত-ধূসর,  
ধ্যান-অঙ্গন শুক উষর,  
নাহি সখী সজিনী :—  
বুঝি আসন্ন হল তার সন্ন,  
শুনি গর্জন রথ-বর্ষর,  
বুঝি আসে কাজিজাত,

তাই চিত্ত যে হল চঞ্চল,  
আধিপত্য বাপসজল,  
তাই সে রোমাঞ্চিত ।

ওগো বিরহিণী গেল দুদিন  
হৃৎঘৃচিবে নিঃশেষে,  
মনোমাবে যারে কঁক নয়নে  
শুজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে,  
দেখা দিবে আজি বিদেহে সে  
ঐ বুঝি আসে আকাশে আকাশে  
সমারোহ তার বিস্তারি,  
বিজয়ী সে বীর, ওরে ভয়ভীতা  
যাবে তোর ভয়, ওরে পিপাসিতা  
তুষা হতে দিবে নিস্তারি ।  
ললাটে নিপুণ পত্রলেখাটি  
আঁকো কুঙ্কম চন্দনে ।  
দুলাও চামেলি অলকে তোমার  
কবরী রচিয়া এলো কেশভার  
বেঁধে তোলো বেণীবন্ধনে ।

উঠ ধূলি হতে ওগো হৃৎধিনী  
ছাড়ো গৈরিক উত্তরী ।  
নীলবসনের অঞ্চলখানি  
কম্পিত বুকে লহ লহ টানি'  
হাসিমুখে চাহো পুন্দরী ।  
বীর-মঞ্চল ঘোষুক মন্ত্র  
মুখে তুলে তোর শঙ্খ নে ।  
কোড়কম্বু চক্ষে ফুটুক,  
বিদ্যুৎ-লিখা কম্পি উঠুক  
তব চঞ্চল কঙ্কণে ।

কুঞ্জকানন জাগ্রত হ'ক

আজি বন্দনা সংগীতে—

শিহর লাগুক শাখার শাখায়,  
যাতন লাগুক শিখীর পাখায়

ভব নৃত্যের ভঙ্গিতে ।

শ্রাম বন্ধুরে শ্রামল তুণের

আসনে বসাবি অঙ্গনে ।

রাধিবি ছুয়ারে আল্পনা আঁকি',

চরণের তলে ধূলা দিবি ঢাকি,

টগর করবী রঙ্গনে ।

গাও জয় জয়, গাও জয়গান

ঢেউ তোলো স্বরসপ্তকে,

বনপথে আসে মনোরঞ্জন,

নয়নে পরাবে প্রেম অঞ্জন,

সুধা দিবে চিরতপ্তকে ।

## লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে

কী খেলা ভব ।

ভূমি কত যেথে নিমেষে নিমেষে

নিভুই নব ।

জটীর গভীরে লুকালে রবিরে

ছায়াপটে আঁক এ কোন্ ছবি রে ।

মেঘমল্লারে কী বল আমারে

কেমনে কব ।

বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই

অট্টহাসি



গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে  
যায় যে ভাসি ।

সে সোনার আলো শ্রামলে মিশাল,  
খেত উত্তরী আজ কেন কালো ?  
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়  
কী বৈভব ।

## বর্ষা-মঙ্গল

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান বনাল মনে ।

গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু

বাজিল ক্ষণে ক্ষণে ।

তোমার ললাটে জটিল জটীর ভার  
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,  
বাদল আধার মাতাল তোমার হিয়া,  
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া ।

চিরজনমের শ্রামলী তোমার প্রিয়া

আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা

পাঠাল তোমারে এ কোন্ লিপিকা,

লিখিল নিখিল-আখির কাজল দিয়া,

চিরজনমের শ্রামলী তোমার প্রিয়া ।

মনে পড়িল কি বন কালো এলোচুলে

অগুরু ধূপের গন্ধ ?

শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে ছলে ছলে

কাঁকন-দোলন ছন্দ ?

মনে পড়িল কি নীল নদীজলে,

বন প্রাণের ছায়া ছল ছলে

মিলি মিলি সেই জল-কলকলে

কলাগাপ যুহুয়ন্দ ;

স্বকিত-পায়ের চলা বিধাহত,  
 ভীক নয়নের পল্লব নভ,  
 না-বলা কথার আভাসের মতো  
 নীলাশ্বরের প্রাস্ত ?  
 মনে পড়িছে কি কাঁখে ভুলে ঝারি  
 তরু তলে তলে ঢেলে চলে বারি,  
 সেচন-শিথিল বাহু দুটি তারি  
 ব্যথায় আলসে ক্লান্ত ?

ওগো সম্যাসী, পথ যায় ভাসি'  
 ঝর ঝর ধারাজলে --  
 ভ্রমলবনের স্ত্রামল ভিমির তলে ।  
 ছ্যলোক ভুলোকে দূরে দূরে বলাবলি  
 চিরবিরহের কথা,  
 বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি'  
 নীপ-অঞ্জলি রচে বসি' গৃহকোণে,  
 ঢেলে ঢেলে দেয় তোমায়ে স্মরিয়া মনে,  
 ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা ।

কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি'  
 আতুর নয়নে দু-হাতে আঁচল কাঁপে ।  
 তুমি চিন্তের অন্তরে অবগাহি'  
 খুঁজিয়া দেখিছ ধৈর্য নাহি নাহি,  
 মল্লার রাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি',  
 বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে ।

ষাক ষাক তব মন গলে গলে ষাক,  
 গান ভেসে গিয়ে দূরে চলে চলে ষাক,  
 বেদনার ধারা দুর্দাম দিশাহারা  
 দুখ-দুর্দিনে দুই কুল তার ছাপে ।

কদম্ববন চঞ্চল ওঠে তুলি,  
 সেইমতো তব কল্পিত বাহু তুলি  
 টলমল নাচে নাচো সংসার তুলি,

## শ্রাবণ-বিদায়.

গান

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার

আভাস পেলে ?

পথে তারি সকল বারি ।

দিলে ঢেলে ।

কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায় ।

কদম ঝরে, হায় হায় হায় ।

পূব হাওয়া কয়, ওর তো সময় নাই বাকি আর ।

শরৎ বলে, যাক না সময় ভয় কিবা তার,—

কাটবে বেলা আকাশমাঝে বিনা কাজে

অসময়ের খেলা খেলে ।

কালো মেঘের আর কি আছে দিন

ও যে হল সাধিহীন ।

পূব হাওয়া কয়, কালোর এবার যাওয়াই ভালো,

শরৎ বলে, গেঁথে দেব কালোর আলো ।

সাজবে বাদল আকাশ মাঝে

সোনার সাজে

কালিমা ওর মুছে ফেলে ।

যায় রে শ্রাবণ কবি রসবর্ষা কাস্ত করি তার,

কদম্বের রেণুপুঞ্জে পদে পদে কুঞ্জবীথিকার

ছায়াঞ্চল ভরি দিল । জানি, রেখে গেল তার দান

বনের মর্মের মাঝে ; দিবে গেল অভিষেকস্থান

সুপ্রসন্ন আলোকেরে ; মহেশ্বরের অদৃশ্য বেদীতে

ভরি গেল অর্ঘ্যপাত্র বেদনার উৎসর্গ অমৃতে ;

সলিল গগুস দিতে তটিনী সাগরতীরে চলে,

অঞ্জলি ভরিল তারি ; ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে

য়েথে গেল তুষার সঙ্কল ; অগ্নিশীল বজ্রবাণ  
দিগন্তের তূণ ভরি একান্তে করিয়া গেল দান  
কালবৈশাখীর ভরে ; নিজ হস্তে সর্ব স্নানতার  
চিহ্ন মুছে দিয়ে গেল । আজ শুধু রহিল তাহার  
রিক্তরুষ্টি জ্যোতিঃস্তম্ভ মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,  
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ ।

## শেষ মিনতি

গান

কেন      পাশ্বে এ চঞ্চলতা ?  
কোন্      শূন্য হতে এল কার বারতা ।

যাত্রাবেলার ক্রন্দরবে  
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে,  
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে ।

নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত  
বিদায় বিষাদে উদাসমতো,  
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নভ  
ক্লাস্ত তড়িৎবধু তদ্রাগতা ।

মুক্ত আমি, রক্ত ধারে  
বন্দী করে কে আমারে ।  
যাই চলে যাই অন্ধকারে  
ঘণ্টা বাজার সন্ধ্যা হবে ।

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে  
মর্ম্মর মুখরিল যুগু পবনে,  
বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর  
বিস্রহ বিশদ্বিত্ত করণ কথা ।

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

ধৈৰ্য মানো ওগো ধৈৰ্য মানো,  
 বরমালা গলে তব হয়নি মান,  
 আজো হয়নি মান,  
 ফুল-গন্ধ-নিবেদন-বেদন-সুন্দর  
 মালতী তব চরণে প্রণতা ।

---

প্রাণ সে যার চলে পাশ্বে,  
 কুশভঙ্গ ক্লাস্ত,  
 উড়ে পড়ে উত্তরী-প্রাস্ত  
 উত্তর-পবনে ।  
 যুথীগুলি সকল গন্ধে  
 আজি তারে বন্দে,  
 নীপবন মর্মর ছন্দে  
 জাগে তার স্তবনে ।  
 প্রামদন তমালের কুঞ্জে  
 পল্লবপুঞ্জে ।  
 আজি শেষ মল্লারে শুঞ্জে  
 বিচ্ছেদগীতিকা,  
 আজি মেঘ বর্ষণবিস্ত  
 নিঃশেষবিস্ত,  
 দিগ্ধ করি শেষ অভিবিস্ত  
 কিংকবীধিকা ।

## শরৎ

ধ্বনিগ গগনে আকাশ-বাণীর বীন,  
 শিথিল-বাতাসে দূরে দূরে ডাক দিল কে ?  
 আর সুলগনে, আজ পথিকের দিন,  
 একে নে ললাট অরষাড্রার তিলকে ।

গেল খুলি গেল মেঘের ছায়ার দ্বার,  
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণভার,  
তরুণ আলোক মুকুট পরেছে তার,  
বিজয়শব্দ বেজে ওঠে তাই জিলোকে ।

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা  
নিত্যকালের বালকবীরের মানসে ।  
নবীন রক্তে আগায় চঞ্চলতা,  
বলে,—চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো'সে ।  
ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে,  
বন্দিনী কোন্ রাজকন্য়ার তরে,  
মায়াজাল ভেদি চলো সে রুদ্ধ ঘরে,  
লও কামুক, দানবের বুক হানো'সে ।

ওরে শারদার জয়মন্তের গুণে  
বীর-গৌরবে পার হতে হবে সাগরে ।  
ইজের শর ভরি নিতে হবে তুণে  
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, আগো রে ।  
'দেবী শারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি'  
দেব সেনাপতি কুমার দৈত্যজয়ী,  
সে প্রসাদখানি দাও গো অমৃতময়ী',  
এই মহা বর চরণে তাঁহার মাগো রে ।

আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে  
স্তম্ভের পায়ে অন্নান মনে নমো রে ।  
স্বর্গের রাধি বাঁধো দক্ষিণ হাতে  
আধারের সাথে আলোকের মহাসমরে ।  
মেঘবিমুক্ত শরভের নীলাকাশ  
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস —  
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,  
জয়ী হবে রবি, মরিতে মরিতে তম রে ।

## শান্তি

গান

পাগল আজি আগল খোলে  
 বিদায়রজনীতে,  
 চরণে ওর বাঁধিবি ডোর,  
 কী আশা তোর চিতে ।  
 গগনে তার মেঘ-দুয়ার কেঁপে,  
 বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,  
 হিম হাওয়ায় গেল সে দ্বার কেঁপে,  
 এসেছে ডাক ভোরের রাগিণীতে ।  
 শীতল হ'ক বিমল হ'ক প্রাণ,  
 হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান ।  
 যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলান,  
 সে ফাঁক দিয়ে আশ্রুক তবে আলো,  
 বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢালো  
 নিশিরে ভরা শিউলি-ঝরা গীতে ।

## শরতের প্রবেশ

গান

নির্মল কান্ত, নমো হে নমঃ  
 স্নিগ্ধ পুষ্পান্ত নমো হে নমঃ ।  
 বন-অঙ্গনময় রবিকর-রেখা  
 লেপিল আলিম্পনলিপি লেখা,  
 আঁকিব তাহে প্রণতি মম ।  
 নমো হে নমঃ ।



শরৎ ডাকে ঘর ছাড়ানো ডাকা  
 কাজ ভোলানো সুরে,—  
 চপল করে হাসের দুটি পাখা  
 ওড়ায় তারে দূরে ।  
 শিউলি কুঁড়ি যেমনি কোটে শাখে  
 অমনি তারে হঠাৎ ফিরে ডাকে,  
 পথের বাণী পাগল করে ডাকে,  
 ধুলায় পড়ে ঝুরে ।  
 শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা  
 কাজ-খোঁওয়ানো সুরে ।

শরৎ আজি বাজায় এ কী ছলে  
 পথ-ভোলানো বাণি ।  
 অলস মেঘ ঝায়-যে দলে দলে  
 গগনতলে ভাসি ।  
 নদীর ধারা অধীর হয়ে চলে  
 কী নেশা আজি লাগল তার জলে,  
 ধানের বনে বাতাস কী যে বলে  
 বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ।  
 শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা,  
 কাজ-খোঁওয়ানো সুরে

শরৎ আজি শুভ্র আলোকেতে  
 মত্ত ছিল পড়ি,  
 ভুবন তাই শুনিল কান পেতে  
 বাজে ছুটির বড়ি ।  
 কামের বনে হাসির লহরীতে  
 বাজিল ছুটি মর্ম্মরিত গীতে,—

ছুটির ধ্বনি আনিল মোর চিতে  
পাখি বন্ধুরে ।

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা  
কাজ খোঁওয়ানো সুরে ।

## শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি  
কে ফুটালে,  
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে ।

সেই তো তোমার পথের বঁধু  
সেই তো ।

দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু—  
এই তো ।

আমার মনের ভাবনাগুলি  
বাহির হল পাখা তুলি,  
ঐ কমলের পথে তাদের  
সেই জুটালে ।

সেই তো তোমার পথের বঁধু  
সেই তো ।

এই আলো তার এই তো আঁধার  
এই আছে এই নেই তো ।

শরৎ-বাণীর বীণা বাজে  
কমলদলে ।

ললিত রাগের সুর ঝরে তাই  
শিউলিতলে ।

তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে  
কচি ধানের সবুজ খেতে,  
বনের প্রাণে মরমরানির  
ঢেউ উঠালে ।

## শরতের বিদায়

কেন গো যাবার বেলা  
গোপনে চরণ ফেলা,  
যাওয়ার ছায়াটি পড়ে যে হৃদয় মাঝে,  
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে ।

সুদূর বিরহতাপে  
বাতাসে কী ঘেন কাঁপে,  
পাখির কণ্ঠ করুণ ক্লাস্তি ভরা,  
হারাই হারাই মনে করে তাই সংশয়-মান ধরা ।

জানিনে গহন বনে  
শিউলি কী ধ্বনি শোনে,  
আনমনে তার ভূষণ ধসিয়ে ফেলে ।  
মালতী আপন সব ঢেলে দেয় শেষ খেলা তার খেলে ।

না হতে গ্রহর শেষ  
হবে কি নিকরদেশ,  
তোমার নয়নে এখনো রয়েছে হাসি,  
বাজায় মোহিনী এখনো মোহিনী বাশি ওঠে উচ্ছ্বাসি ।

এই তব আসা-যাওয়া  
একি খেলালের হাওয়া,  
মিলন পুলক তাতেও কি অবহেলা,  
আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কেবলি খেলা ?

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,  
কেমন ভুল, এমন ভুল ?  
রাতের বায় কোন্ মায়ায়  
আনিল ছায় বনছায়ায়,  
ভোরবেলায় বায়ে বায়েই  
কিরিবারেই হলি ব্যাকুল ।

কেন রেঁ জুই উয়না,  
নয়নে ভোর হিমকণা ?

কোন্ ভাষায় চাস বিদায়,  
গন্ধ তোর কী জানায়,  
সঙ্গে হায় পলে পলেই

দলে দলেই যায় বকুল ।

## বিলাপ

গান

চরণরেখা তব যে-পথে দিলে লেখি  
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ?

ছিল তো শ্বেতালিকা

তোমারি লিপি-লিখা

তারে যে তুণতলে আজিকে লীন দেখি  
কাশের লিখা যত কাঁপিছে ধরধরি,  
মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি ।

তোমার যে-আলোকে

অমৃত দিত চোখে,

স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ।

## হেমস্তের প্রবেশ

গান

নম, নম, নম ।

তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণা,

অমৃত-অন্ন-ভোগ-ধন্য

করো অস্তর মম ।

হেমস্তেরে বিভল করে কিসে,

চলিতে পথে হারাল কেন দিশে

যেন যে ওর আলোর স্মৃতিখানি  
বিস্মৃতির বাষ্পে নিল টানি,—  
কণ্ঠ তাই হারাল তার বাণী,  
অশ্রু কাঁপে নয়ন অনিমিষে ।  
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে ।

ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি,  
যাত্রা ওর অনেক আছে বাকি ।  
শিশিরকণা লাগিবে পায়ে পায়ে,  
কক্ষ কেশ কাঁপিবে হিমবায়ে,  
আধার-করা ঘনবনের ছায়ে  
শুষ্ক পাতা রয়েছে পথ ঢাকি ।  
ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি ।

বাসা যে ওর সুদূর হিমাচলে,  
শেওলা-ঝোলা তিমির গুহাতলে ।  
যে পথ বাহি বলাকা ঘায় ফিরে  
সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে,  
সে পথ দিয়ে ধানের খেত ঘিরে  
হিমের ভারে চলিবে পলে পলে ।  
যেতে যে হবে সুদূর হিমাচলে ।

চলিতে পথে এল আধার রাত্তি,  
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাত্টি ।  
অম্বর দলে গগনে রচে কারা,  
তাই তো শশী হয়েছে জ্যোতিহারা,  
আকাশ ঘেরি ধরিবে যত তারা  
কে যেন জেলে কুহেলি-জাল পাতি ।  
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাত্টি ।

স্বধূরা যবে সাজের জ্যোতি জ্বাল  
 একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো ।  
 দেবতা যারে বিশ্ব দিয়ে হানে  
 তোমরা তারে বাঁচারো দয়া দানে  
 কল্যাণী গো তোদেরি কল্যাণে  
 ছুটিয়া যাক্ কুস্বপন কালো,—  
 একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো ।

গান .

শিউলি-ফোটা ফুরাল যেই নীতের বনে,  
 এলে যে সেই শূন্যধনে ।  
 তাই গোপনে সাজিয়ে ভালো  
 দুখের সুরে বরণমালা  
 গাঁথি মনে মনে  
 শূন্য ধনে ।

দিনের কোলাহলে  
 ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে ।  
 রাতের তারা উঠবে যবে  
 সুরের মালা বদল হবে  
 তখন তোমার সনে  
 মনে মনে ।

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—  
 হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা ।  
 সঙ্ঘ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে  
 মলিন হেরি কুয়াশাতে,  
 কণ্ঠে তোমার বাণী যেন কঙ্কণ বাজে মাথা ।  
 ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে ।  
 দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে ।  
 আপন দানের আড়ালেতে  
 রইলে কেন আসন পেতে,  
 আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা ।

## হেমন্ত

হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুম্ব চুলে ঢাকা,  
 জলাটের চন্দ্রলেখা অথভে এমন কেন মান ?  
 হাতে তব সজ্জাদীপ কেন গো আড়াল করে আন  
 কুয়াশায় ? কণ্ঠে বাণী কেন হেন অশ্রুবাশ্পে মাখা  
 গোধূলিতে আলোতে আধারে ? দূর হিমশৃঙ্গ ছাড়ি  
 ওই হেরো রাজহংসশ্রেণী, আকাশে দিয়েছে পাড়ি  
 উজ্জায়ে উত্তরবায়ুশ্রোত, নীতে ক্লিষ্ট ক্লাস্ত পাখা  
 মাগিছে আতিথ্য তব জাহ্নবীর জনশূন্য তটে  
 প্রচ্ছন্ন কাশের বনে । প্রান্তরসীমায় ছায়াবটে  
 মৌনব্রত বউ-কথা-কণ্ড । গ্রামপথ আকাধাক  
 বেণুতলে পাশুহীন অবলীন অকারণ আসে,  
 কচিং চকিত-ধূলি অকস্মাৎ পবন উচ্ছ্বাসে ।

কেন বলো, হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত করে রাখা,  
 মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধুমলবর্ণে আঁকা ।

ভরেছ, হেমন্ত-লক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক ধানে ।  
 দিগজনে দিগজনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে  
 শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে । বলেছিল ডাকি,  
 “কোথায় গো, অন্নপূর্ণা, ক্ষুধার্তেরে অন্ন দিবে না কি ?  
 শাস্ত করো প্রাণের ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়নে  
 ধরার ভাণ্ডার পানে ।” শুনিয়া, লুকায়ে হাস্তধানি,  
 লুকায়ে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণা দিয়েছ তুমি আনি,  
 ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিলে সাবধানে ।

স্বর্গলোক মান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব  
 কোন্ মায়ামজ্জগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব ।



অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঙ্গানে ।  
 তোমার অমৃত-নৃত্য, তোমার অমৃতমিষ্ট হাসি  
 কখন ধুলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,  
 আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে ।

## দীপালি

গান

হিমের রাতে ঐ গগনের  
 দীপগুলিরে  
 হেমস্তিকা করল গোপন  
 আঁচল ঘিরে ।

ঘরে ঘরে ডাক পাঠাল—

“দীপালিকায় জ্বালাও আলো,

জ্বালাও আলো, আপন আলো,

সাজাও আলোর ধরিত্রীরে ।”

শূন্য এখন ফুলের বাগান,

দোরেল কোকিল গাহে না গান,

কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে ।

যাক্ অবসাদ বিষাদ কালো,

দীপালিকায় জ্বালাও আলো,

জ্বালাও আলো, আপন আলো,

সুনাও আলোর জয়বাহীরে ।

দেবতার! আজ আছে চেয়ে

জাগো ধরার ছেলে মেয়ে

আলোয় জাগাও যামিনীরে ।

এল আঁধার, দিন ফুরাল,

দীপালিকায় জ্বালাও আলো,

জ্বালাও আলো, আপন আলো,

জয় করো এই তামসীরে ।

## শীতের উদ্বোধন

ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু,  
শীতের রাতে তোমার সাথে কী খেলা হবে শুক  
ভাবিয়াছিছু খেলার দিন  
গোধূলি-ছায়ে হল বিলীন,  
পরান মন হিমে মলিন

আড়াল তারে ঘেরি,—

এমন ক্ষণে কেন গগনে বাঞ্জিল তব ভেরী ?

উত্তর-বায় করে আগায়, কে বুঝে তার বাণী ?  
অন্ধকারে কুঞ্জঘারে বেড়ায় কর হানি ।

কাদিয়া কয় কানন-ভূমি --

“কী আছে মোর, কী চাহ ভূমি ?

শুক শাখা যাও যে চুমি’

কাঁপাও ধরধর,

জীর্ণপাতা বিদায়গাথা গাহিছে মরমর ।”

বুঝেছি তব এ অভিনব ছলনাভরা খেলা,  
ভুলিছ ধ্বনি কী আগমনী আজি যাবার বেলা ।

ঘোবনেরে ভুবার-ডোরে

রাখিয়াছিলে অসাড় করে ;

বাহির হতে বাধিলে ওরে

কুয়াশা-ধন জালে—

ভিতরে ওর ভাডালে ঘোর নাচের তালে তালে ।

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা কক্কর ধানধান,  
মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিরা যাক প্রাণ  
নৃত্য তব ছন্দে তারি  
নিত্য ঢালে অমৃতবারি,

শব্দ কহে ছহংকারি

বাঁধন সে তো মায়া,

যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া ।

এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,—

যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয় ।

তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে

শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,

প্রাণের জয়-তোরণ গড়ে

আনন্দের তানে,

বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে ।

বাঁধনে যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি তারে

তোমার হাসি সমুচ্ছাসি উঠিছে বারে বারে ।

অমর আলো হারাবে না যে

ঢাকিয়া তারে আঁধার মাঝে,

নিশীথ-নাচে ডমক বাজে

অরুণদ্বার খোলে—

জাগে মুরতি, পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে ।

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা,

উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা ।

ঋতুর দল নাচিয়া চলে

ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,

নৃত্য-লোল চরণভলে

মুক্তি পায় ধরা,—

ছন্দে মেতে ঘোঁবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা ।

## আসন্ন শীত

গান

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন  
আসবে বলে  
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন  
বনের কোলে ।

আমলকী ডাল সাজল কাঙাল,  
খসিয়ে দিল পল্লবজাল,  
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি

যায় যে চলে ।

সইবে না সে পাতার ঘাসে  
চঞ্চলতা,

তাই তো আপন রঙ ঘুচাল  
ঝুমকো লতা ।

উত্তরবায় আনার শাসন,  
পাতল তাপের শুষ্ক আসন,  
সাজ খসাবার এই লীলা কার  
অট্টরোলে ।

## শীত

ওগো শীত, ওগো শুষ্ক, হে তীব্র নির্মম,  
তোমার উত্তরবায়ু ছরস্ক ছর্দম  
অরণ্যের বন্ধ হানে । বনম্পত্তি যত  
ধর ধর কম্পমান, শীর্ণ করি নত  
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে । ‘জীর্ণতার  
মোহবন্ধ ছিন্ন করো’ এ বাক্য তোমার  
কিরিছে প্রচার করি অরুণ্ডতা তব  
দিকে দিকে । কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব

করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি  
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি  
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস ।

হে নির্মল,  
সংশয়-উদ্বিগ্ন চিন্তে পূর্ণ করো বল ।  
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,  
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারী,  
শূন্য করি' দাও মন ; সর্বস্বাস্ত্র ক্ষতি  
অস্তরে ধরুক শাস্ত্র উদাত্ত মুরতি,  
হে বৈরাগী । অতীতের আবর্জনাভার,  
সঞ্চিত লাহুনা গানি শ্রাস্তি ভ্রাস্তি তার  
সম্মার্জন করি দাও । বসন্তের কবি  
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি  
লেখে আসি', সে-শূন্য তোমারি আয়োজন,  
সেইমতো মোর চিন্তে পূর্ণের আসন  
মুক্ত করো ক্রন্দ-হস্তে ; কুজুটিকারানি  
রাখুক পুঞ্জিত করি প্রসঙ্গের হাসি ।  
বাজুক তোমার শব্দ মোর বন্ধুতলে  
নিঃশব্দ দুর্জয় । কঠোর উদগ্রবলে  
দুর্বলে করে তিরস্কার ; অট্টহাসে  
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো ; হিমশ্বাসে  
আরাম করুক ধূলিসাৎ । হে নির্মল,  
গর্বহরা, সর্বনাশা, নমো নমো নমঃ ।

## নৃত্য

গান

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন  
আমলকীর এই ডালে ডালে ।  
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে  
ঝরিবে দিল তালে তালে ।

উড়িয়ে দেবার মাতন এসে  
কাঙাল ভারে করল শেষে,  
তখন তাহার কলের বাহার  
রইল না আর অস্তরালে ।

শূন্য করে ভরে-দেওয়া  
মাহার খেলা  
তারি লাগি রইল বসে  
সারা বেলা ।

শীতের পরশ থেকে থেকে  
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,  
সব খোওয়াবার সময় আমার  
হবে কখন কোন্ সকালে ।

### শীতের প্রবেশ

গান

নম, নম, নম নম ।  
নির্দয় অতি করুণা তোমার  
বন্ধু তুমি হে নির্দয়,  
যা কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ  
দণ্ড তোমার দুর্দয় ।

সর্বনাশার নিঃশ্বাস বায়  
লাগল ভালো ।  
নাচল চরণ শীতের হাওয়ায়  
মরণ ভালো ।  
করব বরণ, আশ্রুক কঠোর,  
ঘুচুক অলস পুষ্টির ঘোর,  
যাক ছিঁড়ে মোর বন্ধনভোর  
যাবার কালে ।

ভয় ঘেন মোর হয় খান খান  
ভয়েরি ঘায়ে,  
ভরে ঘেন প্রাণ ভেসে এসে দান  
ক্ষতির বায়ে ।

সংশয়ে মন না ঘেন ভুলাই,  
মিছে শুচিতায় তারে না ভুলাই,  
নির্মল হব পথের ধুলাই  
লাগিলে পায়ে ।

শীত যদি তুমি মোরে দাও ডাক  
দাঁড়ারে দ্বারে—  
সেই নিমেষেই যাব নির্বাক  
অজানা পারে ।

নাই দিল আলো নিবে-যাওয়া বাতি,-  
শুকনো গোলাপ ঝরা যুথী জাতী  
নির্জন পথ হ'ক মোর সাথি  
অঙ্ককারে ।

জানি জানি, শীত, আমার যে-গীত  
বীণায় নাচে  
তারে হরিবার কভু কি তোমার  
সাধ্য আছে ।

দক্ষিণ বায়ে করে যাব দান  
রবিরশ্মিতে কাঁপবে সে তান,  
কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান  
লতায় গাছে ।

যাহা-কিছু মোর তুমি, ওগো চোর,  
হরিয়া লবে,  
জেনো বারেবারে কিরে কিরে তারে  
কিরাতে হবে ।



যা কিছু ধুলায় চাহিবে চূকাতে  
ধুলা সে কিছুতে নারিবে লুকাতে,  
নবীন করিয়া নবীনের হাতে  
সঁপিবে কবে ।

## স্তব

গান

হে সন্ন্যাসী,

হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে  
কিসের জন্ত ?

কুন্দমালতী করিছে মিনতি  
হও প্রসন্ন ।

যাহা কিছু শ্রান বিরস জীর্ণ  
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,  
বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে  
করে বিষন্ন ;  
হও প্রসন্ন ।

সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা  
মরণসত্ত্রে ?

তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি  
শুকানো পত্রে ?

ধরনী যে তব তাওবে সাধি  
প্রলয়বেদনা নিল বৃকে পাতি,  
কল্প এখানে বরবেশে তারে  
করো গো ধন্য ;  
হও প্রসন্ন ।

## শীতের বিদায়

তুচ্ছ তোমার ধবলশৃঙ্গশিরে  
উদাসীন শীত, যেতে চাও বুঝি কিরে ?  
চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার  
নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যার ।  
হেলায় যে-জন ফেলায় সকল তার  
অমিত দানের বেগে ?

দণ্ড তোমার তার হাতে বেণু হবে,  
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,  
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে  
জাগাবে, রহিবে জেগে ।

সে যে মুছে দিবে তোমার আঘাতচিহ্ন,  
কঠোর বাঁধন করিবে ছিন্ন ছিন্ন ।

এতদিন তুমি বনের মজ্জামাঝে  
বন্দী রেখেছ যৌবনে কোন্ কাজে,  
ছাড়া পেয়ে আজ কত অপকূপ সাজে  
বাহিরিবে ফুলে দলে ।

তব আসনের সম্মুখে যার বাণী  
আবদ্ধ ছিল বহুকাল ভয় মানি'  
কণ্ঠ তাহার বাতাসেরে দিবে হানি'  
বিচিত্র কোলাহলে ।

তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা,  
নয় তরুর শাখা পেত তাই লজ্জা ।

তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে  
নীল পীত রাঙা নানা রঙ কিরে এসে,  
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে  
জাগাইবে মত্ততা ।

সম্পদ তুমি যার যত নিলে হরি'  
তার বহুগুণ ও যে দিতে চায় ভরি,  
পক্ষবে যার ক্ষতি ঘটেছিল ঝরি,  
ফুল পাবে সেই লতা ।

ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা বাহারে দিলে,  
সব দিকে যার বাহুল্য ঘুচাইলে,  
প্রাচুর্যে তারি হল আশ্রি অধিকার ।  
দক্ষিণবায়ু এই বলে বার বার,  
বাধন-সিদ্ধ যে-জন তাহারি দ্বার  
খুলিবে সকলখানে ।

কঠিন করিয়া রচিলে পাত্রখানি  
রসভারে তাই হবে না তাহার হানি,  
লুঠি লও ধন, মনে মনে এই জানি'  
দৈন্য পুরিবে দানে ।

বসন্তের প্রবেশ

গান

নম নম নম নম  
তুমি সুন্দরতম ।  
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব,  
ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ  
উৎসবপতি মহানন্দ  
তুমি সুন্দরতম ।

লুকানো রয়ে না বিপুল মহিমা  
বিলম্ব হয়েছে চূর্ণ,  
আপনি রচিলে আপনার সীমা,  
আপনি করিলে পূর্ণ ।

ভরেছে পূজার সাজি,  
 গান উঠিয়াছে বাজি',  
 নাগকেশরের গন্ধরেণুতে  
 উড়ে চন্দনচূর্ণ।

এ কী লীলা, হে বসন্ত,  
 স্নান আবরণ আড়ালে দেখালে  
 সব দৈত্যের অস্ত।

অমানিত মাটি, দিবে তারে মান  
 এসেছ তাহারি জন্ত ;  
 পথে পথে দিলে পরশের দান  
 ধূলিরে করিলে ধন্ত।  
 যেথা আস তুমি বীর  
 জাগে তব মন্দির,  
 বর্ণছটায় মাতে মহাকাশ  
 স্তব করে মহারণ্য।  
 এ কী লীলা, হে বসন্ত,  
 অনেক ভুলারে নিমেষে সহসা  
 দেখালে আপন পশু।

ছিছু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,  
 আজ দেখি এ কী দৃশ্য,  
 শক্তি তোমার স্নন্দর হয়ে  
 জিনিস কঠিন বিশ্ব।  
 তব পুষ্পিত তরু  
 জয় করি নিল মরু,  
 মুক চিত্তের জাগাইলে গান,  
 কবি হল তব শিষ্য।

এ কী লীলা, হে বসন্ত,  
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তি-বিহীন  
করিলে প্রজ্জলন্ত ।

## আবাহন

গান

তোমার আসন পাতব কোথায়,  
হে অতিথি ।  
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায়  
কাননবীধি ।  
ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দকলি,  
উত্তরবায় লুঠ করে তায় গেল চলি,  
হিমে বিবশ বনস্থলী  
বিরলগীতি,  
হে অতিথি ।

সুর-ভোলা ঐ ধরার বাশি  
লুটায় ভূঁয়ে,  
মর্মে তাহার তোমার হাসি  
দাও না ছুঁয়ে ।  
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,  
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,  
জাগবে বনের মুগ্ধ মনে  
মধুর স্মৃতি,  
হে অতিথি ।

## বসন্ত

হে বসন্ত, হে স্নানর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন,  
বৎসরের শেষে  
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবনমোহন  
নব বরবেশে ।

তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্শা করে অশ্রুক্ষণ,  
 আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,  
 ত্যাগের সর্বস্ব দিবে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ  
 তোমার উদ্দেশে ।

স্বর্ঘ প্রদক্ষিণ করি' ফিরে সে পূজার নৃত্যভালে  
 ভক্ত উপাসিকা ।

নশ্র ভালে আঁকে তার প্রতিদিন উদয়াস্তকালে  
 রক্তরশ্মিটিকা ।

সমুদ্রতরঙ্গে সদা মন্ত্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,  
 উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,  
 বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে  
 রচে মরীচিকা ।

আবতিয়া ঋতুমালা করে জপ, করে আরাধন  
 দিন গুনে গুনে ।

সার্থক হল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন  
 মধুর ফাস্তানে ।

হেরিছু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,  
 শুনিছু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,  
 মিলনমাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে,  
 রক্তিম আগুনে ।

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম, যত প্রয়োজন  
 হল অবসান ।

বৃক্ষশাখা রিক্তভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন,  
 খেতে নাই ধান ।

বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি  
 অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোকমঞ্জরী,  
 কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবসশরবরী  
 বনে জাগে গান ।

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা  
ক্ষণকাল তরে ।

মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা  
শূন্য নীলাশ্বরে ।

নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়  
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্তসঙ্ক্যাস্থপ্নের ভেলায়,  
বনের মঞ্জীরধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়  
প্রান্তিকান্তিভরে ।

- তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশূন্যলে  
শক্তি আছে কার ?

ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল বলে  
কর অলংকার ।

সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্যে দোলে ছন্দভরে,  
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম, বাণীর মানসসরোবরে,  
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সংগীতনিব্বারে  
বর্ষিছে ঝংকার ।

নন্দনে আনন্দ ভূমি, এই মর্ত্যে, হে মর্ত্যের প্রিয়  
নিত্য নাই হলে ।

সুদূর মাধুর্যপানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়,  
হার যদি খোলে,

ক্ষণে ক্ষণে সেখা আসি নিস্তর দাঁড়াবে বসুন্ধরা,  
লাগিবে মন্দিররেণু শিরে তার উর্ধ্ব হতে ঝরা,  
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাসরসে ভরা  
যবে তার কোলে ।



## রাগরঙ্গ

গান

রঙ লাগালে বনে বনে,  
চেউ জাগালে সমীরণে ।

আজ ভুবনের দুয়ার ধোলা,  
দোল দিয়েছে বনের দোলা,  
কোন্ ভোলা সে ভাবে ভোলা  
খেলায় প্রাঙ্গণে ।

আন্ বাঁশি তোর আন্ রে,  
লাগল সুরের বান রে,  
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে  
শেষ বেলাকার গান রে  
সঙ্ক্যাকেশের বুকফাটা সুর  
বিদায় রাতি করবে মধুর,  
মাতল আজি অন্তসাগর  
সুরের প্রাবনে ।

## বসন্তের বিদায়

মুখখানি কর মলিন বিধুর  
যাবার বেলা,  
জানি আমি জানি সে তব মধুর  
ছলের খেলা ।  
জানি গো বন্ধু, ফিরে আসিবাব পথে  
গোপন চিহ্ন একে যাবে তব রথে,  
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে,  
যার সাথে তব হল একদিন  
মিলন-মেলা ।

জানি আমি যবে আখিজল ভরে  
 রসের স্নানে  
 মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে  
 নবীন প্রাণে ।  
 ধনে ধনে এই চিরবিরহের ভান,  
 ধনে ধনে এই ভয়রোমাঞ্চ দান,  
 তোমার প্রণয়ে সস্তা সোহাগে  
 মিথ্যা হেলা ।

## প্রার্থনা

গান

জানি তুমি কিরে আসিবে আবার, জানি,  
 তবু মনে মনে প্রবোধ নাছি যে মানি ।  
 বিদায়লগনে ধরিয়া দুয়ার  
 “তবু যে তোমায় বলি বারবার  
 “কিরে এসো, এসো, বন্ধু আমার”  
 বাষ্পবিভল বাণী ।

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো  
 গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয় ।  
 বনপথে যবে যাবে সে-স্বপ্নের  
 হয়তো বা কিছু রবে স্বপ্নের,  
 তুলি লব সেই তব চরণের  
 দলিত কুসুমখানি ।

## অহৈতুক

গান

মনে রবে কি না রবে আমারে  
সে আমার মনে নাই গো ।

ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে,  
অকারণে গান গাই গো ।

চলে যায় দিন, যতখন আছি  
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি  
তোমার মুখের চকিত স্মৃতির  
হাসি দেখিতে যে চাই গো,  
তাই অকারণে গান গাই গো ।

কাণ্ডনের ফুল যায় ঝরিয়া  
কাণ্ডনের অবসানে ।  
ক্ষণিকের মুষ্টি দেয় ভরিয়া,  
আর কিছু নাহি জানে ।

ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ,  
গান সারা হবে, ধেমের মাঝে বীন,  
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি  
এ খেলারি ভেলাটাই গো ।  
তাই অকারণে গান গাই গো ।

## মনের মানুষ

কত-না দিনের দেখা  
কত-না রূপের মাঝে,  
সে কার বিহনে একা  
মন লাগে নাই কাজে ।

- ১ এই ছন্দ চৌপদীজাতীয় নহে । ইহার বতিবিভাগ নিম্নলিখিত রূপে :  
কত-না দিনের । দেখা ॥ কত-না রূপের । মাঝে ॥  
সে কার বিহনে । একা ॥ মন লাগে নাই । কাজে ॥

ক'র নয়নের চাওয়া  
পালে দিয়েছিল হাওয়া,  
ক'র অধরের হাসি

আমার বীণায় বাজে ।

কত কাণ্ডনের দিনে  
চলেছি পথ চিনে,  
কত আবণের রাতে

লাগে স্বপনের ছোওয়া ।

চাওয়া-পাওয়া নিয়ে খেলা,  
কেটেছিল কত বেলা,  
কখনো বা পাই পাশে

কখনো বা যায় খোওয়া

শরতে এসেছে ভোরে  
ফুলসাজি হাতে ক'রে,  
নীতে গোখুরি বেলা

আলায়েছে দীপলিখা ।

কখনো করুণ সুরে  
গান গেয়ে গেছে দূরে,  
যেন কাননের পথে

রাগিনীর মরীচিকা ।

সেই সব হাসি কাদা,  
বীধন খোলা ও বীধা,  
অনেক দিনের মধু,

অনেক দিনের মায়ী—

আজ এক হয়ে তারা  
মোরে করে মাতোয়ারা,  
এক বীণারূপ ধরি

এক গানে ফেলে ছায়া ।

নানা ঠাই ছিল নানা,  
আজ তারে হল আনা,

বাহিরে সে দেখা দিত  
 মনের মানুষ মম—  
 আজ নাই আধাআধি,  
 ভিতর বাহির বাধি  
 এক দোলাতেই দোলে  
 মোর অন্তরতম ।

### চঞ্চল

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে  
 পরশ করিল তোরে ।  
 অন্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে ।  
 বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা  
 বনে বনে তুই বহিস তাহারি ভাষা,  
 অপরীদের দোল-খেলা ফুলরেণু  
 পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভ'রে

যে-গুণী তাহার কীর্তিনাশার নেশায়  
 চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,  
 সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে,  
 গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কুলে,  
 তার হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে  
 ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে ।

### উৎসব

সন্ন্যাসী যে আগিল ঐ, আগিল ঐ, আগিল ।  
 হান্তভরা দধিন বায়ে  
 অঙ্গ হতে দিল উড়িয়ে  
 অশ্লানচিত্তাভস্মরাশি, ভাগিল কোথা, ভাগিল ।

মানসলোকে শুভ্র আলো  
চূর্ণ হয়ে রঙ আগাল,  
মদির রাগ লাগিল তারে,

হৃদয়ে তার লাগিল ।

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে ।

রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে ।

রঙের ঝড় উজ্জ্বল গগনে,  
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সধনে ;—

ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে ।

নাকাড়া বাজে, কানাড়া বাজে বাঁশিতে,

কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে,

প্রাণের মাঝে কোয়ারা তার ছোটালে ।

এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো,

এসেছে পথ-ভোলানো,

এসেছে ডাক ঘরের দ্বার-খোলানো ।

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে ।

রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে ।

উদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়  
পূর্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়—

অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,

চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল ;

অরুণবীণা যে-সুর দিল রনিয়া

সঙ্ক্যাকাশে সে সুর উঠে ধনিয়া,

নীলব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধনি ধনিয়া ।

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে ।

বাঁধনহারা রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে ।

## শেষের রঙ

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার

যাবার আগে,—

আপন রাগে,

গোপন রাগে,

তরুণ হাসির অরুণ রাগে

অশ্রুজলের করুণ রাগে ।

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে,

আমার সকল কর্মে লাগে,

সঙ্কাদীপের আগায় লাগে,

গভীর রাতের আগায় লাগে ।

যাবার আগে যাও গো আমায়

জাগিয়ে দিয়ে

রক্তে তোমার চরণদোলা

লাগিয়ে দিয়ে ।

আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,

পাষাণগুহার কক্ষে নিঝরধারা জাগে,

মেঘের বৃকে যেমন মেঘের মন্ত্র জাগে,

বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,

তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও

যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,

কাদন বান্ধন জাগিয়ে দিয়ে ।

## দোল

আলোকরসে মাতাল রাতে

বাজিল কার বেণু ।

দোলের হাওয়া সহসা মাতে,

ছড়ায় ফুলরেণু ।



অমলকটি মেঘের দলে  
আনিল ডাকি গগনভলে,  
উদাস হয়ে ওরা যে চলে  
শূন্যে-চরা দেখে ।

দোলের নাচে সে বুঝি আছে  
অমরাবতীপুরে ?  
বাজায় বেগু বুকের কাছে,  
বাজায় বেগু দূরে ।

শরম ভয় সকলি ত্যাজে  
মাধবী তাই আসিল সেজে,  
সুধায় শুধু 'বাজায় কে যে  
মধুর মধু সুরে' ।

গগনে শুনি এ কী এ কথা,  
কাননে কী যে দেখি !  
এ কি মিলনচঞ্চলতা ।  
বিরহব্যথা এ কি ।

আঁচল কাঁপে ধরার বুক,  
কী জানি তাহা সূখে না দুখে ।  
ধরিতে যারে না পারে তারে  
স্বপনে দেখিছে কি ।

লাগিল দোল জলে স্থলে,  
জাগিল দোল বনে,  
সোহাগিনীর হৃদয়ভলে,  
বিরহিনীর মনে ।

মধুর মোরে বিধুর করে  
সুদূর তার বেগুর স্বরে,  
নিখিলহিয়া কিসের ভরে  
ছলিছে অকারণে ।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি  
 করবীমালা লয়ে,  
 আনো গো আনো সাজায়ে খালি  
 কোমল কিশলয়ে ।

এস গো পীত বসনে সাজি,  
 কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,  
 ধ্যানেতে আর গানেতে আজি  
 ধামিনী থাক বয়ে ।

এস গো এস দোলবিলাসী,  
 বাণীতে মোর দোলো ।  
 ছন্দে মোর চকিতে আসি  
 মাতিয়ে তারে তোলো ।

অনেক দিন বুকের কাছে  
 রসের স্রোত থমকি আছে,  
 নাচিবে আজি তোমার নাচে  
 সময় তারি হল ।

কিশোর, আজি তোমার দ্বারে  
 পরান মম আগে ।  
 নবীন কবে করিবে তারে  
 রঙিন তব রাগে ।  
 ভাবনাগুলি বাধনখোলা  
 রচিয়া দিবে তোমার দোলা,  
 দাঁড়িয়ে আসি হে ভাবে-ভোলা,  
 আমার আঁখি আগে ।

# উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

# গল্পগুচ্ছ

## সম্পাদক

আমার স্ত্রী-বর্তমানে প্রভা সত্ত্বে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া, তাহার আধো আধো কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভালো লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মাহুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ-কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা ছুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গির্দীপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল ওইটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো; দেখিলাম, আমি নিজের কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে, যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো পুতুল সে ইতিপূর্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে ধাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় গুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পঞ্চপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃহকে কিকিং সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সম্পাদক দ্বিবার্ষিক দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধ্যমতো লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্ণেন্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বীশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা ধরচে বীশি বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই যে-হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আশ্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্তদিন ব্যাকুল চিন্তাশ্রিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্ত্রে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, নাইতে যাবে না?”

আমি হংকার দিয়া উঠিলাম, “এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিসনে।”

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্বাপিত প্রদীপের মতো অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোনো নিরীহ পাশ্ব জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নাম নামক একটা অস্থানে যাইতে অজুরোধ করি। হায়, কেহই বৃদ্ধিত না, আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা বশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অজুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নভোজনের মতো দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।



আহিরগ্রামের পাশে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মূচলেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষকের জীব আমাদের পূর্ববর্তী খুনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জালায় আহিরগ্রাম আর মাধা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল পূর্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আত্মোপাস্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্যাদাসিক্ত বাক্যশেল ছাড়িতাম; আর সমস্ত আহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মতো বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একধানা কাগজ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিয়া বলিত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলি পর্বস্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাত্ম্যাসবৎ এমনি মজা করিয়া এত কুটকৌশল সহকারে বিপক্ষ-দিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্মটা কী।

তাহার কল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভালো জিনিসকে যেমন বিক্রপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হুম্বংলীরেরা হুম্বংলীরদের যেমন সহজে বিক্রপ করিতে পারে, হুম্বংলীরেরা হুম্বংলীরদিগকে বিক্রপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহার দস্তোয়ীলন করিয়া দেখছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলির কথাও লোকে সম্পূর্ণ তুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জলিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

যন এমনি নিকংসাহ হইয়া গেল মাধা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোনো সুখ নাই।



প্রভা আমাকে এখন ডর করে। বিনা আস্থানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বৃষ্টিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভালো সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অভ্যস্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হইক, ভাবার বাহাদুরি আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশজনের কাছে ওই এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মতো ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িতচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখিরা নীড়ে কিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বৃষ্টিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং স্মৃতি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতেছি কী উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বৃষ্টিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না। এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্তরমনক ছিলাম যে, সেই মুহূর্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে আগ্রত, সেই স্পর্শ আমার করতলে সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আশু আশু কাছে আসিয়া মুহূর্তে ডাকিয়াছিল, “বাবা”। কোনো উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে কিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অভ্যস্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে কিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন দ্বৈধ নিমৌলিত; দিনশেষের সন্ধ্যা-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে।

মাথার হাত দিয়া দেখি অভ্যস্ত উষ ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে ; কপালের শির দপ দপ করিতেছে ।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া নিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের অস্ত্র খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল ।

পাশে আসিয়া বসিলাম । বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল ।

জাহিরগ্রাম এবং জাহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম । কোনো জবাব লেখা হইল না । হার মানিয়া এতদুঃখ কখনো হয় নাই ।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম ।

বৈশাখ, ১৩০০

## মধ্যবর্তিনী

### প্রথম পরিচ্ছেদ

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোনো নামগন্ধ ছিল না । জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশ্যক আছে, এমন কথা তাহার মনে কখনো উদয় হয় নাই । যেমন পরিচিত পুরাতন চটি-জোড়ার মধ্যে পা দুটো দিয়া নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাত্ম্য স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে অমেও কোনোরূপ চিন্তা তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না ।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলাগায়ে বসিয়া অভ্যস্ত নিরুদ্বেগভাবে হাঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে । পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়ি ঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারি গান গাহে, পুরাতন বোতল সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায় ; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন

কাঁচা আম অথবা তপসি-মাছওয়ালার আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহায়াস্ত্রে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যাপান করিয়া আহায়াস্ত্রে রাতে শয়নগৃহে স্ত্রী হরশ্চন্দ্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড় ভাত পাঠানো, নবনিযুক্ত ক্রিয় অবাধ্যতা, ছেঁচকিবিশেষে কোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে তাহা এ পর্যন্ত কোনো কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই, এবং সেজন্য নিবারণের মনে কখনো ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ষাটতন মাসে হরশ্চন্দ্রীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের জ্বাশ জ্বরও তত উর্ধ্বে চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কী যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়নগৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুইবেলা ডাক্তার বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত গুরুত্বা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরশ্চন্দ্রী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে 'আছি' বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিম্নাধের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদসঙ্কারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরশ্চন্দ্রীর ঘরের নিচেই প্রতিবেশীদের খিড়কির বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন শখ করিয়া গোটাকতক ফ্রোটন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সেদিকে বড়ো একটা দৃকপাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুম্ভাঙলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলুগাছের ডলার বিষম অঙ্গল; রামাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগুলো ইট জড়ো হইয়া



আছে এবং তাহারই সহিত দৃষ্টাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রানীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে শ্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশস্যের উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে; তখন যেমন প্রভাতের সূর্যালোক তাহার তলদেশ পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ুস্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর সূর্যস্বতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঞ্জুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অস্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত ‘কেমন আছ’, তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্জ সঙ্কতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চূপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অস্তরেও যেন কোথা হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিত।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবর্তী খর্ব অশথ-গাছের কম্পমান শাখাস্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ টাদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গুমট ভাঙিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঞ্জুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, “আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ করো।”

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মাহুয মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। শ্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ একটা বৃহৎ হৃৎধের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিল, আমার স্বামীর অশ্রু আমি খুব বড়ো একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি

সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওয়া যায়। ঐশ্বর্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

আর স্বামীকে যদি দুঃস্থের মতো শুভ্র, নবনীল মতো কোমল, শিশুকন্দর্পের মতো স্নানর একটি মেহের পুতলি সন্ধান দিতে পারিতাম। কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে, সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বক্ষ ক্ষীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এদিকে নিবারণ যত বারংবার এই অমুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মনে হইতে দূর হইল এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, “বুড়াবয়সে একটি কচি খুকীকে বিবাহ করিয়া আমি যাহুয করিতে পারিব না।”

হরসুন্দরী কহিল, “সেজন্ম তোমাকে ভাবিতে হইবে না। যাহুয করিবার ভার আমার উপর রহিল।” বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোর-বয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জালীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সন্তোবিচ্যুতা নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় মেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, “আমার আপিস আছে, কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।”

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিল, তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল, “আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক।”

নিবারণ সে-কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে হাসিয়া তর্জনী আঘাত করিল। এই ভো গেল কুমিকা।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি নোলকপরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড়ো মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলোঢলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উলটিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ওই তো এককোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া তো বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিজ্ঞান পাওয়া যায়।

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদগ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ো আশ্রয় বোধ করিত। এক একদিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, “আহা, পালাও কোথায়। ওইটুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে ধাইয়া কেলিবে না।”

নিবারণ দ্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, “আরে রসো রসো, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।” বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরসুন্দরী তাহার কানের কাছে বলিত, “আহা পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতভ্রম করিতে নাই।”

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিনুক ধরিয়া তাহার আনত মুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, “আহা কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখো দেখি।”

কোনোদিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত ছুটি কোঁতুহলী চক্ষু কোনো-না-কোনো ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে—অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিজার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মুখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হইল না।

হরসুন্দরীর যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড়ো কোঁতুহল,



এ বড়ো রহস্য। এক টুকরা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানারূপে কিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মাছের মন—বড়ো অপূর্ব। ইহাকে কতরকম করিয়া স্পর্শ করিয়া সোহাগ করিয়া অস্তরাল হইতে, সমুদ্র হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দুগ্গে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিছাতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মতো দীর্ঘকাল একদৃষ্টে নব নব সৌন্দর্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাকমোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অন্তরে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একেবারে পাকা আশ্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অগ্নে অগ্নে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কী আগ্রহ। একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আশ্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউনপরা কাঁচের পুতুল কখনো বা এক নিশি এসেল, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ-পঁচিশ খেলিতেছে।

বুড়াবয়সের এই খেলা বটে। নিবারণ সকালে আহাৰাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবন্ধনার কী আবশ্যক ছিল। হঠাৎ একটা জগন্ত বজ্রলকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন—যেন আমি উহাদের সুখের কাটা।

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, “ছেলে-মাছুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর ভেঁমন সবল নহে।”



বড়ো একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল ; কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না ; রান্নাখাবাড়া দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদুষকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে कहিল, তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর অল্প চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাতে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কুল প্রাবিত করিয়া মাহুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বৰ্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চির দারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায় মাহুষ বড়ো দীন, হৃদয় বড়ো দুর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি ধ্বংসাত্মক।

দীর্ঘ যোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সেদিন গুরু দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি লীর্ণ রেখামাত্র ছিল ; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে कहিল, তুমি তো ভ্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিকাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে-শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল, আজ সাতাশ বৎসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহৃদয়তার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যায় উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন শৌখিন ঘুবা বেহাগ রাগিনীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর একজন বীরা-তবলায় সংগত করিতেছিল এবং শ্রোতৃবহুগণ সমের কাছে হাঃ-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালায় ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই।

লোকটা ইতিমধ্যে বন্ধিমবাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া কেলিয়াছে এবং দুই-একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়া ছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই স্বেচ্ছা প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশক্তি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উলটাপালট হইয়া গেল। সে বেচারী কোনোকালে জানিত না মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দাম দুঃস্বপ্ন শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাবকিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছুর করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরস্বন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাজক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। মন এখন যাহা চায়, কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্বে কিয়ৎকালের জল গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন তো এই অস্তুর্বিপ্লবের কোনো সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিন্তু তাহার তো কোনো উজ্জলতা কোনো উত্তাপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রজ্বলিত ইন্ধনের মতো ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্জাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী

ঘটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু ভাগ্যভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিপ্রিয় আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মুহূর্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে ক্ষীণ হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্ত্বঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্মই সমস্ত এবং আমি কাহার জন্মও নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহংকার আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের ডলায় লতাগুল্মের জঙ্গল জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে ডীরের মতো হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, “গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান তো অনেকগুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।”

হরসুন্দরী কোনো উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, “তবে কি আজ হইবে না।”

হরসুন্দরী কহিল, “না।”



ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল, “তবে অন্ততঃ চেষ্টা দেখিগে যাই”, বলিয়া প্রস্থান করিল।

কণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরশ্রুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিল। বুঝিল, নববধূ পূর্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল, “দিদির সিন্দুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পারি না।”

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারসি শাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক-একখানি করিয়া গহনার ভরিয়া দিল। ভালো করিয়া চুল বাধিয়া দিয়া প্রদীপ জালিয়া দেখিল, বালিকার মুখখানি বড়ো স্তম্ভিষ্ট, একটি স্তম্ভঃপক সুগন্ধ কলের মতো নিটোল রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ক্রমক্রম শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরশ্রুন্দরীর শিরার রক্তের মধ্যে কিম্বিকিম করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কী লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ওই বয়স ছিল, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষরেখা পর্ষন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সেদিন আসিল এবং কখন সেদিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু কী গর্বে, কী গৌরবে, কী তরঙ্গ তুলিয়া শৈলবালা চলিয়াছে।

‘হরশ্রুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনাস্তলি তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নিবোধের মতো এ সমস্ত এমন করিয়া একমুহূর্তে হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকন্না ছাড়া আর একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম ভবিষ্যতের হিসাব সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোনামানিক ঝকঝক করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল, একবার মুহূর্তের ভরে ভাবিলও না হরশ্রুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল চতুর্দিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে, কারণ, সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক-একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীকভাবে অভ্যস্ত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যায় মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক আগ্রত মানুষেরও ভেতনি চিরস্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নির্দাক্ষণ সর্বনাশের মধ্যে গিয়া আগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাকমোরান কোম্পানির হেডবাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘুরিতে লাগিল এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ্য পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখসৌভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকমোরান কোম্পানির ক্যাশ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দুটা-একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত আগামী মাসের বেতন হইতে আন্তে আন্তে শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দু-আনিটি পর্বস্ত চকিতের মতো চিকমিক করিয়া বিদ্যায়বেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পুরুষাত্মকমের চাকুরি। সাহেব বড়ো ভালোবাসে, তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, “সর্বনাশ হইয়াছে।”

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, “শীঘ্র গহনাগুলো বাহির করো।” হরসুন্দরী কহিল, “সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।”

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, “কেন দিলে ছোটো-বউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল।”

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, “তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জলে পড়ে নাই।”

শীঘ্র নিবারণ কাতরস্বরে কহিল, “ওবে যদি তুমি কোনো ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু আমার মাথা ধাও বলিয়া না যে, আমি চাহিতেছি কিংবা কী জন্ত চাহিতেছি।”

তখন হরসুন্দরী মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, “এই কি তোমার ছলছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।” বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোটোবউ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, “সে আমি কী জানি।”

সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিষ্ণু ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্ত্যায়।

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বলিল, “সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।”

নিবারণ দেখিল ওই দুর্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্দূকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সংকটের সময় স্বামীর এই দুর্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোছা প্রাচীর লজ্জন করিয়া পুঙ্খরিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, “তালা ভাঙিয়া ফেলো না।”

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিল, “তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।”

নিবারণ কহিল, “আমি আর একটা চেষ্টা দেখিতেছি”, বলিয়া এলোথেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহুকষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরি গেল। স্বাবর-জন্মের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্বাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো স্নাতস্নেতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোটো বউয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন।

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে। শৈলবালা খুঁতখুঁত করিয়া বলে, “আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।”



নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, “আমি আর একটা ভালো বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।”

শৈলবালা বলিত, “কেন, ওই তো পাশে আর একটা ঘর আছে।”

শৈলবালা তাহার পূর্ব-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নাই। নিবারণের বর্তমান ছরবন্দায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল; শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিষ্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতরো উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমন কি, গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, “তুমি শৈলকে বাঁচাও।”

হরসুন্দরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ক্রটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাকা বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই সান্ত্ব খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া কেলিত, জ্বরের সময় কাচা আমের অস্থল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থপাত করিত। হরসুন্দরী তাহাকে “লক্ষ্মী আমার,” “বোন আমার,” “দিদি আমার” বলিয়া শিশুর মতো ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অশুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ বার্ষ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মতো এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উষ্মকনরজ্জু।

আর তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল, সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্বত্বমন্দিরের



মাঝখানে বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জল স্নানর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি স্তম্ভপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর ঘখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরস্নানরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমতো সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরস্নানরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহার পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ সজ্বন করিতে পারিল না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০

## অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কালী কাকি কনোজ কোশল অথ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের ভর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল,—আসল যে-কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় একমুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, “লেখকমহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বলো দেখি কে ছিল সে রাজা।”

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহার প্রকাণ্ড প্রস্তুত-পণ্ডিতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, “এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।”

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, “অজ্ঞাতশত্রু। ভালো, কোন্ অজ্ঞাতশত্রু বলো দেখি।”

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যান, “অজ্ঞাতশত্রু ছিল তিনজন। একজন ক্রীষ্টানের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আট মাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।” অবশেষে দ্বিতীয় অজ্ঞাতশত্রু সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজ্ঞাতশত্রু পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছান তখন পাঠক বলিয়া উঠে, “ওরে বাস রে, কী পাণ্ডিত্য। এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত লিঙ্কাই হইল। এই লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আচ্ছা লেখকমহাশয়, তার পরে কী হইল।”

হায় রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাসে, অথচ পাছে কেহ নিবোধ মনে করে এ ভয়টুকুও যোলো আনা আছে; এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার কল হর এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে “প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।” বালক সেইটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সত্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মুখোশ-পর্য্য মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমূগ্ধ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এই জন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি, তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বৃত্তিত আসল কথাটা কোন্টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভীতচিন্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া

আসিবার উপক্রম হয় তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি। কোনোমতে সজ্জা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও। তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমাত্র সজ্জার নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাস্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, আঘাতে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিখরের একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্ব পার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নের কোনো একটি বিরহিনীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে, বিশেষত পঞ্চটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মল্লতের বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায় মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবান্স একমুহূর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঙ্করের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পা.পর যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাস্টার হইয়া এবং আমার মাস্টারমহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাস্টারমহাশয়ের মাস্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখোমুখি বসিয়া প্রদীপালোকে বিস্তি খেলিতেছিলেন। রূপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে।” আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, “আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাস্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।”

আশা করি, অপ্ৰাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোনো সিলেকশন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সেজন্য কোনো শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন, “আজ তবে থাক, মাস্টারকে যেতে বলে দে।”

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্বেগভাবে বিস্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা গেল যে মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।



কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অশুভ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দুষ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম, “দিদিমা, একটা গল্প বলো।” দুই-চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, “র’স্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।”

আমি কহিলাম, “না, খেলা তুমি কাল শেষ ক’রো, আজ দিদিমাকে গল্প বলতে বলো না।”

মা কাগজ কেলিয়া দিয়া কহিলেন, “যাও খুড়ি, উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।” মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, আমার তো কাল মাস্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার মধ্যে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশবালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া, নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সংবরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম, “গল্প বলো।”

তখনও রূপ রূপ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রানী। আঃ, বাঁচা গেল। স্নয়ো এবং দুয়ো রানী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই। পূর্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোনো চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছেন এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্শা করিবার জন্ত বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, দুঃখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্ত বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাস্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রানী এবং একটি বালিকা কন্যা ঘরে কেলিয়া রাজা তপস্শা করিতে চলিয়া গেলেন। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এদিকে রাজকন্যা বোড়নী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু রাজা কিরিলেন না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রানীর মুখে অন্নজল রুচে না। “আহা আমার এমন

সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবুড়ো হইয়া থাকিবে। ওগো, আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।”

অবশেষে রানী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া থাইয়া যাও।”

রাজা বলিলেন, “আচ্ছা।”

রানী তো সেদিন বহুযত্নে চৌষটি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোনার ধালে ও রূপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকাষ্ঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে কিরিয়া আসিয়া থাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চান আর রাজার থাওয়া হয় না। শেষে রানীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হা গো রানী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো এ মেয়েটি কে গা। এ কাহাদের মেয়ে।”

রানী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, “হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারই মেয়ে।”

রাজা বড়ো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়োটি হইয়াছে?”

রানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “তা আর হইবে না! বল কী, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল।”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেয়ের বিবাহ দাও নাই?”

রানী কহিলেন, “তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়। আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব।”

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি ক্ষমবাস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, “রসো আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।”

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চূড়িতে ঠুং ঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুকনা কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত-আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে

লক্ষ্যন করিতে পারে, তখনই ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্য়ার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই আয়গাটাতে দিদিমার খুব কাছ ঘেঁষিয়া খুব নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে ? নিজেকে সেই সাত-আট বৎসরের সৌভাগ্যবান কাঠকুড়ানে আশ্রয়ের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই। যখন সেই রাত্রে ঝুপ ঝুপ ঝুটি পড়িতেছিল, মিট মিট করিয়া প্রদীপ জলিতেছিল এবং গুন গুন স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালক-হৃদয়ের বিশ্বাসপরাগণ রহস্যময় অনাবিকৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই য, সেও একদিন সকালবেলায় কোথায় এক রজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার প্রতিমা লক্ষীঠাকরুনটির মতো রাজকন্য়ার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল ; মাথায় তাহার সিঁধি, কানে তাহার ছল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কঁকন, কটিতে তাহার চন্দ্রহার, এবং আলতাপরা দুটি পায়ে নূপুর ঝম ঝম করিয়া বাজিতেছে।

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত। প্রথমত রাজা যে বারো বৎসর বনে বসিয়া থাকেন এবং ততদিন রাজকন্য়ার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোনো গতিকে গোল-মালে পার পাইয়া যাইত, কিন্তু কন্য়ার বিবাহের আয়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। একে তো এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়ত, সকলেই আশঙ্কা করিত আশ্রয়ের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয়কন্য়ার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকেরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে ? তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পাঙ্কিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপরে ?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে রাজকন্য়া মনের দুঃখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সেই আশ্রয়ের ছেলেটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে বড়ো যত্নে মানুষ করিতে লাগিল।



আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আরও একটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে ?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওই যে সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয়।

ব্রাহ্মণের ছেলে তো ভাবিয়া অস্থির, কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, মেয়েটি তাহার কে হয়। একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুকনা কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কী একটা মন্ত গোলমালে কাঠ কুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে। এমনি করিয়া চারি-পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা ওই যে সাতমহলা বাড়িতে পরমাক্ষরসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয়।”

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, “আমাকে আমার পাঠশালার প’ড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ওই যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমাক্ষরসী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয়। আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বলো।”

রাজকন্যা বলিল, “আজিকার দিন থাক, সে-কথা আর একদিন বলিব।”

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, “তুমি আমার কী হও।”

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, “সে-কথা আজ থাক, আর একদিন বলিব।”

এমনি করিয়া আরও চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড়ো রাগ করিয়া বলিল, “আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও, তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।”

তখন রাজকন্যা কহিলেন, “আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।”

পরদিন ব্রাহ্মণতনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল, “আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো।”

রাজকন্যা বলিলেন, “আজ রাত্রে আহা করিয়া তুমি যখন শয়ন করিবে তখন বলিব।”

ব্রাহ্মণ বলিল, “আচ্ছা।” বলিয়া সূর্যাস্তের অপেক্ষায় গ্রহর গনিতে লাগিল।



এদিকে রাজকন্যা সোনার পালকে একটি ধবধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন, ঘরে সোনার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাশ্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গনিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনোমতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালকে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাহার স্বামীর পায়ে প্রসাদ ধাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, সাতমহলা বাড়ির একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালকে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে।

আমার যেন বন্ধঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি ক্রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে কী হইল।

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে—। কিন্তু সে-কথায় আর কাজ কী। সে যে আরও অসম্ভব। গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতেই মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা ‘তারপরে’ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে ‘তার-পরে’র উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অহুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস। এইজন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া কিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাস্টারবিহীন এক সঙ্ঘ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিরক্লদ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার কিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে—কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি ছই মস্ত পড়িয়া যাত্র—যে সেই রূপ রূপ বৃষ্টির রাতে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকণ্ঠের হইয়া আসে, তাহাকে এক রাজ্যের সুধনিজার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদ্রিয়া আসে, তখনও তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি নিশ্বাস নিশ্বাস নিশ্বাস শ্রোতের মধ্যে সুস্থিতির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে ছুটি মায়ামস্ত পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে আগ্রত করিয়া তোলে।

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীক এ সৌন্দর্যসাম্রাজ্যের অন্তঃ এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাধুখ হয়, তাহার কাছে কোনো কিছুই আর 'ভার পরে' নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় স্মৃতিষ্ট স্বরে স্তমিতাম —

আমার কথাটি ফুরোল,  
ন'টে গাছটি মুড়োল।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে স্তমিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোল না,  
ন'টে গাছটি মুড়োল না।  
কেন রে নটে মুড়োলিলে কেন।  
তোর গল্পতে—

দূর হউক গে, ওই নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই। আবার কে কোন্-দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

আষাঢ়, ১৩০০

## শান্তি

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দুধিরাম কই এবং ছিদাম কই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চোঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের স্রায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়ানুহু লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। ভীত কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে— “ওই রে বাধিয়া গিয়াছে,” অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্বদিকে পূর্ব উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না, তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই আয়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের অন্ত কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা একাগ্রাভিতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই প্রিংবিহীন চাকার অবিভ্রাম ছড়ছড় খড়খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যেদিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত ধমধম ছমছম করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল, সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া প্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, স্তব্ধ গৃহ গমগম করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলময় পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাস্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্তক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিক্রপায় মৃষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অস্তিম অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুধিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাکیয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাজেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক কাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্তদিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পার নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিতমতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং



তাহার পরিবর্তে যে-সকল অগ্নায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাণ্ডনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দ্রা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চূপ করিয়া পড়িয়া আছে,—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সে-ও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে, আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল—তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পাশে চিং হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুধিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, “ভাত দে।”

বড়ো বউ বাকুদের বস্তায় ফুলিঙ্গপাতের মতো একমুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া উঠিল, “ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।”

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অল্পহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর কক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুধিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, “কী বললি।” বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে দ্রুত মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দ্রা রক্তসিক্ত বস্ত্রে “কী হল গো” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুধিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোন্ধ লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে বাহারা নূতনপক ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাচ-সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিভ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চূপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার কোণী প্রজা দুধির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুন্দিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। দেখিলেন ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অঙ্ককার দাওয়ার দুই-চারিটা অঙ্ককার মূর্তি অম্পষ্ট দেখা বাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অক্ষুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত মা মা বলিয়া কাদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দুধি, আছিস নাকি।”

দুধি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অন্ধনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্তদিনই চীংকার শুনিয়াছি।”

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। কস করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, “হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।”

চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, “কিন্তু সে অল্প দুধি কাদে কেন রে।”

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, “ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়ো বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।”

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোনো বিপদ থাকিতে পারে এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব। মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “জ্যা! বলিস কী! মরে নাই তো!”

ছিদাম কহিল, “মরিয়াছে।” বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম রাম, সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িয়ায়। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম

কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না, কহিল, “দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।”

মামলামোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, “দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই ধানায় ছুটিয়া যা—বল্গে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলার ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ-কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।”

ছিদামের কণ্ঠ শুধু হইয়া আসিল, উঠিয়া কহিল, “ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।” কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তীও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন, কহিলেন, “তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।”

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুঃ শব্দে পুলিশ আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে-কথা গান্ধী রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল কোনোমতে সে-কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্বন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, “যাহা



বলিতেছি তাই কর তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব—আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দ্রার বয়স সত্তেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি ছোটপুটে গোলগাল শরীরটি অনতিদীর্ঘ আটসাঁট সুস্থসবল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে কিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নুতন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রহি লিখিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ার গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে; এবং কুস্তককে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঝেঁক কাক করিয়া উজ্জল চকল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উলটা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, যদুপরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুধিরাম মাহুঘটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা ধর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃষ্টমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও যায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিকৃপার মাহুঘ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহুযত্নে ঝুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহ্যাবজ্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাহিয়া ককি কাটিয়া আহুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অরলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া কেলিয়াছে—বেশভূষা-সাজসজ্জায় বিলম্ব একটু যত্ন আছে।

অপর্যাপন্ন গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোমগ্ন করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার মধ্যেই ছিল—তবু



ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন কি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সে-ও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পৰ্বটন করিয়া আসিয়া কানী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজেকর্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া স্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভংসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত যুত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোট্টে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্‌দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।”

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, “কেন দিদি তোমার এত ভয় কিসের।” এই দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, “এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।”

চন্দরা বলিল, “তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লক্ষ্মে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর কোনো অবরোধ করিল না,—কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশক্তি ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমন কি, এক-একবার মনে হইত এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি।—মাছুষের উপরে মাছুষের যতটা দীর্ঘ হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময় ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দ্রাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো ছুটি চক্ষু কালো অগ্নির স্তার নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাখ্যা একান্ত বিমূখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, “তোমার কিছু ভয় নাই।” বলিয়া পুলিশের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দ্রা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না; কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দ্রার উপর দোষারোপ করিতে বলিল, দুখি বলিল, “তাহা হইলে বউমার কী হইবে।” ছিদাম কহিল, “উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।” বৃহৎকার দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস বড়ো জা আমাকে বাঁচাইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অল্পকূলে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দ্রাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিশ যখন চন্দ্রাকে প্রশ্ন করিল, চন্দ্রা কহিল, “হা আমি খুন করিয়াছি।”

কেন খুন করিয়াছ।

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোনো বচসা হইয়াছিল ?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল ?

না।

তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল ?

না।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, “উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—”

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সে-ই একই উত্তর পাইল—বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধু, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাফিস এবং ইন্সপেক্টরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সইসাঙাতরা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিশ-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভরে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, “দোহাই হজুর, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।” হাকিম ধমক দিয়া তাহার উজ্জ্বল নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভ্রমসাক্ষী



রামলোচন কহিল, “খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ‘বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন।’ আমি ভালো মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, আমি যদি বলি আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাধ্যম স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।’ আমি কহিলাম, ‘ধবরদার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিথ্যা বলিস না—এতবড়ো মহাপাপ আর নাই’ ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলো গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ রে শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেটুকু বলা ভালো, এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধানক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রক্তনশালার পশ্চাদ্বর্তী একটি ডোবার অংশ-বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং ডুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতখত লোক আপন আপন কড়াগুতা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত উদপেক্ষা গুরুতর আর কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, “ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কতবার করিয়া বলিব।”

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জানো?”

চন্দরা কহিল, “না।”

জজসাহেব কহিলেন, “তাহার শাস্তি ফাঁসি।”

চন্দরা কহিল, “জগো তোমার পায়ে পড়ি। তাই দাওনা সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।”

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল, চন্দরা মুখ কিরাইল। জজ কহিলেন, “সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো এ তোমার কে হয়।”

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, “ও আমার স্বামী হয়।”

প্রশ্ন হইল—ও তোমাকে ভালোবাসে না?

উত্তর। উঃ ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, “আমি খুন করিয়াছি।”

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া, মুর্ছিত হইয়া পড়িল। মুর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, “সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।”

কেন।

ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্ত ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিশ হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এককথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরাত্রি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেসার পুতুল কেলিয়া বাপের ঘর হইতে শব্দরবে আসিল, সেদিন রাতে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সঙ্গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?”

চন্দ্রা কহিল, “একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।”

ডাক্তার কহিল “তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।”

চন্দ্রা কহিল, “মরণ।—”

• প্রাবণ, ১৩০০

## একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু আর তো পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারিদিকে কখন জড়ো হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অঙ্গগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে; শুভাদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অঙ্গগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অঙ্গগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমতো সে চেষ্টার ক্রটি হয় নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অ নির্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কর্তব্য আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না তাহা লইয়া বিনয় বা অহংকার করিতে চাহি না কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জনচর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন। ব্যাতি বলা জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও তো একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো। চিত্তও সেই নিরালা বাসস্থানটুকুর জন্ত সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভুল বুঝিয়াই হউক, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উদ্ভীর্ণ করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হস্ত করিতেছেন; আমি তাহার সেই হস্তে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না।

পলারন করাও আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্তদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা বড়বড়ই মুন্দের অপেক্ষা শক্তির মধ্যেই অধিকতর ক্ষুতি পাইতে পারিত কিন্তু যখন সে নিজে এবং পরের ভ্রমক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া



দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনাপূর্বক প্রাণিগণকে যথাসাধ্য কর্ণে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য দৃঢ় নিষ্ঠায় সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ক্রটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অকণ্ঠ্য প্রকাশ করিয়া কিছু আত্মগৌরব অল্পভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক। পৃথিবীতে সাধারণত ইহাই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই “সাধারণ” নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতিচিন্ত রাজাকে তাহার অল্পচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অল্পগ্রহ-নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক তো কিছু শুনাইব। শ্রাস্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতেছে। মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশত শুনিতে ধৈর্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন সুধানিবৃত্তিপূর্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশোকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুস্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, “ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন ক্রামল স্নানর বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আত্মোপাস্ত জীর্ণ।”

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে বলিল, “ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে অস্তঃস্থারবিহীন।”

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লক্ষ দিয়া, পৃথিবীর কোমল কর্ণে অনবরতই চকু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল এবং কাঠঠোকরা বনম্পতির কঠিন শাখায় বারংবার চকু আঘাত করিয়া অরণ্যের অস্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিজ্ঞার বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাভুলে নব নব বসন্তসমাগম পক্ষর স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্রীমা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রাস্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভালো লাগিল না? ভালো লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্বাঙ্গের মতঃ শুধু এই যে, পাঁচ-সাত প্যারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এই গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ পৃথিবীর ভাগ্যানোষে এ গল্প অতিপুরাতন হইয়াও চিরকাল নূতন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহেশ্বরের উপর ঠক ঠক শব্দে চকুপাত করিতেছে, এবং কাঁদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ খচ শব্দে চকু বিদ্ধ করিতেছে—আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কী আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চকু আপনার উপযুক্ত খাত্ত না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্রামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে এই দুটি বিষয়-বিষমজর্জর হতভাগ্য বিহীন, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পার না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাধ্যমুত্ত্ব অর্থ কী আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য বিশেষ কিছুই অটিল নহে, হয়তো কিঞ্চিৎ বয়সপ্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

যাহাই হউক সর্বশুদ্ধ জিনিসটা তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই?

তাহার তো কোনো সন্দেহমাত্র নাই।

ভাদ্র, ১৩০০

## সমাপ্তি

## প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ বি এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অস্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন জীবনের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাগবাড়ের তলদেশ চূর্ণন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষার কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জলজল এবং বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাক ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বের আগমন-সংবাদ বাড়ির কো জানিত না সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবাযাত্রা, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি,—কোথা হইতে এক স্মিট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্তলহরী উচ্ছ্বসিত হইয় নিকটবর্তী অশথগাছের পার্বশুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্তবেগে এখনই শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে যুগ্মরী। দূরে বড়ে নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অধ্যাতিক কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছ্বল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কাস্থিত। গ্রামের যত ছেলের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গের উপদ্রব বলিলেই হয়।



বাগের আকরের সেরে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রভাব। এই সময়ে বন্ধুদের নিকট কুমারীর বা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ বাগ ইহাকে ভালোবাসে, বাগ কাছে থাকিলে কুমারীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অস্তরে বড়োই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্বরণপূর্বক কুমারীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

কুমারী দেখিতে শ্রামবর্ণ। ছোটো কৌকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বাগকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট স্নান সর্বল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্মুখে ললব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখ-রক্তভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত সব-নিকাপতন হয়, কিন্তু কুমারী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কৌকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কোতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালকসঙ্গীদের নিকট কিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে দুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমন কি, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্ত নহে, আর একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মল্লপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে-মুখে সেই অন্তর-গুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি ছরস্র অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচকল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, কুমারীর কোতূহলস্বভাবনি বতাই স্মৃতিতে হউক দুর্ভাগা অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে ভাড়াভাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া যুক্তিমুখে ক্রতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রোদ্দ, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইটের তুপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শুক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম ক্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হস্তধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাটা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর-দধি-কুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্ত প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল, কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধূয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়া ছিল যে, বি এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেইজন্ত অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অর্ন্তএব এখন আর কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, “আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।” মা কহিলেন, “পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্ত তোকে ভাবিতে হইবে না।” অপূর্ব ওই ভাবনাটা নিজের ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, “মেরে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।” মা ভাবিলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে-রাত্রে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিলীধের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রাপ্ত হইতে বিজ্ঞান বিনিত্র শব্দায় একটি উজ্জ্বলিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হস্তধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদাঙ্কনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিত্তা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাহার পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্ত উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহার বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান

জোকা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশকরা একজোড়া জুতা পারে দিয়া সিন্ধের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সজ্জাবিত শতরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ-সমাদরের খটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কল্পিতহৃদয় মেয়েটিকে বাড়িয়া মুছিয়া বঃ করিয়া খোঁপায় রাখা ছড়াইয়া একখানি পাতলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রোঁতা দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার প্রবেশোদ্ভূত লোকটির পাগড়ি, বড়ির চেন এবং নবোদ্ভূত শ্রুত একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ংকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কী পড়।” বসনভূষণাচ্ছন্ন লক্ষ্মীপুত্রের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রোঁতা দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করত্যাড়নের পর বালিকা মুহূর্ত্তে একনিঃশ্বাসে অত্যন্ত ক্রম বসিয়া গেল, চাকপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশাস্ত্র গতির ধূপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে দৌড়িয়া ইপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃদুস্রী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃকপাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্ববেষ্টিতাক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য ভীতভাবে মৃদুস্রীকে ভৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনায় সমস্ত গাম্ভীৰ্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়িপরা মস্তকে অপ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে বড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সম্মত চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথায় ঘোমটা টানিয়া ধুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃদুস্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি শুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভয়ানক অকস্মাৎ অবগুপ্তন মোচনে রাখাল বিল বিল শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অজ্ঞায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, একুপ ঘেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্বে মৃদুস্রীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার খুঁটির মধ্যে কাঁচি ঢালাইয়া দেয়। মৃদুস্রী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে



কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল কাঁচ কাঁচ শব্দে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কৌকড়া চুলের শব্দকণ্ডলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের শুপের মতো শুক্ক শুক্ক মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অন্তঃপুর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্ঠাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুহ্মরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। ঘরের নিকটে গিয়া দেখে, বার্নিশ-করা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোজ করিয়া অবশেষে অনন্তোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন টিলা চটিজোড়াটা পরিয়া প্যান্টলুন চাপকান পাগড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্ত-কলোচ্ছ্বাস। যেন তরুণপল্লবের মধ্য হইতে কোতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ওই অসংগত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিভভাবে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

যুগ্মরী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কৌকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহস্র দৃষ্ট মুখখানির উপরে শাখাস্তরালচ্যুত সূর্য-কিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নিরুপরিণীর দিকে অবনত হইয়া কোতুহলী পথিক যেমন নিবিষ্টদৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে, অপূর্ব ভেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে যুগ্মরীর উর্ধ্বোৎক্লিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া যুগ্মরীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপকল্প নীরব শান্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নৃপুরনিষ্কণের জায় চঞ্চল হস্তধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্তদিন নানা ছুতা করিয়া অস্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমজ্জন ছিল, ধাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গভীর ভাবুক লোক একটি সামান্ত অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়ারগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্ত লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হান্তান্বিত করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, ছুতা, কবিনির ক্যান্ডর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং “হারমোনিয়ম শিক্ষা” বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্তে ভাবী উষার জ্বাশ প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চল মেয়েটির কাছে শ্রীবুদ্ধ অপূর্বকৃষ্ণ রায় বি. এ কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?”

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, “মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।”

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি!”

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে যোধের মাথায় বলিয়া বসিল, মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্য জড়পুতলি মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সংকে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্বেক হইল।

তুই-তিনদিন উত্তরপক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপূর্বই জরী হইল। মা মনকে বোকাইলেন যে, মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃন্ময়ীর মা উপবৃত্ত শিক্ষানবাসে

অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃন্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু তখনই আবার তাহার ধর্ম কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদ্ভূত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্রে পূর্ণ করিতে লাগিল। তথাপি আশা করিলেন, দূঢ় করিয়া চুল বাধিয়া এবং জবজবে করিয়া তেল মেলিয়া কালে এ ক্রটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্য বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানিরূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট বিক্রয়কার্কে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার অন্ত দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভালো আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমতো মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃন্ময়ীর মা এবং পল্লীর ষত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃন্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, ক্রতগমন, উচ্চহাস্ত, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ-পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃন্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুই পোনি ঘোড়ার মতো ষাড় বাকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, “আমি বিবাহ করিব না।”



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্কা আরম্ভ হইল। একরাত্রির মধ্যে মুন্সীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্বর মার অস্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শান্তী সংশোধনকার্বে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, “দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুঁকী নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।”

শান্তী যে-ভাবে বলিলেন মুন্সী সেভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এঘরে যদি না চলে তবে বুদ্ধি অন্তত্ব ঘাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলার রাখাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাড়া রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শান্তী, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিনীগণ মুন্সীকে ঘেরুপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া রূপ রূপ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্বরূপ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মুন্সীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, “মুন্সী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?”

মুন্সী সতেজে বলিয়া উঠিল, “না। আমি তোমাকে কক্খনোই ভালোবাসব না।” তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের গায় অপূর্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব স্কুল হইয়া কহিল, “কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।” মুন্সী কহিল, “তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।”

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈকিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শান্তী মুন্সীর বিজ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়বড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পলাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সম্মুখে তাহার ধূলিলুপ্তিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃন্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এস আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।” মৃন্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, “না।” অপূর্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “একবার দেখো কে এসেছে।” রাখাল ভূপতিত মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির স্থায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃন্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, “রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?” সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, “না।” রাখালও স্তব্ধ নয় বুঝিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া ইঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ী কাদিতে কাদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন মৃন্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাহার প্রাণ-প্রতিমা মৃন্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতীকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃন্ময়ী শান্তডীকে গিয়া কহিল, “আমি বাবার কাছে যাব।” শান্তডী অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভৎসনা করিয়া উঠিলেন। “কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাবার কাছে যাব। অনাস্থি আবদার।” সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, “বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।”

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃন্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্নারাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃন্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে-পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক ‘রানার’ গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃন্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মৃন্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা

বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল। চিঠির খলে কাঁধে করিয়া উর্ধ্বাঙ্গে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মুন্সরী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর প্রার্থনায় কহিল, “কুশীগঞ্জ আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো না।” সে কহিল, “কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানিনে।” এই বলিয়া ঘাটে বাধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মুন্সরী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, “মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে।” মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, “আরে কে ও? মিছা মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।” মুন্সরী উৎসাহিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, “বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোমার নৌকায় নিয়ে চল।” বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছ্বলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলম্ব চিনিত, সে কহিল, “বাবার কাছে যাবে? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।” মুন্সরী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুঘলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মুন্সরীর সমস্ত শরীর নিদ্রার আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুঃস্থ বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার স্বপ্নবাদের ঘাটে গুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শান্তডী আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মুন্সরী বিস্ময়িতমনে নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিকাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মুন্সরী ক্রতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাধা ধাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, “মা, বউকে দুই-একদিনের জন্য একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।”

মা অপূর্বকে ‘ন জুতো ন ভবিষ্যতি’ ভৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেখে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্বীকারকারী দল্লী-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গণনা করিলেন।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্তদিন বাহিরে ঝড়ঝুড়ি এবং ঘরের মধ্যেও অল্পরূপ দুর্ভোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, “মৃন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে ?”

মৃন্ময়ী সবেগে অপূর্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, “বাব।”

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল, “তবে এস আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।”

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সঙ্কটস্থ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সম্বন্ধেও অনতিবিলম্বেই মৃন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুইধারে কত গ্রাম বাজার শস্তক্ষেত্র বন, দুইধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওই নৌকায় কী আছে, উহার কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন সকল প্রশ্ন তাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতার কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুনসেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুলীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বলাইয়া ছোটো ডেকের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা দৈশানচক্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, “বাবা।” সে ঘরে এমন কর্ণধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই সমস্ত পাটের বস্ত্রের মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ভাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, “বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।” অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানান্তর, লোকান্তর, অন্নান্তর, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে কোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উদ্ভিত হয় তেমনি দরিদ্রের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুইবেলা নিরমিত স্ত্রীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা। এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাঁধাঝাড়া। তাহার পরে মৃন্ময়ীর বলয়বন্ধিত স্নেহহস্তের পরিবেশনে স্বপুত্র জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহিণীপনার সহস্র ক্রটি প্রদর্শনপূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকি উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, “কাজ নাই।”

বিদায়ের দিন কল্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদগদ-কণ্ঠে ঈশান কহিল, “মা, তুমি স্বপুত্রবর উজ্জল করিয়া লক্ষী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিছর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।”

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে কিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত খাল ওজন করিতে লাগিল।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধিগণ গৃহে কিরিয়া আসিলে মা অভ্যস্ত গভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন

না, বাহা সে কালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ নিস্তর্র অভিমান লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চালিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, “মা, কালেক্স খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।”

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, “বউয়ের কী করবে।”

অপূর্ব কহিল, “বউ এখানেই থাক।”

মা কহিলেন, “না বাপু, কাজ নাই। তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।”  
সচরাচর মা অপূর্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্লম্বরে কহিল, “আচ্ছা।”

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাতে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মৃন্ময়ী কাঁদিতেছে।

ইঠাং তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষমকণ্ঠে কহিল, “মৃন্ময়ী, আমার সঙ্গে কলিকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?”

মৃন্ময়ী কহিল, “না।”

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমাকে ভালোবাস না?” এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-একসময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বাটীত এত জটিলতার সংশ্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, “রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?”

মৃন্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, “হাঁ।”

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতি-সূক্ষ্ম অথচ অতি সূতীক্স ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, “আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পাব না।” এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃন্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না। “বোধ হয় দু-বৎসর কিংবা তারও বেশি হতে পারে।” মৃন্ময়ী আদেশ করিল “তুমি কিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।”

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উখিত হইয়া কহিল, “তুমি তাহলে এইখানেই থাকবে?”

মৃন্ময়ী কহিল, “হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।”

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “আচ্ছা, তাই থেকে। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?”



মুম্বয়ী এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু অপূর্বর ঘুম হইল না, বালিশ উচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রইল।

অনেক রাজে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মুম্বয়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রূপার কাঠি হস্ত, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মুম্বয়ীকে জাগাইয়া দিল—কহিল, “মুম্বয়ী, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।”

মুম্বয়ী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, “এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?”

মুম্বয়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, “কী।”

অপূর্ব কহিল, “তুমি ইচ্ছা করিয়া ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুখন দাও।”

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মুম্বয়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্ত সংবরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুখন করিতে উদ্যত হইল—কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। হাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড়ো কঠিন পণ। দৃশ্যবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার স্তায় সর্গোরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মুম্বয়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যাখ্যের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, “ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইব, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।”

শুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে কোথায় যাইবে কাহার সহিত দেখা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে-অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পকপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অন্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্থিতি সেই আর একটা বাড়ি, আর একটা ঘর, আর একটা শয্যার কাছে গুনগুন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হস্তধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, “মা, আমাকে শস্তুরবাড়ি রেখে আয়।”

এদিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণ মুখ স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়োই বিধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী স্নানমুখে শান্তুড়ীর পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শান্তুড়ী তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শান্তুড়ী বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য

হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাওড়ী স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাওড়ীকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাওড়ীও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অস্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম-আঘাতের শ্রামসঞ্জল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছামুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় বাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অহুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।

তাহার পর, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল সেই পুষ্করিণী সেই পথ সেই তরুতল সেই প্রভাতের রোদ্দ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুপন অপূর্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুপন এখন মক্কমরীচিকাভিমুখী তুষার্ত পাখির স্তায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয় মনে কেবল উদয় হয়, আহা অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রস্তাব যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।

অপূর্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, মৃন্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই; মৃন্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী বুঝিয়া গেলেন। অপূর্ব তাহাকে যে ছুরস্তু চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া



জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না ইহাতেই সে পরিভাপে লজ্জায় ধিকারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুপনের এবং সোহাগের সে ঞ্জলি অপূর্বর মাথার বাগিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি পাড় দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্কুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো। আর কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল; এইজন্য আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিগু পুঁটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোকুর বাছুর হয়েছে। এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেখাকায় মূড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেখাকায় নামটুকু ব্যতীত আরও যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শান্তড়ী অথবা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য এ পত্রের কোনো কল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ করা

হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে যুগ্মরীকে আরও ছেলেমানুষ মনে করিতেছে; মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিকের ক্রায় অন্তরে অন্তরে ছটকট করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস।” দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, “হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাস্তবের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্‌কালে পেয়েছে।”

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন যুগ্মরীকে ডাকিয়া কহিলেন, “বউমা, অপু অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসিগে। তুমি সঙ্গে যাবে?” যুগ্মরী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া বিষন্ন হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অল্পতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিঙা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন যুগ্মরীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেরই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমতো হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল মা আসিয়াছেন, লীঘ্র আসিবে এবং রাতে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।—শেষ আশ্বাস সম্বন্ধেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিষম হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, সব ভালো তো।” মা কহিলেন, “সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।”

অপূর্ব কহিল, “সেজন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়ানো” ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, এবার বউকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।”

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, “আইনের পড়ানো” ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল, “ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।”

ভগ্নী কহিল, “ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁতকে উঠতে পারে।”

এই ভাবে হাস্তপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন যুগ্মীয় ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ-সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রস্তাব করিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিমর্ষ বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, “দাদা, আজ আমাদের এইখানেই থেকে যাও।”

দাদা কহিল, “না বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।”

ভগ্নীপতি কহিল, “রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।”

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্ত্বে অপূর্ব সে-রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, “দাদা তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি ক’রো না, চলো স্ততে চলো।”

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাভ্যন্তরে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তরপ্রত্যুত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, “বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি, তা আলো এনে দেব কি দাদা।”

অপূর্ব কহিল, “না দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখিনি।”

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দম্ভার মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুঞ্চে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল তাহার পুর বুকিতে পারিল অনেকদিনের একটি হাস্তবান্ধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

আশ্বিন, ১৩১০



## সমস্যা পূরণ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

কিঁকড়া কোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কালী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন বদান্যতা, এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি-এ। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমন কি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াকড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বৃদ্ধাকর্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইহার কাছে কোনো ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ভ্রামণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনোই হইতে পারে না; অধেক জমিদারি আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমত, যে-সকল অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এইসব জমির উপস্থিত ভোগ করিয়া ক্ষীণ হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। একরূপ দানে দেশে কেবল আলশ্রয় প্রজন্ম দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ময় রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্বাপেক্ষা চারপাশ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যেক্রমে নিশ্চিন্তমনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপল্ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বাহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র লিখিলেন যে, কাজটা গহিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন যে, পূর্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানাপ্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যেই দানপ্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া গ্রাম্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচরকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার গ্রাম্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখবরাত করিতে গেলে কতুর হইতে হইবে, বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ময় রক্ষা করা দুক্ল হইয়া পড়িবে।

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাদিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে আমাদের সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপু, এ কয়েকটা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে ঠাচি।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা মামলা হাজামা কেসাদ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় একপ্রকার মনের মতো গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্বতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা বিবির পুত্র অছিষদ্বি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বের

একটা অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এই মুসলমান-সন্তান যে কী হিসাবে এতটা অমি নিজর ও স্বল্পকরে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্ত যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু আপনার সৌভাগ্যপর্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

বিপিন পুরাতন কর্মচারীদের কাছে আনিতে পারিলেন কর্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অমুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ অমুগ্রহের কোনো বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি অনাধা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অমুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের পূর্বকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপৰ্যাপ্ত দস্ত দেখিয়া বিপিনের মনে হইত ইহারা যেন তাঁহার দয়াদুর্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অহিমদিও উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয় পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অহিমদির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া বুঝাইল, অমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন যাহার অমুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অমুগ্রহের 'পরে নির্ভর করাই কর্তব্য, অমিদারের প্রার্থনামতো কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক।

অহিমদি কহিল, “মা, তুমি এ-সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।”

মকদ্দমায় অহিমদি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল, ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বস্বের অগ্ৰ সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারি কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বুঝা যেন তাহার সকল মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সন্নেহে বিপিনের সবাঞ্জে হাত বুলাইয়া কহিল, “তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভাল করুন। বাবা, অহিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো—সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষণ হইয়ো না বাপ।”

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্ভতাবশত বুড়ী তাঁহার সহিত ঘরকরা পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, “তুমি মেরেমাছুষ,



এ সমস্ত কথা বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।”

মিজা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয় কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকদ্দমা কোর্জদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আদালত-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ করিল। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রীজারি করিল। অছিমদির যথাসর্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সেদিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকা এবং কতক ডাঙায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যজবোর মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঠালের আমদানিই সব চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিনবাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই-তিনজন লাঠিহস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কোতূহলবশত তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন, এমন সময় অছিমদি কাটারি তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিপিনবাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাবু এই ঘটনার মনে মনে যে খুশি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদেরকে ধাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতি এবং বে-আদবি অসম্ভব। যাহা হউক, বেটা যেহেতু বদমায়েস সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপুরের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা। তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এদিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ যত্নের অপেক্ষাও অঙ্কুর হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহালাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল,—কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতভাস ভীত হৃদয়।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যকে দাঁড়াইতে হয় নাই—কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পালকি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিনবাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এজলাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড়ো ছদ্মক আদালতে অনেকদিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিনবাবুর কানে কানে কী একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলি, হাতে হরিনামের মালা, কৃষ্ণ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। ললাট হইতে একটি শাস্ত কক্ষণা বিধে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোকা এবং আঁট প্যান্টলুন লইয়া কষ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগড়িটি নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সেগুলি শব্দব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্তী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অস্বস্তি করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, “না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।”

বিপিনের অস্বস্তিগণ কোতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, “অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।”

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এইজন্যই আপনি কানী হইতে এতদূরে আসিয়াছেন? উহাদের পরে আপনার এত অধিক অস্বস্তি কেন।”

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, “সে-কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে বাপু।”

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, “অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পৰ্বস্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।”

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে ক্ষতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, “লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিও, অছিমদিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।”

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “যখনই গর্তে?”

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, “হাঁ বাপু।”

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, “সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।”

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, “না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্ম যাহা উচিত বোধ হয় করিও” বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্বক কম্পিতকণ্ঠস্বরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপল না থাকায় এই কল।

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন লীল ক্রিষ্ট শুক খেতওঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম ছই



পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চৌর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভাতা।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অহিমও অল্পদিনের মধ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সে-ও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে-কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই নানা কথা কানাকানি করিতে লাগিল।

শ্রদ্ধাবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মাহুষ করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। বাহা হউক কৃষ্ণগোপালের অগাধখ্যাত দয়াধর্মমহত্ব সমস্তই যে কাপটা ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা ছর্বোধ সমস্তার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্বল্প হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

অগ্রহায়ণ, ১৩০০

## খাতা

লিখিতে লিখিয়া অবশিষ্ট উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অঙ্করে কেবলই লিখিতেছে—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নিচে ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ ছিল, সেটা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেনসিল দিয়া লিখিয়াছে—কালো জল, লাল ফুল।

বাড়ির সর্বদাব্যবহার্য নুতন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খুব বড়ো বড়ো অঙ্করে একপ্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে—লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

এ প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যন্ত সে কোনোপ্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে একদিন একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শুনিলে তাহার আত্মীয়স্বজন কিংবা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখনো সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কখনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সঙ্গে তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রচলিত আছে, সেগুলি গোবিন্দলাল যুক্তির কোনো সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে বগুনপূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নির্জন বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল—গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ-পাঠকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেনসিল, আত্মোপাস্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদৃশ গুরুতর লাঞ্চার কারণ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিতহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অদ্বুতগুচিতে উমাকে তাহার লুপ্তিত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি লাইন-টানা ভালো বাধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।

উমার বয়স তখন সাত বৎসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাত্রিকালে উমার বালিশের নিচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সঙ্গে করিয়া যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিশ্বয়, কাহারও লোভ, কাহারও বা ঘেঁষ হইত।

প্রথম বৎসরে অতি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল—পাখি সব করে রব, রাতি

পোহাইল। শয়নগৃহের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উঠেক্ষণে শূর করিয়া পড়িত এবং জিহ্বিত। এমনি করিয়া অনেক গল্প পল্প সংগ্রহ হইল।

দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যো মধ্যো দুটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান—ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দুটা-একটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতার কথামালার ব্যাঘ্র ও বকের গল্পটা যেখানে কাপি করা আছে, তাহার নিচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিংবা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আর কোথাও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই—যশিকে আমি খুব ভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বসিয়াছি। যশি পাড়ার কোনো একাদশ কিংবা দ্বাদশবর্ষীয় বালক নহে। বাড়ির একটি পুরাতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দু-পাতা অন্তরে পূর্বোক্ত কথাটির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা-আধটা নয়, উমার রচনার পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা দোষ লক্ষিত হয়। একস্থলে দেখা গেল—হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিজ্ঞানবীরের সহপাঠিকা।) তার অনতিদূরেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধু তাহার আর জিভুবনে নাই।

তাহার পরবৎসরে বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন একদিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়া কিছুই শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য পাড়ার লোকেরা তাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি আড়ি পরিয়া ঘোমটার ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শব্দব্যাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, “বাছা, শান্তদীর কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্নার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিসনে।”

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, “দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াসনে; সে



তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম চালাসনে।”

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বুকিতে পারিল, সে যেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না। এবং তাহার কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, ক্রটি বলে, তাহা অনেক ভংসনার পর অনেকদিনে শিথিয়া লইতে হইবে।

সেদিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি এবং অলংকারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কম্পিত হৃদয়টুকুর মধ্যে কী হইতেছিল তাহা ভালো করিয়া বোঝে এমন একজনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

যশিও উমার সঙ্গে গেল। কিছুদিন থাকিয়া উমাকে শব্দরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমন কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ; তাহার অতিক্রমিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অক্লান্ত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বীকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আশ্বাদ।

শব্দরবাড়ি গিয়া প্রথম কিছুদিন সে কিছুই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছুদিন পরে যশি তাহার পূর্বস্থানে চলিয়া গেল।

সেদিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্বার ক্লক করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল—যশি বাড়ি চলে গেছে আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চাকপাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছু কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। সুতরাং আজকাল বালিকার সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। পূর্বোক্ত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে—দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।

শুনা যায়, উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বাড়ি আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার প্রতিবন্ধক হয়।

গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিজ্ঞপে জড়িত এমন

শুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবর্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার অকাটা সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমুখে সেই কথা শুনিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল—দাদা, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

একদিন উমা দ্বার বন্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার নন্দ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কোতূহল হইল—সে ভাবিল বউদিদি মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনোই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোটো কনকমঞ্জরী, সে-ও আসিয়া একবার উকি মারিয়া দেখিল।

তাহার ছোটো অনঙ্গমঞ্জরী, সে-ও পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া বহুকষ্টে ছিদ্রপথ দিয়া কঙ্কগৃহের রহস্য ভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কণ্ঠের খিলখিল হাসি শুনিতে পাইল। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া লজ্জায় ভয়ে বিছানার মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া

তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি শূন্যতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাচুর্য্য হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, স্মৃতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে বধেষ্ট ভৎসনা করিল এবং কিকিং উপহাসও করিল—বলিল, “শ্যামলা করমাশ দিতে হইবে, গিন্নী কানে কলম শুঁজিয়া আঙ্গিমে যাইবেন।”

উমা ভালো বুঝিতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবন্ধ সে কখনো পড়ে নাই এই জন্য তাহার এখনও ততদূর বসবোধ জন্মে নাই। কিন্তু সে মনে মনে একান্ত

সংকুচিত হইয়া গেল—মনে হইল পৃথিবী দ্বিধা হইলে তবে সে লক্ষ্য রক্ষা করিতে পারে।

বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু একদিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিনী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরৎকালের রোদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না; কিন্তু লিখিতে লিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শুনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার বেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল—

“পুরবাসী বলে উমার মা,  
তোরা হারা তারা এল ওই।  
শুনে পাগলিনীপ্রায়, অমনি রানী ধায়,  
কই উমা বলি কই।  
কৈদে রানী বলে, আমার উমা এলে,  
একবার আয় মা, একবার আয় মা,  
একবার আয় মা করি কোলে।  
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি  
অভিমাণে কাদি রানীরে বলে—  
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।”

অভিমাণে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে ডাকিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনঙ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, “বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।”

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, “লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিসনে ভাই, তোদের ছুটি পায়ে পড়ি ভাই—আমি আর করব না, আমি আর লিখব না।”

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটি বন্ধে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বল প্রয়োগ করিয়া সেটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কৃতকার্ষ না হইয়া অনঙ্গ দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমল্লস্বরে বলিল, “খাতা দাও।”  
আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরও দুই-এক সুর গলা নামাইয়া কহিল, “দাও।”

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অমুনয়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।  
যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে  
ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল ; শুনিয়া  
উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল ; এবং অপর তিনটি  
বালিকা-শ্রোতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই। প্যারীমোহনেরও স্মৃতিতত্ত্বকণ্টকিত  
বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানব-  
হিতৈষী কেহ ছিল না।

প্রবন্ধ

সঞ্চয়



শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল  
মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া  
তাঁহার প্রতি আমার হৃদয়ের  
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন  
করিলাম ।

# সঞ্চয়

## রোগীর নববর্ষ

আমার রোগশয্যার উপর নববৎসর আসিল। নববৎসরের এমন নবীন মূর্তি অনেক দিন দেখি নাই।

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড়ো জিনিসকে ঠিক বড়ো করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিসকে খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। মানুষের ইতিহাসে যত বড়ো মহৎ ঘটনাই ঘটুক না নিজের পেটের ক্ষুধাকে উপস্থিতমতো যদি একান্ত করিয়া না দেখা যায় তবে বীচাই শক্ত হয়। যে মজুর কোদাল হাতে মাটি খুঁড়িতেছে সে লোক মনেও ভাবে না যে সেই মুহূর্তেই রাজা-মহারাজার মন্ত্রণাসভায় রাজ্যসাম্রাজ্যের ব্যবস্থা লইয়া ভূমূল আন্দোলন চলিতেছে। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ যত বড়োই হ'ক, তবু মানুষের কাছে এক মুহূর্তের বর্তমান তাহার চেয়ে ছোটো নয়। এই জন্য এই সমস্ত ছোটো ছোটো নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারি এমন যুগ-যুগান্তরের ভার নহে ;—এই জন্য তাহার চোখের সামনে এই নিমেষের পর্দাটাই সকলের চেয়ে মোটা ;—যুগ-যুগান্তরের প্রসারের মধ্যে এই পর্দার স্থলতা ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। বিজ্ঞানে পড়া যায় পৃথিবীর গায়ের কাছের বাতাসের আচ্ছাদনটা যত ঘন, এমন তাহার দূরের আচ্ছাদন নহে,—পৃথিবীর নিচের টানে ও উপরের চাপে তাহার আবরণ এমন নিবিড় হইয়া উঠে। আমাদেরও তাই। যত আমাদের কাছের দিকে, ততই আমাদের নিজের টানে ও পরের চাপে আমাদের মনের উপরকার পর্দা অত্যন্ত বেশি নিরেট হইয়া দাঁড়ায়।

শান্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। নিজের দিকে যতই টান দিব নিজের উপরকার ঢাকাটাকে ততই ঘন করিয়া তুলিব। এই টান হালকা হইলে তবেই পর্দা ফাঁক হইয়া যায়।

দেখিতেছি কৃষ্ণ শরীরের দুর্বলতায় এই টানের গ্রন্থিটাকে খানিকটা আলগা করিয়া দিয়াছে। নিজের চারিদিকে যেন অনেকখানি ফাঁকা ঠেকিতেছে। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতে কাজ আছে আমি না হইলে তাহা সম্পন্ন হইবে না এই চিন্তায় নিজেকে একটুও অবসর দেওয়া ঘটে না, অবসরটাকে যেন

অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্তব্যের যে অস্ত নাই, জগৎসংসারের দাবির যে বিরাম নাই; এই জ্ঞান যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ সমস্ত মন কাজের দিকে ছটফট করিতে থাকে। এই টানাটানি যতই প্রবল হইয়া উঠে ততই নিজের অস্তরের ও বাহিরের মাঝখানে সেই স্বচ্ছ অবকাশটি ঘুচিয়া যায়—যাহা না থাকিলে সকল জিনিসকে যথা-পরিমাণে সত্য আকারে দেখা যায় না। বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশের উপরে আছে বলিয়াই, অর্থাৎ তাহা ধানিকটা করিয়া আছে ও অনেকটা করিয়া নাই বলিয়াই তাহার ছোটো বড়ো নানা আকৃতি আরতন লইয়া তাহাকে এমন বিচিত্র করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু জগৎ যদি আকাশে না থাকিয়া একেবারে আমাদের চোখের উপরে চাপিয়া থাকিত—তাহা হইলে ছোটোও যা বড়োও তা, বাঁকাও যেমন সোজাও তেমন।

তেমনি যখন শরীর সবল ছিল তখন অবকাশটাকে একেবারে নিঃশেষে বাদ দিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কেবল কাজ এবং কাজের চিন্তা; কেবল অস্তবিহীন দায়িত্বের নিবিড় ঠেসাঠেসির মাঝখানে চাপা পড়িয়া নিজেকে এবং জগৎকে স্পষ্ট করিয়া ও সত্য করিয়া দেখিবার স্মরণ যেন একেবারে হারাইয়াছিলাম। কর্তব্যপরতা যত মহৎ জিনিস হ'ক, সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি বড়ো হইয়া উঠিয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। সেটা একটা বিপরীত ব্যাপার। মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়ো।

এমন সময় শরীর যখন বাঁকিয়া বসিল, বলিল, আমি কোনোমতেই কাজ করিব না তখন দায়িত্বের বান্ধন কাটিয়া গেল। তখন টানাটানিতে ঢিল পড়িতেই কাজের নিবিড়তা আলাগা হইয়া আসিল—মনের চারিদিকের আকাশে আলো এবং হাওয়া বহিতে লাগিল। তখন দেখা গেল আমি কাজের মানুষ একখাটা যত সত্য, তাহার চেয়ে ঢের বড়ো সত্য আমি মানুষ। সেই বড়ো সত্যটির কাছেই জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া দেখা দেয়—বিশ্ববীণা সুন্দর হইয়া বাজে—সমস্ত রূপরসগন্ধ আমার কাছে স্বীকার করে যে “তোমারই মন পাইবার জ্ঞান আমরা বিশ্বের প্রাঙ্গণে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।”

আমার কর্মক্ষেত্রে আমি ক্ষুদ্র বলিয়া নিন্দা করিতে চাই না কিন্তু আমার রোগশয্যা আজ দিগন্তপ্রসারিত আকাশের নীলিমাকে অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আজ আমি আপিসের চৌকিতে আসীন নই, আমি বিরাটের কোড়ে শয়ান। সেইখানে সেই অপরিণীত অবকাশের মাঝখানে আজ আমার নববর্ষের অভ্যুদয় হইল—মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কী সুগভীর আমি যেন আজ তাহার আশ্বাদন পাইলাম। আজ নববর্ষ অতলস্পর্শ মৃত্যুর স্নানীল শীতল সুবিপুল অবকাশপূর্ণ শুকতার মাঝখানে জীবনের পদ্মাটিকে যেন বিকশিত করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

তাই তো আজ বসন্তশেষের সমস্ত ফুলগন্ধ একেবারে আমার মনের উপরে আসিয়া এমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই তো আমার খোলা জানালা পার হইয়া বিশ্ব-আকাশের অতিথিরা এমন অসংকোচে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আলো যে ওই অস্তরীক্ষে কী সুন্দর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর পৃথিবী ওই তার পারের নীচে আঁচল বিছাইয়া কী নিবিড় হর্ষে পুলকিত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা যেন এত কাল দেখি নাই। এই আজ আমি যাহা দেখিতেছি এ যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি : যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তক পূর্ণতা, তাহারই উপরে দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুরনিকণ, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।

আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজার লক্ষ লক্ষ চন্দ্রশূর্য গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন ঘাত-প্রতিঘাত উচ্চকলরবে উতলা হইয়া কিরিতেছে—কিন্তু সেও তো ওই বাহিরের প্রাঙ্গণে। আমি দেখিতেছি ওই যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের পর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেষ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আরু চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাবি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল—ভিতর বাড়িতে একি দেখা যায় ! সেখানে আলোয় তো চোখ ঠিকরিয়া পড়ে না, সেখানে সৈন্তসামন্তে ধর ভুড়িয়া তো দাঁড়ায় নাই ! সেখানে মণি নাই মানিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে তো মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধূলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে, তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজআস্তরণ তো কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবকযুবতীরা মালা বদল করিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়াছে কিন্তু রাজোত্তানের মালী আসিয়া তো কিছুমাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। বৃদ্ধ সেখানে কর্মশালার বহু কালিমাচিহ্নিত অনেক দিনের জীর্ণ কাপড়খানা ছাড়িয়া কেলিয়া পট্টবসন পরিতেছে, কোথাও তো কোনো নিষেধ দেখি না। ইহাই আশ্চর্য যে এত ঐশ্বর্য এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন ! ইহাই আশ্চর্য, পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য যে এমন অভেদ রহস্যময় জ্যোতির্ময় স্রোতলোকাস্করের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোটো নয়, সামান্ত নয়, অসংগত নয়—সে জন্ম কেহ তাহাকে একটুও গণ্য দিতেছে না। সবাই বলিতেছে তোমার ওইটুকু খেলা, ওইটুকু হাসিকান্নার জন্তই এত আয়োজন—ইহার যতটুকুই তুমি গ্রহণ করিতে পার ততটুকুই সে তোমারই ;—যতদূর পৰ্যন্ত তুমি দেখিতেছ সে তোমারই চাই চক্ষুর ধন,—যতদূর পৰ্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে



তোমারই মনের সম্পত্তি। তাই এত বড়ো জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না—ইহার অস্ত্রবিহীন ভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরও ভিতরে যাও—সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য। সেইখানেই ধরা পড়ে, কোটার মধ্যে কোটা, তাহার মাঝখানে যে রত্নটি সেই তো প্রেম। কোটার বোঝা বহিতে পারি না কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমনি যে, তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বুকের কাছে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বড়ো নিভূতে ওই একটি প্রেম আছে—চারিদিকে সূর্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার মাঝখানকার শুকতার মধ্যে ওই প্রেম; চারিদিকে সপ্তলোকের ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহারই মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ওই প্রেম। ওই প্রেমের মূল্যে ছোটোও যে সে বড়ো, ওই প্রেমের টানে বড়োও যে সে ছোটো। ওই প্রেমই তো ছোটোর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়োর সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ওই প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারই ভাষাতে গান করিতেছে—সেখানে একি কাণ্ড! সেখানে নির্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উন্মুখ গুচ্ছ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিঃশব্দচরণে দূত আসিল! এও কি বিশ্বাস করিতে পারি! ইহা সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত। সেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করিল। সেই তো এতবড়ো জগতের মাঝখানেও এত ছোটোকে বড়ো করিয়া তুলিল। বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না, সে যে আপনারই আনন্দে ছোটোকে গৌরব দান করিতে পারে।

এই জগ্গই তো ছোটোকে তাহার এতই দরকার। নইলে সে আপনার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কী করিয়া? ছোটোর কাছে সে আপনার অসীম বৃহত্ত্বকে বিকাইয়া দিয়াছে; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়, ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সেই জগ্গই এমন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাবিচিত্র আকাশের নীচে, এই পুষ্পবিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্র-বেলায় ছোটোর কাছে বড়ো আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোটো হইয়াও ছোটো নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার; প্রত্যেক ভিলপরিমাণ দেশকে ও পলপরিমাণ কালকে অসীমত্বে উদ্ভাসিত করা তাহার স্বভাব;—আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমি টুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় স্বেদঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা।

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে শূন্য, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্ত আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ সেই সংসার ভো। আছেই—কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিন-মজুরি লইতে হইবে? সেই খানেই কি চরম দেনাপাওনা? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিল ভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে কলাকলের তর্ক নাই, বেতন নাই কেবল আনন্দ আছে; কর্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়—সেখানে একবার ঘাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া, হাসিমুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেবলই আপনাকে আপনি জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই—অমৃতহস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন—হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ হইয়া সেইখানে চল—আজ নববর্ষের পাখি সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অঘাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্ত প্রতিবৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিল না বলিয়া সেই কথাটি আজ শুদ্ধ হইয়া শুনিবার সময় পাইলাম—আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণ-পত্রটিকে প্রণাম করিয়া মাথায় করিয়া গ্রহণ করি।

১৩১২

## রূপ ও অরূপ

জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়্যা বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল ভবজ্ঞান বলে না আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু পরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহারকালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও আলোর মতো ছিন্নবিগ্নিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিন্ন বলিয়াই জানি। স্ফটিক জিনিসটা যে কঠিন জিনিস তাহা দুর্বোধ্যন একদিন ঠেকিয়া শিথিয়াছিলেন অথচ আলোকের কাছে যেন সে জিনিসটা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এদিকে যে মহাপ্রবল আকর্ষণ সূর্য হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে সূর্যে



প্রসারিত, যাহা লক্ষ কোটি হাতির বলকে পরাস্ত করে আমরা তাহার ভিতর দিয়া চলিতেছি কিন্তু মাকড়সার আলটুকুর মতোও তাহা আমাদের গায়ে ঠেকিতেছে না। আমাদের সম্মুখে যেটা আছে এবং যেটা নাই অস্তিত্বরাজ্যে সমস্ত ভাইয়ের মতো তাহারা হয়তো উভয়েই পরমাত্মীয় ; তাহাদের মাঝখানে হয়তো একেবারেই ভেদ নাই। বস্তুমাত্রই একদিক থেকে দেখিতে গেলে বাষ্প—সেই বাষ্প ঘন হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে দৃঢ় আকারে বদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখি কিন্তু উত্তাপের তাড়ায় তাহা আলাগা হইয়া গেলেই মরীচিকার মতো তাহা ক্রমশই দৃষ্টির অগোচর হইবার উপক্রম করিতে থাকে। বস্তুত হিমালয় পর্বতের উপরকার মেঘের সহিত হিমালয়ের প্রভেদকে আমরা গুরুতর বলি বটে কিন্তু সেই গুরুতরত্ব ভাবিয়া দেখিলেই লঘু হইয়া পড়ে। মেঘ যেমন অদৃশ্য বাষ্পের চেয়ে নিবিড়তর, হিমালয়ও সেইরূপ মেঘের চেয়ে নিবিড়তর।

তার পর কালের ভিতর দিয়া দেখো সমস্ত জিনিসই প্রবহমান। তাই আমাদের দেশে বিশ্বকে জগৎ বলে—সংসার বলে ; তাহা মুহূর্তকাল স্থির নাই, তাহা কেবলই চলিতেছে, সরিতেছে।

যাহা কেবলই চলে, সরে, তাহার রূপ দেখি কী করিয়া? রূপের মধ্যে তো একটা স্থিরত্ব আছে। যাহা চলিতেছে, তাহাকে, যেন চলিতেছে না, এমন ভাবে না দেখিলে আমরা দেখিতেই পাই না। লাটিম যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে তখন আমরা তাহাকে স্থির দেখি। মাটি ভেদ করিয়া যে অঙ্কুরটি বাহির হইয়াছে প্রতি নিমেষেই তাহার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়াই তাহার পরিণতি ঘটে। কিন্তু যখন তাহার দিকে তাকাই সে কিছু মাত্র ব্যস্ততা দেখায় না ; যেন অনন্তকাল সে এই রকম অঙ্কুর হইয়াই থুপি থাকিবে, যেন তাহার বাড়িয়া উঠিবার কোনো মতলবই নাই। আমরা তাহাকে পরিবর্তনের ভাবে দেখি না, স্থিতির ভাবেই দেখি।

এই পৃথিবীকে আমরা ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ইহাকে ক্রব বলিয়া বর্ণনা করিতেছি—ধরনী আমাদের কাছে ধৈর্যের প্রতিমা। কিন্তু বৃহৎকালের মধ্যে ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার ক্রবরূপ আর দেখি না তখন ইহার বহুরূপী মূর্তি ক্রমেই ব্যাপ্ত হইতে হইতে এমন হইয়া আসে যে, আমাদের ধারণার অগোচর হইয়া যায়। আমরা বীজকে ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বীজরূপে দেখিতেছি কিন্তু বৃহৎকালে তাহাকে দেখিতে গেলে তাহা গাছ হইয়া অরণ্য-পরম্পরার মধ্য দিয়া নানা বিচিত্ররূপে ধাবিত হইয়া পাখুরে কয়লার ধনি হইয়া আগুনে পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া ছাই হইয়া ক্রমে যে কী হইয়া যায় তাহার আর উদ্দেশ পাওয়াই শক্ত।

আমরা ক্ষণকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত

তাহার সে রূপ নাই কেননা সত্যই তাহা বন্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার অল্প জানিবার অল্প তাহাকে স্থির করিয়া স্বত্ত্ব করিয়া তাহাকে যে নাম দিতেছি সে নাম তাহার চিরকালের সত্য নাম নহে। এই অল্পই আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে যাহা বলা হইয়াছে। নাম ও রূপ যে শাস্ত্র নহে একথা আমাদের দেশের চাষাও বলিয়া থাকে।

কিন্তু গভীকে এই যে স্থিতির মধ্য দিয়া আমরা জানি এই স্থিতির তত্ত্বটা তো আমাদের নিজের গড়া নহে। আমাদের গড়িবার ক্ষমতা কিসের? অতএব, গতিই সত্য, স্থিতি সত্য নহে, একথা বলিলে চলিবে কেন? বস্তুত সত্যকেই আমরা ঐ বলায় থাকি, নিত্য বলিয়া থাকি। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধুতিস্থিত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নহিলে সেই জানার বালাইমাত্র থাকিত না—যাহাকে যাহা বলিতেছি তাহাকে যাহাই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন—

“এতন্ত বা অকরন্ত প্রশাসনে গার্গি নিমেষ মুহূর্তা অহোরাত্রা অর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধুতাস্তিষ্ঠতি।”

সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্রা অর্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধুত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত নিমেষ মুহূর্তগুলিকে আমরা একদিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর একদিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতাস্থিত্রে বিধুত হইয়া আছে। এই অল্পই কাল বিশ্বচরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা অগত্বে চক্রমকি ঠোকা ক্ষুণ্ণজপরম্পরার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আত্মস্থ যোগযুক্ত শিখার মতো প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্তকালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্তকে অন্য মুহূর্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।

যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই অল্প সকল প্রকারের মধ্যেই ছুই দিক আছে। তাহা একদিকে বন্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর একদিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। একদিকে তাহা হইয়াছে আর একদিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলই চলিতেছে। এই অল্পই অগৎ অগৎ, সংসার সংসার। এই অল্প

কোনো বিশেষরূপ আপনাকে চরমভাবে বন্ধ করে না—যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।

তাই যাহারা অনন্তের সাধনা করেন, যাহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদিগকে বারবার একথা চিন্তা করিতে হয়, চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি ইহাই চরম নহে, স্বতন্ত্র নহে, কোনো মুহূর্তেই ইহা আপনাকে আপনি পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছে না। যদি তাহা করিত তবে ইহারা প্রত্যেকে স্বয়ং স্বপ্রকাশ হইয়া স্থির হইয়া থাকিত। ইহারা অস্বহীন গতি দ্বারা যে অস্বহীন স্থিতিকে নির্দেশ করিতেছে সেইখানেই আমাদের চিত্তের চরম আশ্রয় চরম আনন্দ।

অতএব আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ঋব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোনো বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই সমস্ত নাম রূপের আবরণ চিরন্তন হইত। যদি ইহারা অবিজ্ঞান প্রবহমান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত তবে ইহারা ছাড়া আর কিছুর জন্ম কোনো চিন্তাও মানুষের মনে মুহূর্তকালের জন্ম স্থান পাইত না। তবে ইহাদিগকেই সত্য জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতাম—তবে বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই সমস্ত অচল প্রত্যক্ষ সত্যের ভীষণ শৃঙ্খলে বাধা পড়িয়া একেবারে মূক হইয়া মুর্ছিত হইয়া থাকিত। ইহার পিছনে কিছুই দেখিতে পাইত না। কিন্তু সমস্ত বস্তু রস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অধঃ সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনো মতে উজান পথে চলিতে পারে না।

এই তো আধ্যাত্মিক সাধনা। শিল্প-সাহিত্যের সাধনাটা কী? এই সাধনার মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।

সৌন্দর্যের মধ্যে আনন্দ আপনাকেই বাহিরে দেখিতে পায় - সেইজন্যই সৌন্দর্যের গৌরব। মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়—শিল্পীর শিল্পে কবির কাব্যে মানুষের সেইজন্যই এত অহুরাগ। শিল্পে সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত আপনাকে না দেখিত তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।



এই জগৎই শিল্প-সাহিত্যে ভাবব্যঞ্জনার (suggestiveness) এত আদর। এই ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা রূপ আপনার একান্ত ব্যক্ততা যথাসম্ভব পরিহার করে বলিয়াই অব্যক্তের অভিমুখে আপনাকে বিলীন করে বলিয়াই মানুষের হৃদয় তাহার দ্বারা প্রতিহৃত হয় না। রাজহোজ্ঞানের সিংহদ্বারটা কেমন? তাহা যতই অদ্ভুতদী হ'ক, তাহার কারুনিপুণ্য যতই থাক, তবু সে বলে না আমাতে আসিয়াই সমস্ত পথ শেষ হইল। আসল গন্তব্য স্থানটি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়াই আছে এই কথাই তাহার জানাইবার কথা। এই জগৎ সেই তোরণ কঠিন পাথর দিয়া যত দৃঢ় করিয়াই তৈরি হউক না কেন, সে আপনার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া দেয়। বস্তুত সেই ফাঁকটাকেই প্রকাশ করিবার জগৎ সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যতটা আছে তাহার চেয়ে নাই অনেক বেশি। তাহার সেই “নাই” অংশটাকে যদি সে একেবারে ভরাট করিয়া দেয় তবে সিংহোজ্ঞানের পথ একেবারেই বন্ধ। তবে তাহার মতো নিষ্ঠুর বাধা আর নাই। তবে সে দেয়াল হইয়া উঠে এবং যাহারা মৃত তাহারা মনে করে এইটেই দেখিবার জিনিস, ইহার পশ্চাতে আর কিছুই নাই; এবং যাহারা সন্ধান জানে তাহারা ইহাকে অতি সূক্ষ্ম একটা মূর্তিমান বাহুল্য জানিয়া অন্তর পথ খুঁজিতে বাহির হয়। রূপমাত্রই এইরূপ সিংহদ্বার। সে আপনার ফাঁকটা লইয়াই গৌরব করিতে পারে। সে আপনাকেই নির্দেশ করিলে বন্ধন করে, পথ নির্দেশ করিলেই সত্য কথা বলে। সে ভূমাকে দেখাইবে, আনন্দকে প্রকাশ করিবে, কী শিল্প সাহিত্যে কী জগৎ-সৃষ্টিতে এই তাহার একমাত্র কাজ। কিন্তু সে প্রায় মাঝে মাঝে ছুরাকাজ্জাগ্রস্ত দাসের মতো আপনার প্রভুর সিংহাসনে চড়িয়া বসিবার আয়োজন করে। তখন তাহার সেই স্পর্ধায় আমরা যদি যোগ দিই তবে বিপদ ঘটে—তখন তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলাই তাহার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য—তা সে যতই প্রিয় হ'ক, এমন কি, সে যদি আমার নিজেরই অহংরূপটা হয় তবুও। বস্তুত রূপ খাড়া তাহাকে তাহার চেয়ে বড়ো করিয়া জানিলেই সেই বড়োকে হারানো হয়।

মানুষের সাহিত্য শিল্পকলার হৃদয়ের ভাব রূপে ধরা দেয় বটে কিন্তু রূপে বন্ধ হয় না। এই জগৎ সে কেবলই নব নব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই প্রতিভাকে বলে “নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি।” প্রতিভা রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করে কিন্তু বন্দী করে না—এই জগৎ নব নব উন্মেষের শক্তি তাহার থাকা চাই।

মনে করা যাক পূর্ণিমা রাত্রির গুপ্ত সৌন্দর্য দেখিয়া কোনো কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, সুরলোকে নীলকান্তমণিময় প্রাঙ্গণে সুরাঙ্গনারা নরকনের নবমল্লিকায় ফুলশয্যা রচনা করিতেছেন। এই বর্ণনা যখন আমরা পড়ি তখন আমরা জানি পূর্ণিমা রাত্রিসম্বন্ধে

এই কথাটা একেবারে শেষ কথা নহে—অসংখ্য ব্যক্ত ও অব্যক্ত কথার মধ্যে এ একটা কথা ;—এই উপমাটিকে গ্রহণ করার দ্বারা অন্ত অগণ্য উপমার পথ বন্ধ করা হয় না, বরঞ্চ পথকে প্রশস্তই করা হয়।

কিন্তু যদি আলংকারিক বলপূর্বক নিয়ম করিয়া দেন যে, পূর্ণিমা রাত্রি সম্বন্ধে সমস্ত মানবসাহিত্যে এই একটিমাত্র উপমা ছাড়া আর কোনো উপমাই হইতে পারে না—যদি কেহ বলে, কোনো দেবতা রাত্রে স্বপ্ন দিয়াছেন যে এই রূপই পূর্ণিমার সত্য রূপ—এই রূপকেই কেবল ধ্যান করিতে হইবে, প্রকাশ করিতে হইবে, কাব্যে পুরাণে এই রূপেরই আলোচনা করিতে হইবে, তবে পূর্ণিমা সম্বন্ধে সাহিত্যের দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। তবে আমরাগকে স্বীকার করিতে হইবে একরূপ চরম উপমার দৌরাণ্ড্য একেবারে অসম্ভব—কারণ ইহা মিথ্যা। যতক্ষণ ইহা চরম ছিল না ততক্ষণই ইহা সত্য ছিল। বস্তুত এই কথাটাই সত্য যে পূর্ণিমা সম্বন্ধে নিত্য নব নব রূপে মানুষের আনন্দ আপনাকেই প্রকাশ করে। কোনো বিশেষ একটিমাত্র রূপই যদি সত্য হয় তবে সেই আনন্দই মিথ্যা হইয়া যায়। জগৎ-সৃষ্টিতেও যেমন সৃষ্টিকর্তার আনন্দ কোনো একটিমাত্র রূপে আপনাকে চিরকাল বন্ধ করিয়া শেষ করিয়া ফেলে নাই,—অনাদিকাল হইতে তাহার নব নব বিকাশ চলিয়া আসিতেছে, তেমনি সাহিত্যশিল্প সৃষ্টিতেও মানুষের আনন্দ কোনো একটিমাত্র উপমায় বর্ণনায় আপনাকে চিরকালের মতো বন্দী করিয়া ধামিয়া যায় নাই, সে কেবলই নব নব প্রকাশের মধ্যে লীলা করিতেছে। কারণ, রূপ জিনিসটা কোনো কালে বলিতে পারিবে না যে, আমি এইখানেই ধামিয়া দাঁড়াইলাম, আমিই শেষ—সে যদি চলিতে না পারে তবে তাহাকে বিকৃত হইয়া মরিতে হইবে। বাতি যেমন ছাই হইতে হইতে শিখাকে প্রকাশ করে, রূপ তেমনি কেবলই আপনাকে লোপ করিতে করিতে একটি শক্তিকে আনন্দকে প্রকাশ করিতে থাকে। বাতি যদি নিজে অন্ধ হইতে চায় তবে শিখাকেই গোপন করে—রূপ যদি আপনাকেই ধ্রুব করিতে চায় তবে সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। এইজন্ত রূপের অনিত্যতাই রূপের সার্বকতা, তাহাই তাহার গৌরব। রূপ নিত্য হইবার চেষ্টা করিলেই ভয়ংকর উৎপাত হইয়া ওঠে। পুরের অমৃত অম্লর পান করিলে স্বর্গলোকের বিপদ তখন বিধাতার হাতে তাহার অপঘাত মূর্ত্যু বটে। পৃথিবীতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজে সাহিত্যে শিল্পে সকল বিষয়েই আমরা ইহার প্রমাণ পাই। মানুষের ইতিহাসে যত কিছু ভীষণ বিপদ ঘটিয়াছে তাহার মূলেই রূপের এই অসাধু চেষ্টা আছে। রূপ যখনই একান্ত হইয়া উঠিতে চায় তখনই তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার অত্যাচার হইতে মনুষ্যত্বকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমাপূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্তিকে উপাসক কখনোই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি দেবমূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা কল্পনাকে তখনই কল্পনা বলিয়া জানি যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না; তখনই কল্পনা আপনার সত্য কাজ করে। সে কাজটি কী, না, সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করা। কল্পনা যখন ধামিয়া গিয়া কেবলমাত্র একটি রূপের মধ্যে একান্তভাবে দেহধারণ করে তখন সে আপনার সেই রূপকেই দেখায়, রূপের অতীতকে অনন্ত সত্যকে আর দেখায় না। সেইজন্য বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চির-পরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্তিমান দেখিতে পাই। জগতের রূপ কারাগ্রাচীরের মতো অটল অচল হইয়া আমাদের দৃষ্টিতে বিরিয়া থাকিলে কখনোই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যখনই আমরা বিশেষ দেবমূর্তিকে পূজা করি তখনই সেই রূপের প্রতি আমরা চরমসত্যতা আরোপ করি। রূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল ধর্মকে লোপ করিয়া দিই রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার দ্বারা কখনোই সত্যের পূজা হইতে পারে না।

তবে কেন কোনো কোনো বিদেশী ভাবকের মুখে আমরা প্রতিমা-পূজার সম্বন্ধে ভাবের কথা শুনিতে পাই? তাহার কারণ তাঁহারা ভাবক, তাঁহারা পূজক নহেন। তাঁহারা যতক্ষণ ভাবকের দৃষ্টিতে কোনো মূর্তিকে দেখিতেছেন ততক্ষণ তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন না। একজন খ্রীষ্টানও তাঁহার কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করিতে পারেন; কারণ সরস্বতী তাঁহার কাছে ভাবের প্রকাশমাত্র - গ্রীসের এথেনীও তাঁহার কাছে যেমন, সরস্বতীও তেমনি। কিন্তু সরস্বতীর দ্বারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।

এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য



অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা “সিংহ মারের বাহন”। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিক্রম করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বন্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শক্তি।

যাহা স্বভাবতই প্রবাহমান তাহাকে কোনো একটা জায়গায় বন্ধ করিবামাত্র তাহা যে মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আচার জিনিসটা অনেক স্থলেই সেই বন্ধন-আকার ধারণ করে। তাহার সময় উত্তীর্ণ হইলেও অভ্যাসের আসক্তিবশত আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাই না। যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য চলা এবং চালানো, এক সময়ে তাহাকেই আমরা খোঁটার মতো ব্যবহার করি, অথচ মনে করি যেন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে।

একটা উদাহরণ দিই। জগতে বৈষম্য আছে। বস্তুত বৈষম্য সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। কিন্তু সেই বৈষম্য ধ্রুব নহে। পৃথিবীতে ধনমান বিজ্ঞানমতা একজায়গায় স্থির নাই, তাহা আবর্তিত হইতেছে। আজ যে ছোটো কাল সে বড়ো, আজ যে ধনী কাল সে দরিদ্র। বৈষম্যের এই চলাচল আছে বলিয়াই মানবসমাজে স্বাস্থ্য আছে। কেননা বৈষম্য না থাকিলে গতিই থাকে না—উঁচু-নিচু না থাকিলে নদী চলে না, বাতাসে তাপের পার্থক্য না থাকিলে বাতাস বহে না। যাহা চলে না এবং যাহা সচল পদার্থের সঙ্গে যোগ রাখে না তাহা দূষিত হইতে থাকে। অতএব, মানবসমাজে উচ্চ নীচ আছেই, থাকিবেই এবং থাকিলেই ভালো, একথা মানিতে হইবে।

কিন্তু এই বৈষম্যের চলাচলকে যদি বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া ফেলি, যদি একশ্রেণীর লোককে পুরুষানুক্রমে মাথায় করিয়া রাখিব এবং আর এক শ্রেণীকে পায়ের তলায় ফেলিব এই বাঁধা নিয়ম একেবারে পাকা করিয়া দিই তবে বৈষম্যের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যই একেবারে মাটি করিয়া ফেলি। যে বৈষম্য চাকার মতো আবর্তিত হয় না, সে বৈষম্য নিদারুণ ভাবে মানুষকে চাপিয়া রাখে, তাহা মানুষকে অগ্রসর করে না। জগতে বৈষম্য ততক্ষণ সত্য যতক্ষণ তাহা চলে, যতক্ষণ তাহা মুক্ত—জগতে লক্ষী যতক্ষণ চঞ্চলা ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িনী। লক্ষীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষী হইয়া উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারা লক্ষী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন। দুঃখী চিরদিন দুঃখী নয়, সুখী চিরদিন সুখী নয়—এইখানেই সুখীতে দুঃখীতে সাম্য আছে। সুখ দুঃখের এই চলাচল আছে বলিয়াই সুখ দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের মজল ঘটে।

তাই বলিতেছি, সত্যকে, সূন্দরকে, মঙ্গলকে, যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বহুরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান এবং তাহা বহু। এই সত্যসূন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখনই আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বক্ত করিতে চাই তখনই তাহা সত্যসূন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি আনয়ন করে। রূপমাত্রের মধ্যেই যে একটি মাত্রা আছে, অর্থাৎ যে চঞ্চলতা অনিত্যতা আছে, যে অনিত্যতাই সেই রূপকে সত্য ও সৌন্দর্য দান করে, যে অনিত্যতাই তাহার প্রাণ, সেই কল্যাণময়ী অনিত্যতাকে কী সংসারে, কী ধর্মসমাজে, কী শিল্পসাহিত্যে, প্রধায় পিঞ্জরে অচল করিয়া বাধিতে গেলে আমরা কেবল বক্তনকেই লাভ করি, গতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলি। এই গতিকে যদি হারাই তবে শিকলে বাধা পাবি যেমন আকাশকে হারায় তেমনি আমরা অনন্তের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হই সূতরাং সত্যের চিরমুক্ত পথ বন্ধ হইয়া যায় এবং চারিদিক হইতে নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রমাদ আমাদিগকে মায়াবী নিশাচরের মতো আক্রমণ করিতে থাকে। শুদ্ধ হইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া আমাদিগকে তাহা সহ করিতে হয়।

১৩১৮

## নামকরণ

এই আনন্দরূপিণী কন্যাটি একদিন কোথা হইতে তাহার মায়ের কোলে আসিয়া চক্ষু মেলিল। তখন তাহার গায়ে কাপড় ছিল না, দেহে বল ছিল না, মুখে কথা ছিল না, কিন্তু সে পৃথিবীতে পা দিয়াই এক মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আপনার প্রবল দাবি জানাইয়া দিল। সে বলিল আমার এই জল, আমার এই মাটি, আমার এই চন্দ্র সূর্য গ্রহভারকা। এত বড়ো জগৎচরাচরের মধ্যে এই অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটি নূতন আসিয়াছে বলিয়া কোনো দ্বিধা সংকোচ সে দেখাইল না। এখানে যেন তাহার চির কালের অধিকার আছে, যেন চিরকালের পরিচয়।

বড়লোকের কাছ হইতে ভালোরকমের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে নূতন জায়গার রাজপ্রাসাদে আদর অভ্যর্থনা পাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই মেয়েটিও যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে আসিল উহার ছোটো মুঠির মধ্যে একখানি অদৃষ্ট

১৮৩৩ খ্রিঃ ৩রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্ঠ্য নামকরণ উপলক্ষ্যে কথিত বক্তৃতার সারসর্ম্ম।

পরিচয়পত্র ছিল। সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তিনিই নিজের নামসইকরা একখানি চিঠি ইহার হাতে দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল, এই লোকটি আমার নিতান্ত পরিচিত, তোমরা যদি ইহাকে যত্ন কর তবে আমি খুশি হইব।

তাহার পরে কাহার সাধ্য ইহার দ্বার রোধ করে। সমস্ত পৃথিবী তখনই বলিয়া উঠিল, এস, এস, আমি তোমাকে বুকে করিয়া রাখিব—দূর আকাশের তারাগুলি পৰ্বন্ত ইহাকে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল—বলিল, তুমি আমাদেরই একজন। বসন্তের ফুল বলিল, আমি তোমার জন্ম ফলের আয়োজন করিতেছি; বর্ষার মেঘ বলিল, তোমার জন্ম অভিষেকের জল নির্মল করিয়া রাখিলাম।

এমনি করিয়া জন্মের আরম্ভেই প্রকৃতির বিশ্বদরবারের দরজা খুলিয়া গেল। মা বাপের যে স্নেহ সেও প্রকৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। শিশুর কান্না যেমনি আপনাকে ঘোষণা করিল অমনি সেই মুহূর্তেই জলস্থল আকাশ সেই মুহূর্তেই মা বাপের প্রাণ সাড়া দিল, তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না।

কিন্তু আরও একটি জন্ম ইহার বাকি আছে, এবার ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে জন্ম লইতে হইবে। নামকরণের দিনই সেই জন্মের দিন। একদিন রূপের দেহ ধরিয়া এই কন্যা প্রকৃতির ক্ষেত্রে আসিয়াছিল, আজ নামের দেহ ধরিয়া এই কন্যা সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিল। জন্মমাত্রে পিতামাতা এই শিশুকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এ যদি কেবলই ইহার পিতামাতারই হইত তবে ইহার আর নামের দরকার হইত না, তবে ইহাকে নিত্য নূতন নূতন নামে ডাকিলেও কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটি নাকি শুধু পিতামাতার নহে, এ নাকি সমস্ত মানবসমাজের, সমস্ত মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্মের বিপুল ভাণ্ডার নাকি ইহার জন্ম প্রস্তুত আছে, সেইজন্য মানবসমাজ ইহাকে একটি নামদেহ দিয়া আপনার করিয়া লইতে চায়।

মানুষের যে শ্রেষ্ঠরূপ যে মঙ্গলরূপ তাহা এই নামদেহটির দ্বারাই আপনাকে চিহ্নিত করে। এই নামকরণের মধ্যে সমস্ত মানবসমাজের একটি আশা আছে, একটি আশীর্বাদ আছে—এই নামটি যেন নষ্ট না হয় গ্লান না হয়, এই নামটি যেন ধন্য হয়, এই নামটি যেন মাধুর্য ও পবিত্রতার মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা লাভ করে। যখন ইহার রূপের দেহটি একদিন বিদায় লইবে তখনও ইহার নামের দেহটি মানবসমাজের মর্ম-স্থানটিতে যেন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে।

আমরা সকলে মিলিয়া এই কন্যাটির নাম দিয়াছি, অমিতা। অমিতা বলিতে বুঝায় এই যে, যাহার সীমা নাই। এই নামটি তো বার্থ নহে। আমরা যেখানে মানুষের সীমা দেখিতেছি সেইখানেই তো তাহার সীমা নাই। এই যে কলভামিনী কন্যাটি



জানে না যে আজ আমরা ইহাকে লইয়াই আনন্দ করিতেছি, জানে না বাহিরে কী ঘটতেছে, জানে না ইহার নিজের মধ্যে কী আছে—এই অপরিষ্কৃতাভার মধ্যেই তো ইহার সীমা নহে। এই কল্যাণটি যখন একদিন রমণীরূপে বিকসিত হইয়া উঠিবে তখনই কি এ আপনার চরমকে লাভ করিবে? তখনও এই মেয়েটি নিজেকে বাহা বলিয়া জানিবে এ কি তাহার চেয়েও অনেক বড়ো নহে! মানুষের মধ্যে এই যে একটি অপরিমেয়তা আছে বাহা তাহার সীমাকে কেবলই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাই কি তাহার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? মানুষ যেদিন নিজের মধ্যে আপনার এই সত্য পরিচয়টি জানিতে পারে সেই দিনই সে ক্ষুদ্রতার জাল ছেদন করিবার শক্তি পায়, সেই দিনই সে উপস্থিত স্বার্থকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে না, সেই দিনই সে চিরন্তন মঙ্গলকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়। যে মহাপুরুষেরা মানুষকে সত্য করিয়া চিনিয়াছেন তাঁহারা তো আমাদের মর্ত্য বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আমাদের ডাক দিয়া বলেন, তোমরা “অমৃতন্ত পূজাঃ।”

আমরা অমিতা নামে সেই অমৃতের পূজাকেই আমাদের সমাজে আহ্বান করিলাম। এই নামটি ইহাকে আপন মানবজন্মের মহত্ব চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিক আমরা ইহাকে এই আশীর্বাদ করি।

আমাদের দেশে নামকরণের সঙ্গে আর একটি কাজ আছে সেটি অন্নপ্রাশন। ছুটির মধ্যে গভীর একটি যোগ রহিয়াছে। শিশু যে দিন একমাত্র মায়ের কোল অধিকার করিয়া ছিল সেদিন তাহার অন্ন ছিল মাতৃসুত্ত। সে অন্ন কাহাকেও প্রস্তুত করিতে হয় নাই—সে একেবারে তাহার একলার জিনিস, তাহাতে আর কাহারও অংশ ছিল না। আজ সে নাম দেহ ধরিয়া মানুষের সমাজে আসিল তাই আজ তাহার মুখে মানবসাধারণের অন্নকণাটি উঠিল। সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের পাতে পাতে যে অন্নের পরিবেষণ চলিতেছে তাহারই প্রথম অংশ এই কল্যাণটি আজ লাভ করিল। এই অন্ন সমস্ত সমাজে মিলিয়া প্রস্তুত করিয়াছে—কোন দেশে কোন চাষা রৌদ্রবৃষ্টি মাধায় করিয়া চাষ করিয়াছে, কোন বাহক ইহা বহন করিয়াছে, কোন মহাজন ইহাকে হাতে আনিয়াছে, কোন ক্রেতা ইহা ক্রয় করিয়াছে, কোন পাচক ইহা রন্ধন করিয়াছে, তবে এই কল্যাণ মুখে ইহা উঠিল। এই মেয়েটি আজ মানবসমাজে প্রথম আতিথ্য লইতে আসিয়াছে, এই জন্ত সমাজ আপনার অন্ন ইহার মুখে তুলিয়া দিয়া অতিথিসংকার করিল। এই অন্নটি ইহার মুখে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে মস্ত একটি কথা আছে। মানুষ ইহার দ্বারাই জানাইল আমার ধার্মী কিছু আছে তাহাতে তোমার অংশ আমি স্বীকার করিলাম। আমার জানীরা বাহা জানিয়াছেন তুমি তাহা জানিবে,

আমার মহাপুরুষেরা যে শুপাঙ্গা করিয়াছেন তুমি তাহার কল পাইবে, আমার বীরেরা যে জীবন দিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমার কর্মীরা যে পথ নির্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবনযাত্রা অব্যাহত হইবে। এই শিশু কিছুই না জানিয়া আজ একটি মহৎ অধিকার লাভ করিল—অঙ্কুর এই শুভদিনটি তাহার সমস্ত জীবনে চিরদিন সার্থক হইয়া উঠিতে থাক।

অন্য আমরা ইহাই অনুভব করিতেছি মানুষের জন্মক্ষেত্র কেবল একটিমাত্র নহে, তাহা কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র নহে, তাহা মঙ্গলের ক্ষেত্র। তাহা কেবল জীবলোক নহে তাহা মেহলোক, তাহা আনন্দলোক। প্রকৃতির ক্ষেত্রটিকে চোখে দেখিতে পাই, তাহা জলস্থলে ফলেফুলে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ—অথচ তাহাই মানুষের সর্বাপেক্ষা সত্য আশ্রয় নহে। যে জ্ঞান, যে প্রেম, যে কল্যাণ অদৃশ্য হইয়া আপনার বিপুল সৃষ্টিকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—সেই জ্ঞানপ্রেম-কল্যাণের চিন্ময় আনন্দময় জগৎই মানুষের ষথার্থ জগৎ। এই জগতের মধ্যেই মানুষ ষথার্থ জন্মলাভ করে বলিয়াই সে একটি আশ্চর্য সত্তাকে আপনার পিতা বলিয়া অনুভব করিয়াছে, যে সত্তা অনির্বচনীয়। এমন একটি সত্যকেই পরম সত্য বলিয়াছে যাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া মন কিরিয়া আসে। এইজন্যই এই শিশুর জন্মদিনে মানুষ জলস্থলঅগ্নিবায়ুর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নাই, জলস্থলঅগ্নিবায়ুর অন্তরে শক্তিরূপে যিনি অদৃশ্য বিরাজমান, তাঁহাকেই প্রণাম করিয়াছে। সেইজন্যই আজ এই শিশুর নামকরণের দিনে মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্য সাজাইয়া পূজা করে নাই কিন্তু যিনি মানবসমাজের অন্তরে প্রীতিরূপে কল্যাণরূপে অধিষ্ঠিত তাঁহারই আশীর্বাদ সে প্রার্থনা করিতেছে। বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই উপলব্ধি এই পূজা, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই অধ্যাত্মলোকে জন্ম, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই দৃশ্য জগতের অন্তর্বর্তী অদৃশ্য নিকেতন। মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা আশ্চর্য নহে, মানুষের ধনমান লইয়া কাড়াকাড়ি আশ্চর্য নহে, কিন্তু বড়ো আশ্চর্য—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের পর্বে পর্বে মানুষের সেই অদৃশ্যকে পূজ্য বলিয়া প্রণাম, সেই অনন্তকে আপন বলিয়া আহ্বান। অন্য এই শিশুটিকে নাম দিবার বেলায় মানুষ সকল নামরূপের আধার ও সকল নাম-রূপের অতীতকে আপনার এই নিত্যান্ত ঘরের কাজে এমন করিয়া আমন্ত্রণ করিতে ভরসা পাইল ইহাতেই মানুষ সমস্ত জীবসমাজের মধ্যে কৃতকৃতার্থ হইল,—ধন্য হইল এই কণ্ঠাটি, এবং ধন্য হইলাম আমরা।

## ধর্মের নবযুগ

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে আপনাকে বন্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সংকীর্ণ সংস্কারের অঙ্গুসরণ করিয়া অত্যন্ত অল্পদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এইজন্যই দিনের মধ্যে অস্তুত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অস্তুত একবার করিয়াও এ কথা বুদ্ধিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূভুবঃ স্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অস্তুত একবার করিয়াও অস্তুতের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কালের জিনিসের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমূহর্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলই তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অঙ্গুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম, আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে; এবং আমরা নিজের ধর্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনার হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্মের উপরেই আমাদের নিজের সংকীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এইজন্যই আমাদের ধর্মকে অস্তুত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেটন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠার তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুদ্ধিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।



কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড়ো বকমের পরিবর্তন দেখা দিতেছে—তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় একথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চোঁকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি—অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একটা মস্ত ভুল সে আমাদের একে একে ঘুচাইতে লাগিল যে, জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনই দেখি না কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্য-জালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণু-পরমাণুর সহিত নাড়ির বঁধনে বঁধা। এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনই ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড়ো কুলীন বলিয়াই মনে করুন না কেন গোত্র সকলেরই এক। এইজন্য বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটেই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস। তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্বায়ে যেমনই হ'ক না কেন, জীবপর্বায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ত্ব খাটে না; পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন বংশ; এবং মানুষ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত, সকল জীব হইতে একেবারেই পৃথক। কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকুকেও বজায় রাখিতে দিল না; জীবের সঙ্গে জীবের কোথাও বা নিকট কোথাও বা দূর কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে এ সংবাদটিও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে মানবসমাজে যাহারা পরস্পরকে একেবারে নিঃসম্পর্ক বলিয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়া ছিল, ভাষাতত্ত্বের স্তরে স্তরে তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধ উদ্ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের নানা শাখা

প্রশাখায় উজান বাহিয়া মানুষের সন্ধান অবশেষে এক দূর গজোজীতে এক মূল প্রসবণের কাছে উপনীত হইতে লাগিল।

এইরূপে জড়ে জীবে সর্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ এমনি সুদূরবিদ্যুত এমনি বিচিত্র করিয়া প্রত্যহ প্রকাশ হইতেছে ; যেখানেই সেই যোগের সীমা আমরা স্থাপন করিতেছি সেইখানেই সেই সীমা এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সকল জ্ঞানকেই আজ পরস্পর তুলনার দ্বারা তোল-করিয়া দেখিবার উদ্যোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, ধর্মের তুলনা,— সমস্তই তুলনা। - সত্যের বিচারসভায় আজ জগৎ জুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে ; আজ একের সংবাদ আরের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে ; নিজের পক্ষের কথা একমাত্র যে নিজের জবানিতেই বলে, যে বলে আমার শাস্ত্র আমার মধ্যেই, আমার তত্ত্ব আমাতেই পরিসমাপ্ত, আমি আর কারও দ্বার ধারি না— তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে কেহ মুহূর্তকাল দ্বিধা করে না।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ যেদিকটাতে অতি দীর্ঘকাল বাধা ছিল আজ যেন একেবারে তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত যে, সে খাঁচার পাখি, আজ জানিতে পারিয়াছে সে আকাশের পাখি। এতকাল তাহার চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাই ওই খাঁচার লৌহশলাকাগুলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। আজ তাহা লইয়া আর কাজ চলে না। সেই আগেকার মতো ভাবিতে গেলে সেই রকম করিয়া কাজ করিতে বসিলে সে আর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। অথচ অনেক দিনের অভ্যাস অস্থিমজ্জায় গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই মানুষের মনকে ও ব্যবহারকে আজ বহুতর অসংগতি অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। পুরাতনের আসবাবগুলো আজ তাহার পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এত দিন তাহাকে এত মূল্য দিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে ফেলিতে মন সরিতেছে না ; সেগুলো যে অনাবশ্যক নহে, তাহারা যে চিরকালই সমান মূল্যবান এই কথাই প্রাণপণে নানাপ্রকার স্মৃতি ও কুস্মৃতির দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাধিয়া দিয়াছে ; আর কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতে পারে না, নিজের শক্তিতে তো নহেই ;—সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্য-পানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনো প্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষত নিজের চেষ্টার স্বাধীন-ভাবে অন্নপানের সন্ধানের মতো নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দিষ্ট

খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে একথা একেবারেই অশ্রদ্ধের এবং সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ।

আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবন সংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।

আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেরল উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো আয়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই; অপরিষ্কৃততা হইতে পরিষ্কৃততার অভিমুখে কেবলই সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমার্শ্ব নিত্যবহমান প্রকাশব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে—সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলই আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কেবলই “লঙ্ঘের বদলে মুকুতা,” স্থলের বদলে শূন্যটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই। এইজন্ত যাত্রার গানই আজ তাহার গান, এইজন্ত সমুদ্রের আনন্দই আজ তাহার মনকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। একথা আজ সে কোনোমতেই মনে করিতে পারিতেছে না যে, নোঙরের শিকলে মরিচা পড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চূপ করিয়া কূলে পড়িয়া থাকাই তাহার সনাতন সত্যধর্ম! বাতাস আজ তাহাকে উত্তলা করিতেছে, বলিতেছে, ওরে মহাকালের যাত্রী, সবকটা পাল তুলিয়া দে,—ধ্রুব নক্ষত্র আজ তাহার চোখের সম্মুখে জ্যোতির্ময় তর্জনী তুলিয়াছে, বলিতেছে, ওরে বিধাকাতর, ভয় নাই অগ্রসর হইতে থাক। আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কর্ণধারকেই ডাকিতেছে—ধিনি তাঁহার পুরাতন গুরুভার নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল ভরজের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।



আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সন্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্ত কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা : যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে ;—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল ; যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া কল নাই এবং প্রবেশ করিতে দিবই না। “তবে বাহিরের লোকের কী গতি হইবে” এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মানুষ উত্তর দেয় পুরাকাল ধরিয়া সেই বাহিরের লোকের যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই অচলভাবে আবদ্ধ থাকিলেই তাহার পক্ষে শ্রেয় ; অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের মনের এইরূপ বিশ্বাস যে, বিজ্ঞায় মানুষের সর্বত্র অধিকার, বাণিজ্যে মানুষের সর্বত্র অধিকার, কেবলমাত্র ধর্মেরই মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরম্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই ; সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় পৃথক, মানুষের মুক্তির পথ পৃথক, পূজার মন্ত্র পৃথক ; আর সর্বত্রই স্বভাবের আকর্ষণেই হউক আর প্রবলের শাসনের দ্বারাই হউক মানুষের এক হইয়া মিলিবার আশা আছে, উপায় আছে ; এমন কি নানাজাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিশেষ স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরম্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না। বস্তুত মূর্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা—যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোনো বিশেষ রূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্যকলের আকর বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া প্রবেশের অণু কোনো উপায় রাখা হয় নাই ; মূর্তিপূজা সেই সময়েরই—যখন পাঁচসাত কোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক স্বেচ্ছ, পর-সমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী—এক কথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কার যতই সংকীর্ণ হয় তাহা মানুষকে ততই আঁট করিয়া ধরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ততই অত্যন্ত কঠিন হয় ;—যাহারা অলংকারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের এই অলংকার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে,—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে ক্লেশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্তের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্তের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়াছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশে সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্যের মতো অত্যাশ্চর্য হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাধ তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যঃ জ্ঞানঃ অনন্তঃ ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের একরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির

বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাবায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইরাছে ? আত্ম মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে, সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহার অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না । তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সংকোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না ।

কিন্তু এই ব্রহ্ম তো কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন—রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপঃ অমৃতরূপঃ । ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং—এযোস্ত পরম আনন্দঃ—ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলক্ক সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন । রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না ভক্তি ছাড়া তো আর কিছুই বাঁধিতে পারে না । জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো কল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে স্বপ্ন মিটে না ।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই । ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদের কাছে দেখাইয়া চলিতে হইবে ।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্ষের আড়ম্বরের মধ্যে, পূজাঅর্চনা ক্রিয়া-কর্মের মহাসমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ।

তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতি-বিপদকে তিনি ভ্রক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই ; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপকল্প বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণভলে তাঁহার মন্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকাল-পর্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দকুঞ্জচ্ছায়ায় ঝুলবুলের মতো প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন ।

এমনি করিয়াই তো আমাদের নবযুগের ধর্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য



করিয়া দেখিতেছি। কোনো বাহ্যমুর্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে— একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্ধিষ্ঠ করিয়া দেখিতেছি।

যন্তুত পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জগুই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য ; সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের অচারবিচারঅমুঠান কল্পনাকাহিনীতে পরম্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই ; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।

সেইজগুই আজ উৎসবের দিনে সেই রসস্বরূপের নিকট আমাদের যে প্রার্থনা তাহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, তাহা আমাদের আত্মার প্রার্থনা, অর্থাৎ তাহা একই কালে সমস্ত মানবাত্মার প্রার্থনা। হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের বিধাতা, একথা যেন আমরা একদিনের জগুও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বাহিরের, আমার গোচর অগোচর যত কিছু পাপ যত কিছু অপরাধ এই কারণেই অসহ্য যে আমি তাহার দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছি, আমার সে সকল বন্ধন সমস্ত মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড়ো মহত্ত্ব আমার উপর তুমি অর্পণ করিয়াছ আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করিতেছে ; এইজগুই পাপ এত নিদারুণ, এত ঘৃণ্য ; তাহাকে আমরা যত গোপনই করি তাহা গোপনের নহে, কোন্ একটি সুগভীর যোগের ভিতর দিয়া তাহা সমস্ত মানুষকে গিয়া আঘাত করিতেছে, সমস্ত মানুষের তপস্শ্রাকেই স্নান করিয়া দিতেছে। হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্বমানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে। মানবের অন্তরাত্মার অন্তর্গত এই চির-সংকল্পটিকে তুমি বীর্যের দ্বারা প্রবল করো, পুণ্যের দ্বারা নির্মল করো, তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত ভয়সংকোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিষ ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া, যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না। অনেক দিন মানুষের ধর্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া ছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশদিকে তোমার

আহ্বানভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেক দিন বাতাস এমনি শুষ্ক হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মুচ্ছিত ; গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্যন্ত কাঁপে নাই ;—আজ ঝড় আসিয়া পড়িল ; আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক। ঘরের, সমাজের, দেশের যে সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলোকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহংকার করিয়া আসিয়াছি সে সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড়কুটার মতো শূন্যে বিসর্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক ! সত্যের ছদ্মবেশপরা প্রবল অসত্যের সঙ্গে, ধর্মের উপাধিধারী প্রাচীন অমঙ্গলের সঙ্গে আজ লড়াই করিতে হইবে সেজন্য মনের সমস্ত শক্তি পূর্ণবেগে জাগ্রত হউক ! আজ বেদনার দিন আসিল, কেননা আজ চেতনার দিন,—সেজন্য আজ কাপুরুষের মতো নিরানন্দ হইলে চলিবে না ; আজ ত্যাগের দিন আসিল, কেননা আজ চলিবার দিন, আজ কেবলই পিছনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে দিন বহিয়া যাইবে আজ কৃপণের মতো ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উপর বুক দিয়া পড়িয়া থাকিলে ঐশ্বর্যের অধিকার হারাইতে থাকিব। ভীক, আজ লোকভয়কেই ধর্মভয়ের স্থানে যদি বরণ কর তবে এমন মহাদিন ব্যর্থ হইবে ;—আজ নিন্দাকেই ভূষণ, আজ অপ্রিয়কেই প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আজ অনেক ধসিবে, ঝরিবে, ভাঙিবে, ক্ষয় হইয়া যাইবে ;—নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে পর্দা সেদিকে হঠাৎ আলোক প্রকাশ হইবে ; নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে প্রাচীর সেদিকে হঠাৎ পথ বাহির হইয়া পড়িবে। হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়-লীলায় ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীৰবান আনন্দের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব ;—মাহুঘের চিত্তসাগরের অন্তলম্পর্শ রহস্ত আজ উন্মোচিত হইয়া জানে কর্মে ত্যাগে ধর্মে কত কত অত্যাশ্চর্য অজ্ঞেয় শক্তি প্রকাশমান হইয়া উঠিবে, তাহাকে জয়শ্রদ্ধাধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত হারবাতায়ন অসংকোচে উদ্ঘাটিত করিয়া দিব। হে অনন্তশক্তি, আমাদের হিসাব তোমার হিসাব নহে,—তুমি অক্ষমকে সক্ষম কর, অচলকে সচল কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর এবং মোহমুগ্ধকে বখন তুমি উদ্বোধিত কর তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি যে কোন্ অমৃতলোকের তোরণ-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাও তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না—এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে অমর হইয়া উঠি, এবং আমাদের বাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,

## ধর্মের অর্থ

মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্তার মীমাংসার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়োর দিক আছে, একটা ছোটোর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছোট আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছোটটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোটো থাকিয়াও তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানা রকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে কখনো সে ছোটোটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়োটাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

প্রথমে ধরা যাক আমাদের এই শরীরটাকে। এটি একটি ছোটো পদার্থ। ইহার বাহিরে একটি প্রকাণ্ড বড়ো পদার্থ আছে, সেটি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমরা অশ্রুমনস্ক হইয়া এই শরীরটাকে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করি। যেন এ শরীর আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু তেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে এ শরীরের কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাই না। আপনাকে লইয়া এ শরীর করিবে কী? থাকিবে কোথায়? আপনার মধ্যে এই শরীরের প্রয়োজন নাই সমাপ্তি নাই।

বস্তুত আমাদের এই শরীরে যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে, সে আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। বৃহৎ বিশ্বশরীরের সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার মিল হয় সেই পরিমাণে তাহার অর্থ পাওয়া যায়। গর্ভের ভ্রূণ যে নাক কান হাত পা লইয়া আছে গর্ভের বাহিরেই তাহার সার্থকতা। এইজন্ত জন্মগ্রহণের পর হইতেই চোখের সঙ্গে আকাশব্যাপী আলোর, কানের সঙ্গে বাতাসব্যাপী শব্দের, হাত পায়ের সঙ্গে চারিদিকের নানাবিধ বিষয়ের, সকলের চেয়ে যেটি ভালো যোগ সেইটি সাধন করিবার জন্ত মানুষের কেবলই চেষ্টা চলিতেছে। এই বড়ো শরীরটির সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিবে ইহাই ছোটো শরীরের একান্ত সাধনা—অথচ আপনার ভেদটুকু যদি না রাখে তাহা হইলে সে মিলনের কোনো অর্থই থাকে না। আমার চোখ আলো হইবে না, চোখরূপে থাকিয়া আলো পাইবে, দেহ পৃথিবী হইবে না, দেহরূপে থাকিয়া পৃথিবীকে উপলব্ধি করিবে, ইহাই তাহার সমস্তা।

বিরাট বিশ্বদেহের সঙ্গে আমাদের ছোটো শরীরটি সকল দিক দিয়া এই যে আপনার যোগ অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছে এ কি তাহার প্রয়োজনের চেষ্টা? পাছে



অঙ্ককারে কোথাও খোঁচা লাগে এইজন্যই কি চোখ দেখিতে চেষ্টা করে? পাঁছে বিপদের পদধ্বনি না জানিতে পারিয়া দুঃখ বটে এইজন্যই কি কান উৎসুক হইয়া থাকে?

অবশ্য প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস একটা আছে— প্রয়োজন তাহার অন্তর্ভূত। সেটা আর কিছু নহে, পূর্ণতার আনন্দ। চোখ আগোর মধ্যেই পূর্ণ হয়, কান শব্দের অন্তর্ভুক্তিতেই সার্থক হয়। যখন আমাদের শরীরে চোখ কান ফোটেও নাই তখনও সেই পূর্ণতার নিগূঢ় ইচ্ছাই এই চোখ কানকে বিকশিত করিবার জন্য অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছে। মায়ের কোলে শুইয়া শুইয়া যে শিশু কথা কহিবার চেষ্টায় কলস্বরে আকাশকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে কথা কহিবার প্রয়োজন যে কী তাহা সে কিছুই জানে না। কিন্তু কথা কহার মধ্যে যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতা দূর হইতেই তাহাকে আনন্দআশ্বাস পাঠাইতেছে, সেই আনন্দে সে বারবার নানা শব্দ উচ্চারণ করিয়া কিছুতেই ক্লান্ত হইতেছে না।

তেমনি করিয়াই আমাদের এই ছোটো শরীরটির দিকে বিরাট বিশ্ব-শরীরের একটি আনন্দের টান কাজ করিতেছে। ইহা পূর্ণতার আকর্ষণ, সেইজন্য যেখানে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই সেখানেও আমাদের শক্তি ছুটিয়া বাইতে চায়। গ্রহে চন্দ্রে তারায় কী আছে তাহা দেখিবার জন্য মানুষ রাত্রির পর রাত্রি জাগিতে প্রস্তুত হয় না। যেখানে তাহার প্রয়োজনকেন্দ্র সেখান হইতে অনেক দূরে মানুষ আপনার ইন্দ্রিয়বোধকে দূত পাঠাইতেছে। যাহাকে সহজে দেখা যায় না তাহাকে দেখিবার জন্য দূরবীন অণুবীক্ষণের শক্তি কেবলই সে বাড়াইয়া চলিয়াছে—এমনি করিয়া মানুষ নিজের চক্ষুকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতেছে; যেখানে সহজে যাওয়া যায় না সেখানে ঘাইবার জন্য নব নব যানবাহনের কেবলই সে সৃষ্টি করিতেছে; এমনি করিয়া মানুষ আপনার হাত পাকে বিশ্বে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জলস্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ অব্যাহত করিবার উদ্যোগ কত কাল হইতে চলিয়াছে। জলস্থল আকাশের পথ দিয়া সমস্ত জগৎ মানুষের চোখ কান হাত পাকে কেবলই যে ডাক দিতেছে। বিরাটের এই নিমজ্জন রক্ষার জন্য মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণের পূর্বমুহূর্ত হইতেই আজ পর্যন্ত কেবলই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর, প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিয়া পথ তৈরি করিতে লাগিয়াছে। বিরাটের সেই নিমজ্জন প্রয়োজনের নিমজ্জন নহে, তাহা মিলনের নিমজ্জন, আনন্দের নিমজ্জন; তাহা ক্ষুদ্র শরীরের সহিত বৃহৎ শরীরের পরিণয়ের নিমজ্জন; এই পরিণয়ে প্রেমও আছে সংসারবান্ধাও আছে, আনন্দও আছে প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এই মিলনের মূলমন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।

তুখু চোখ কান হাত পা লইয়া মানুষ নয়। তাহার একটা মানসিক কলেবর আছে। নানা প্রকারের বৃত্তি প্রবৃত্তি সেই কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই সব মনের বৃত্তি লইয়া আপনার মনটিকে যে নিত্যসুতাই কেবল আপনার করিয়া সকল হইতে তফাত করিয়া রাখিব তাহার জো নাই। ওই বৃত্তিগুলাই আপনার বাহিরে ছুটিবার জন্ত মনকে লইয়া কেবলই টানাটানি করিতেছে। মন একটি বৃহৎ মনোলোকের সঙ্গে যতদূর পারে পূর্ণরূপে মিলিতে চাহিতেছে। নহিলে তাহার স্নেহপ্রেম দয়ামায়া, এমন কি ক্রোধ ঘেঘ সোভ হিংসারও কোনো অর্থই থাকে না। সকল মানুষের মন বলিয়া একটি খুব বড়ো মনের সঙ্গে সে আপনার ভালো রকম মিল করিতে চায়। সেইজন্ত কত কাল হইতে সে যে কত রকমের পরিবারতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। যেখানে বাধিয়া যায় সেখানে তাহাকে আবার ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, গড়িয়া তুলিতে হয়, এইজন্তই কত বিপ্লব কত রক্তপাতের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ চলিতে হইয়াছে। বৃহৎ মনঃশরীরের সঙ্গে আপনার মনটিকে বেশ ভালোরকম করিয়া মিলাইয়া লইতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। যে পরিমাণে তাহার ভালো রকম করিয়া মিল ঘটে সেই পরিমাণেই তাহার পূর্ণতা। যে ব্যবস্থায় তাহার মিল অসম্পূর্ণ হয় ও কেবলই ভেদ ঘটিতে থাকে সেই ব্যবস্থায় তাহার দুর্গতি। এখানেও প্রয়োজনের প্রেরণা মূল প্রেরণা এবং সর্বোচ্চ প্রেরণা নহে। মানুষ পরিবারের বাহিরে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর বাহিরে দেশ, দেশের বাহিরে বিশ্বমানবসমাজের দিকে আপন চিন্তাবিস্তারের যে চেষ্টা করিতেছে এ তাহার প্রয়োজনের আপিসঘাত্রা নহে, এ তাহার অভিসারঘাত্রা। ছোটো হৃদয়টির প্রতি বড়ো হৃদয়ের একটি ডাক আছে। সে ডাক এক মুহূর্ত ধামিয়া নাই। সেই ডাক শুনিয়া আমাদের হৃদয় বাহির হইয়াছে সে খবরও আমরা সকল সময়ে জানিতে পারি না। রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসে, ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠে, বারবার পথ হারাইয়া যায়, পা কাটিয়া গিয়া মাটির উপর রক্তচিহ্ন পড়িতে থাকে তবু সে চলে; পথের মাঝে মাঝে সে বসিয়া পড়ে বটে কিন্তু সেখানেই চিরকাল বসিয়া থাকিতে পারে না, আবার উঠিয়া আবার তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়।

এই যে মানুষের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নানা ইন্দ্রিয়বোধ, তাহার নানা বৃত্তিপ্রবৃত্তি, এ সমস্তই মানুষকে কেবলই বিচিত্রের মধ্যে বিস্তারের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রের শেষ কোথায়? এই বিস্তারের অন্ত কল্পনা করিব কোন্‌খানে? শুনিয়াছি সেকেন্দর শা একদিন জয়োৎসাহে উন্মত্ত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন জিতিয়া লইবার জন্ত দ্বিতীয় আর একটা পৃথিবী তিনি পাইবেন কোথায়? কিন্তু মানুষের চিন্তাকে কোনোদিন এমন বিষম দৃষ্টিভঙ্গি আসিয়া ঠেকিতে হইবে না যে, তাহার অধিকার বিস্তারের স্থান

আর নাই। কোনো দিন সে বিষয় হইয়া বলিবে না যে, সে তাহার ব্যাপ্তির শেষ সীমায় আসিয়া বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মানুষের পক্ষে কেবলই কি এই গণনাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরামহীন ব্যাপ্তিই আছে? কোনোখানেই তাহার পৌছানো নাই? অন্তহীন বহু কেবলই কি তাহাকে এক হইতে দুই, দুই হইতে তিনের সিঁড়ি বাহিয়া লইয়া চলিবে—সে সিঁড়ি কোথাও যাইবার নাম করিবে না?

এ কখনো হইতেই পারে না। আমরা জগতে এই একটি কাণ্ড দেখি—গম্যস্থানকে আমরা পদে পদেই পাইতেছি। বস্তুত আমরা গম্যস্থানেই আসিয়া রহিয়াছি—আমরা গম্যস্থানের মধ্যেই চলিতেছি। অর্থাৎ যা আমরা পাইবার তা আমরা পাইয়া বসিয়াছি, এখন সেই পাওয়ারই পরিচয় চলিতেছে। যেন আমরা রাজবাড়িতে আসিয়াছি—কিন্তু কেবল আসিলেই তো হইল না—তাহার কত মহল কত ঐশ্বর্য কে তাহার গণনা করিতে পারে? এখন তাই দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি। এই জন্ত একটু করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতেই সমস্ত রাজপ্রাসাদের পরিচয় পাইতেছি। ইহাকে তো পথে চলা বলে না। পথে কেবল আশা থাকে, আশ্বাসন থাকে না। আবার যে পথ অনন্ত সেখানে আশাই বা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই আমি বলিতেছি আমাদের কেহ পথে বাহির করে নাই—আমরা ঘরেই আছি। সে ঘর এমন ঘর যে, তাহার বারাগায় ছাতে দালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আর শেষ করিতে পারি না অথচ সর্বত্রই তাহার শেষ; সর্বত্রই তাহা ঘর, কোথাও তাহা পথ নহে।

এ রাজবাড়ির এই তো কাণ্ড, ইহার কোথাও শেষ নাই অথচ ইহার সর্বত্রই শেষ। ইহার মধ্যে সমাপ্তি এবং ব্যাপ্তি একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। এই জন্ত এখানে কোনোখানে আমরা বসিয়া থাকি না অথচ প্রত্যেক পদেই আমরা আশ্রয় পাই। মাটি ফুঁড়িয়া যখন অঙ্কুর বাহির হইল তখন সেইখানেই আমাদের চোখ বিশ্রাম করিতে পারে। অঙ্কুর যখন বড়ো গাছ হইল তখন সেখানেও আমাদের মন দাঁড়াইয়া দেবে। গাছে যখন ফুল ধরে তখন ফুলেও আমাদের তৃপ্তি। ফুল হইতে যখন কল জন্মে তখন তাহাতেও আমাদের লাভ। কোনো জিনিস সম্পূর্ণ শেষ হইলে তবেই তাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ণতাকে পাইব আমাদের এমন ছয়দৃষ্ট নহে—পূর্ণতাকে আমরা পর্বে পর্বে পাইয়াই চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরিসমাপ্তির স্বাদ পাইতে থাকি সেইজন্তই ব্যাপ্তি আনন্দময়—নহিলে তাহার ক্ষুদ্রতা দুঃখকর আর কিছুই হইতে পারে না।

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি ভাব সর্বত্র একসঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের



মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌঁছিবাব ছরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। এ কথা বলিতেছি না যে, এখনও যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌঁছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই যেখানে মানুষের আপনার আনন্দ—এইখানেই মানুষের পর্যাপ্তি, এইখানেই মানুষ বড়ো। এইখান হইতেই গতি লইয়া মানুষের সমস্ত শক্তি বাহিরে চলিয়াছে এবং বাহির হইতে পুনরায় তাহারা এইখানেই অর্থা আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

বাহির হইতে যখন দেখি তখন বলি মানুষ নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিতেছে, মানুষ আহা করিয়া বাঁচিতেছে, রক্ত চলাচলে মানুষ বাঁচিয়া আছে। এমন করিয়া কত আর বলিব? বলিতে গিয়া তালিকা শেষ হয় না। তখন দেখি শরীরের অণুতে অণুতে রসে রসে অস্থিমজ্জাস্নায়ুপেশীতে কর্দ কেবল বাড়িয়া চলিতেই থাকে। তাহার পরে যখন প্রাণের হিসাব শেষ পর্যন্ত মিলাইতে গিয়া আলোকে উত্তাপে বাতাসে জলে মাটিতে আসিয়া পৌঁছাই, যখন প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক শক্তিরহস্তের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

এমন করিয়া অস্তহীনতার খাতায় কেবলই পাতা উলটাইয়া প্রান্ত হইয়া মরিতে হয়। কিন্তু বাহির হইতে প্রাণের ভিতর বাড়িতে গিয়া যখন প্রবেশ করি তখন কেবল একটি কথা বলি, প্রাণের আনন্দে মানুষ বাঁচিয়া আছে আর কিছু বলিবার দরকার হয় না। এই প্রাণের আনন্দেই আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি, থাইতেছি, দেহ রচনা করিতেছি, বাড়িতেছি। বাঁচিয়া থাকিব এই প্রবল আনন্দময় ইচ্ছাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি সচেष्ट হইয়া বিশ্বময় ছুটিয়া চলিতেছে। প্রাণের আনন্দেই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; প্রাণের নিগূঢ় আনন্দে প্রাণীরা জগতের নানা স্পর্শের তানে আপনার স্বায়ুর তারগুলিকে কেবলই বিচিত্রতর করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। বাঁচিয়া থাকিতে চাই এই ইচ্ছা সন্তানসন্ততিকে জন্ম দিতেছে, রক্ষা করিতেছে, চারিদিকের পরিবেষ্টনের সঙ্গে উত্তরোত্তর আপনার সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য সাধন করিতেছে।

এমন কি, বাঁচিয়া থাকিব এই আনন্দেই জীব মৃত্যুকেও স্বীকার করিতেছে। সে লড়াই করিয়া প্রাণের আনন্দেই প্রাণ দিতেছে। কর্মী মউমাছিয়া আপনাকে অজহীন

করিতেছে কেন? সমস্ত মউচাকের প্রজাদের প্রাণের সমগ্রতার আনন্দ তাহারিগকে ভাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করিতেছে। দেশের অল্প মানুষ যে অকাতরে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে তাহার মূলে এই প্রাণেরই আনন্দ। সমস্ত দেশের প্রাণকে সে বড়ো করিয়া আনিতে চায়—সেই ইচ্ছার জোরেই সেই আনন্দের শক্তিতেই সে আপনাকেও বিসর্জন করিতে পারে।

তাই আমি বলিতেছিলাম মূলে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে দেখা যায় প্রাণের আনন্দই বাঁচিয়া থাকিবার নানা শক্তিকে নানা দিকে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, সেই নানা শক্তি নানা দিক হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই আনন্দেই ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহারই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণের এই শক্তি যেমন প্রাণের ব্যাপ্তির দিক, প্রাণের এই আনন্দ তেমনি প্রাণের সমাপ্তির দিক।

যেমন গানের তান। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিসটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে; তাহার মধ্যে তালমানলয় রহিয়াছে; তাহার মধ্যে স্বর-বিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে; সেই নিয়মের মূলে স্বরভঙ্গের গণিতশাস্ত্রসম্মত একটা দুর্লভ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাতাসকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই; সেই নিয়মগুলি কার্যকারণের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি অন্তর্হীন নিয়ম-শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে একরকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়। মূলের কথাটি এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

কিন্তু যদি এই আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উলটাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই অটল ও বিস্তৃত থাক না কেন গানকে সে কিছুই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।

যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। তখন তাহার গলায় যে তান খেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহা দুঃসাধ্য তাহা আপনি ষটিতে থাকে। তাহাকে আর নিয়মের অঙ্গসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি তাহার অঙ্গগত হইয়া চলে। তানসেন আপনার মধ্যে সেই গানের আনন্দলোকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাই ঐশ্বর্যলোক; এখানে অভাব পূরণ হইতেছে, ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে। তানসেন এই আয়গায় আসিয়া গান সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিতে এ কথা বুঝায় না যে, তাঁহার গানে তাহার পর হইতে নিয়মের বন্ধন আর ছিল না;—তাহা সম্পূর্ণ ই ছিল, তাহার লেশমাত্র ক্রটি ছিল না—কিন্তু তিনি সমস্ত নিয়মের মূলে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া নিয়মের প্রভু হইয়া বসিয়াছিলেন—তিনি এককে পাইয়াছিলেন বলিয়াই অসংখ্য বহু আপনি তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছিল। এই আনন্দলোকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য সম্বন্ধে কবি, কর্ম সম্বন্ধে কর্মী মুক্তিলাভ করে। কবির কাব্য কর্মীর কর্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়।

যাহা আপনার ভাব হইতে উঠে তাহাই স্বাভাবিক—তাহার মধ্যে অন্তের তাড়না নাই, তাহাতে নিজেরই প্রেরণা। যে কর্ম আমার স্বাভাবিক সেই কর্মেই আমি আপনার সত্য পরিচয় দিই।

কিন্তু এখানে আমরা যথেষ্ট ভুল করিয়া থাকি। এই ঠিক আপনটিকে পাওয়া যে কাহাকে বলে তাহা বুঝা শক্ত। যখন মনে করিতেছি অমুক কাজটা আমি আপনি করিতেছি অন্তর্ধর্মী দেখিতেছেন তাহা অন্তের নকল করিয়া করিতেছি—কিংবা কোনো বাহিরের বিষয়ের প্রবল আকর্ষণে এককোঁক প্রবৃত্তির জোরে করিতেছি।

এই যে বাহিরের টানে প্রবৃত্তির জোরে কাজ করা ইহাও মানুষের সত্যতম স্বভাব নহে। বস্তুত ইহা জড়ের ধর্ম। যেমন নীচের টানে পাথর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে প্রবল বেগে গড়াইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ। এই জড়ধর্মকে খাটাইয়া প্রকৃতি আপনার কাজ চালাইয়া লইতেছে। এই জড়ধর্মের জোরে অগ্নি জলিতেছে, সূর্য তাপ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, কোথাও তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। ইহা শাসনের কাজ। এই জন্মেই উপনিষদ বলিয়াছেন—

ভরাদশ্যগ্নিস্তপতি ভরাদশ্যপতি সূর্যঃ,

ভরাদিশ্রুত বায়ুশ্চ বৃত্ত্যর্থাগতি পঞ্চমঃ।

অগ্নিকে জলিতেই হইবে, মেঘকে বর্ষণ করিতেই হইবে, বায়ুকে বহিতেই হইবে এবং



মৃত্যুকে পৃথিবীস্থল লোকে মিলিয়া গালি দিলেও তাহার কাজ তাহাকে শেষ করিতেই হইবে।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ অড়ধর্ম আছে। মানুষকে সে কানে ধরিয়া কাজ করাইয়া লয়। মানুষকে প্রকৃতি এইখানে তাহার অস্বাভাবিক অড়বস্তুর খামিল করিয়া লইয়া জোর করিয়া আপন প্রয়োজন আদায় করিয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ যদি সম্পূর্ণই অড় হইত তাহা হইলে কোথাও তাহার বাধিত না সে পাথরের মত অগত্যা গড়াইত, জলের মত অগত্যা বহিয়া যাইত এ সম্বন্ধে কোনো নালিশটিও করিত না।

মানুষ কিন্তু নালিশ করে। প্রকৃতি যে তাহাকে কানে ধরিয়া সংসারক্ষেত্রে খাটাইয়া লয় ইহার বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি আজও খামিল না। সে আজও কাঁদিতেছে —

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে

সংসার-গারদে থাকি বন্দি।

সে ভিতরে ভিতরে এই কথাটা অনুভব করিতেছে যে, আমি যে কাজ করিতেছি সে গারদের মধ্যে কয়েদির কাজ—প্রকৃতিপেরাদার তাড়নার খাটিয়া মরিতেছি।

কিন্তু সে ভিতরে জানে এমন করিয়া অভাবের তাড়নার প্রকৃতির প্রেরণায় কাজ করাই তাহার চরম ধর্ম নহে। তাহার মধ্যে এমন কিছু একটি আছে যাহা মুক্ত, যাহা আপনার আনন্দেই আপনাতে পর্যাপ্ত, দেশকালের দ্বারা যাহার পরিমাপ হয় না, অরামভূয় দ্বারা যাহা অভিভূত হয় না। আপনার সেই সত্য পরিচয় সেই নিত্য পরিচয়টি লাভ করিবার জন্যই তাহার চরম বেদনা।

পূর্বেই আমি বলিয়াছি, কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্মী আপন কর্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত আপনাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভিতরকার আপনাকে যতই সে লাভ করে ততই কবির কাব্য অমর হইয়া উঠে; সে তখন বাহিরের অক্ষরগণা কাব্য হয় না; ততই কর্মীর কর্ম অমর হইয়া উঠে, সে তখন যন্ত্রচালিতব্য কর্ম হয় না। কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময়,—এইখানেই স্বত-উৎসারিত আনন্দের প্রস্রবণ।

এইজন্যই শান্ত্রে বলে—

সর্বং পরমং হৃৎকং সর্বমানবং হৃৎকং ।

যাহা কিছু পরম তাহাই হৃৎকং, যাহা কিছু মানব তাহাই হৃৎকং ।

অর্থাৎ মানুষের পুণ্য তাহার আপনার মধ্যে—আর হৃৎকং তাহার আপন হইতে উদ্ভব।

এত বড়ো কথাটাকে ভুল বুঝিলে চলিবে না। যখন বলিতেছি শ্রুত মানুষের আপনের মধ্যে, তখন ইহা বলিতেছি না যে, শ্রুত তাহার স্বার্থসাধনের মধ্যে। স্বার্থপরতার দ্বারা মানুষ ইহাই প্রমাণ করে যে, সে স্বার্থ আপনাতাই পায় নাই, তাই সে অর্ধেকই এমন চরম করিয়া এমন একান্ত করিয়া দেখে। অর্ধেকই যখন সে আপনাতাই চেয়ে বড়ো বলিয়া জানে তখন অর্ধই তাহাকে ঘুরাইয়া মারে, তাহাকে দুঃখ হইতে দুঃখে লইয়া যায়—তখনই সে পরবশতার আঙ্গস্যমান দৃষ্টান্ত হইয়া উঠে।

প্রতিদিনই আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। যে ব্যক্তি স্বার্থপর তাহাকে আপনাতাই অর্ধ ত্যাগ করিতে হয়—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দ্বারে পড়িয়া অর্ধেরই জন্ত সে অর্ধ ত্যাগ করে—সেই তাহার প্রয়োজনের ত্যাগ দুঃখের ত্যাগ। কেননা, সেই ত্যাগের মূলে একটা তাড়না আছে, অর্থাৎ পরবশতা আছে। অভাবের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্তই তাহাকে ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এক একটা সময় উপস্থিত হয় যখন সে ধুশি হইয়া থরচ করিয়া ফেলে। তাহার পুত্র জন্মিয়াছে খবর পাইয়া সে তাহার গায়ের দামি শালখানা তখনই দিয়া ফেলে। ইহা একপ্রকার অকারণ দেওয়া, কেননা কোনো প্রয়োজনই তাহাকে দিতে বাধ্য করিতেছে না। এই যে দান ইহা কেবল আপনাতাই আনন্দের প্রাচুর্যকে প্রকাশ করিবার দান। আমার আপন আনন্দই আমার আপনাতাই পক্ষে যথেষ্ট এই কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ত ওই শালখানা দিয়া ফেলিতে হয়। এই আনন্দের জোরে মানুষ একেবারে গভীরতম এমন একটি আপনাকে গিয়া স্পর্শ করে যাহাকে পাওয়া তাহার অত্যন্ত বড়ো পাওয়া। সেই তাহার আপনটি কাহারও তাঁবেদার নহে, সে জগতের সমস্ত শাল দোশালার চেয়ে অনেক বড়ো এইজন্য চকিতের মতো মানুষ তাহার দেখা যেই পায় অমনি বাহিরের ওই শালটার দাম একেবারে কমিয়া যায়। যখন মানুষের আনন্দ না থাকে, যখন মানুষ আপনাকে না দেখে, তখন ওই শালটা একেবারে হাজার টাকা ওজনের বোঝা হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় চর্মের মতো সর্বান্তে চাপিয়া ধরে—তাহাকে সরাইয়া দেওয়া শক্ত হইয়া উঠে। তখন ওই শালটার কাছে পরবশতা স্বীকার করিতে হয়।

এমনি করিয়া মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া আপনাকে দেখিতে পায়। মাঝে মাঝে এমন এক একটা আনন্দের হাওয়া দেয় যখন তাহার বাহিরের ভারি ভারি পর্দাগুলোকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্ত উড়াইয়া ফেলে। তখন বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—কৃপণ যে সেও ব্যয় করে, বিলাসী যে সেও দুঃখ স্বীকার করে, ভীক যে সেও প্রাণ বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন যে নিয়মে সংসার চলিতেছে সেই নিয়মকে মানুষ এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে। সেইরূপ অবস্থায় মানুষের ইতিহাসে হঠাৎ এমন একটা যুগান্ত



উপস্থিত হয়—পূর্বকার সমস্ত খাতা মিলাইয়া বাহার কোনো প্রকার হিসাব পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া পাইবে? স্বার্থের প্রয়োজনের হিসাবের সঙ্গে আশ্রয় আনন্দের হিসাব কোনোমতেই মেলানো যায় না—কেননা সেই স্বার্থ আপনার মধ্যে গিয়া পৌঁছিলে মানুষ হঠাৎ দেখিতে পায়, খরচই সেখানে জমা, দুঃখই সেখানে স্রুখ।

এমনি করিয়া মাঝে মাঝে মানুষ এমন একটি আপনাকে দেখিতে পায়, বাহিরের সমস্তের চেয়ে যে বড়ো। কেন বড়ো? কেননা সে আপনার মধ্যেই আপনি সমাপ্ত। তাহাতে গুনিতে হয় না, মাপিতে হয় না—সমস্ত গনা এবং মাপা তাহা হইতেই আরম্ভ এবং তাহাতে আসিয়াই শেষ হয়। ক্ষতি তাহার কাছে ক্ষতি নহে, মৃত্যু তাহার কাছে মৃত্যু নহে, ভয় তাহার বাহিরে এবং দুঃখের আঘাত তাহার তारे আনন্দের স্রব বাজাইয়া তোলে।

এই যাহাকে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া পায়—যাহাকে কখনো কখনো কোনো একটা দিক দিয়া সে পায়—যাহাকে পাইবামাত্র তাহার শক্তি স্বাভাবিক হয়, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়, তাহার কর্ম আনন্দের কর্ম হইয়া উঠে; যাহাকে পাইলে তাহার উপর হইতে বাহিরের সমস্ত চাপ যেন সরিয়া যায়, সে আপনার মধ্যেই আপনার একটি পর্বাঙ্গ দেখিতে পায় তাহার মধ্যেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলব্ধি করে। সেই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে অন্তরতমভাবে আছে বলিয়াই প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় সে যে সকল কাজ করে সে কাজকে সে গারদের কাজ বলে। অথচ প্রকৃতি যে নিত্যসুই জ্বরদন্তি করিয়া বেগার খাটাইয়া লয় তাহা নহে—সে আপনার কাজ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বেতনটিও শোধ করে, প্রত্যেক চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু স্রুখও খাটিয়া দেয়। সেই স্রুখের বেতনটির প্রলোভনে আমরা অনেক সময় ছুটির পরেও খাটিয়া থাকি, পেট ভরিলেও খাইতে ছাড়ি না। কিন্তু হাজার হইলে তবু মাহিনা খাইয়া খাটুনিকেও আমরা দাসত্ব বলি—আমরা এ চাকরি ছাড়িতেও পারি না তবু বলি হাড় মাটি হইল, ছাড়িতে পারিলে খাচি। সংসারে এই যে আমরা খাটি—সকল দুঃখ সন্তোষ ইহার মাহিনা পাই—ইহাতে স্রুখ আছে, লোভ আছে। তবু মানুষের প্রাণ রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং বলে—

ভায়া, কোন্ অপরোধে দীর্ঘ মেয়াদে

সংসারগারমে থাকি বল।

এমন কথা সে যে বলে, বেতন খাইয়াও তাহার যে পুরা স্রুখ নাই তাহার কারণ এই যে, সে জানে তাহার মধ্যে প্রভুত্বের একটি স্বাধীন সম্পদ আছে—সে জন্মদাস নহে—সমস্ত প্রলোভনসন্তোষও দাসত্ব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়—প্রকৃতির দাসত্বে তাহার

অভাবটাই প্রকাশ পায় স্বভাবটা নহে। স্বভাবতই সে প্রভু; সে বলে আমি নিজের আনন্দে চলিব, আমার নিজের কাজের বেতন আমার নিজেরই মধ্যে—বাহিরের স্বত্তি বা লাভ, বা প্রযুক্তি-চরিতার্থতার মধ্যে নহে। যেখানে সে প্রভু, যেখানে সে আপনার আনন্দে আপনি বিরাজমান, সেইখানেই সে আপনাকে দেখিতে চায়; সেজন্য সে ক্রোধ কষ্ট ত্যাগ মৃত্যুকেও স্বীকার করিতে পারে। সেজন্য রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়—পণ্ডিত আপনার ন্যায়শাস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া দিয়া শিশুর মত সরল হইয়া পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এই অঙ্কই মানুষ এই একটি আশ্চর্য কথা বলে, আমি মুক্তি চাই। কী হইতে সে মুক্তি চায়? না, যাহা কিছু সে চাহিতেছে তাহা হইতেই সে মুক্তি চায়। সে বলে আমাকে বাসনা হইতে মুক্ত করো—আমি দাসপুত্র নই অতএব আমাকে ওই বেতন-চাওয়া হইতে নিষ্কৃতি দাও। যদি সে নিশ্চয় না জানিত যে বেতন না চাহিলেও তাহার চলে, নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সম্পদ আছে এ বিশ্বাস যদি তাহার অন্তরতম বিশ্বাস না হইত তবে সে চাকরির গারদকে গারদ বলিয়াই জানিত না—তবে এ প্রার্থনা তাহার মুখে নিতান্তই পাগলামির মতো শুনাইত যে আমি মুক্তি চাই। বস্তুত আমাদের বেতন যখন বাহিরে তখনই আমরা চাকরি করি কিন্তু আমাদের বেতন যখন আমাদের নিজেরই মধ্যে, অর্থাৎ যখন আমরা ধনী তখন আমরা চাকরিতে ইচ্ছুক দিয়া আসি।

চাকরি করি না বটে কিন্তু কর্ম করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। কর্ম বরঞ্চ বাড়িয়া যায়। যে চিত্রকর চিত্ররচনাশক্তির মধ্যে আপনাকে পাইরাছে—যাহাকে আর নকল করিয়া ছবি আঁকিতে হয় না, পুঁথির নিয়ম মিলাইয়া যাহাকে তুলি টানিতে হয় না, নিয়ম যাহার স্বাধীন আনন্দের অঙ্গুগত—ছবি আঁকার ক্রোধ তাহার নাই, তাই বলিয়া ছবি আঁকাই তাহার বন্ধ এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বরঞ্চ উলটা। ছবি আঁকার কাজে আপনাকে সে আর বিশ্রাম দিতে চায় না। বেতন দিয়া এত খাটুনি কাহাকেও খাটানো যায় না।

ইহার কারণ এই যে, এখানে চিত্রকর কর্মের একেবারে মূলে তাহার পরাশ্রিত দিকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতন কর্মের মূল নহে, আনন্দই কর্মের মূল—বেতনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আমরা সেই আনন্দকেই আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। গঙ্গা হইতে যেমন আমরা পাইপে করিয়া কলের জল আনি, বেতন ভেদনি করিয়াই আনন্দকেই ঠেলা দিয়া তাহার একাংশ হইতে শক্তির সম্বল সঞ্চয় করিয়া আনে। কিন্তু কলের জলে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি না, তাহার হাওয়া খাইতে পারি না, তাহার তরঙ্গলীলা দেখিতে পাই না—তা ছাড়া কেবল কাজের সময়টিতেই সে ধোলা থাকে—অপব্যয়ের

ভয়ে কপণের মতো প্রলোভনের পরেই তাহাকে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহার পরে কল বিগড়াইতেও আটক নাই।

কিন্তু আনন্দের মূল গঙ্গায় গিয়া পৌঁছিলে দেখিতে পাই সেখানে কর্মের অবিরাম স্রোত বিপুল ভরজে আপনি বহিয়া যাইতেছে, লোহার কল অগ্নিচক্ৰ রাঙা করিয়া তাহাকে তাড়না করিতেছে না। সেই জলের ধারা পাইপের ধারার চেয়ে অনেক প্রবল, অনেক প্রশস্ত, অনেক গভীর। শুধু তাই নয়—কলের পাইপ-নিঃসৃত কাজে কাজই আছে কিন্তু সৌন্দর্য নাই, আরাম নাই—আনন্দের গঙ্গায় কাজের অফুরান প্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সৌন্দর্য ও আরাম অনায়াসে বিকীরণ হইতেছে।

তাই বলিতেছিলাম চিত্রকর যখন সত্য আপনার মধ্যে সকল কর্মের মূল গিয়া উত্তীর্ণ হয়, আনন্দে গিয়া পৌঁছে, তখন তাহার চিত্র আঁকার কর্মের আর অবধি থাকে না। বস্তুত তখন তাহার কর্মের দ্বারাই আনন্দের পরিমাপ হইতে থাকে, দুঃখের দ্বারাই তাহার সুখের গভীরতা বুঝিতে পারি। এই জন্যই কার্নাইল বলিয়াছেন—অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকে বলে প্রতিভা। প্রতিভা সেই শক্তিকেই বলে, যে শক্তির মূল আপনারই আনন্দের মধ্যে; বাহিরের নিয়ম বা তাড়না বা প্রলোভনের মধ্যে নহে। প্রতিভার দ্বারা মানুষ সেই আপনাকেই পায় বলিয়া কর্মের মূল আনন্দ-প্রসবণটিকে পায়; সেই আনন্দকেই পায় বলিয়া কোনো দুঃখ তাহাকে আর দুঃখ দিতে পারে না। কারণ প্রাণ যেমন আপনিই খাটকে প্রাণ করিয়া লয়, আনন্দ তেমনি আপনিই দুঃখকে আনন্দ করিয়া তোলে।

এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা কথাটা এই যে, যেখানে আপনার সমাপ্তি সেই আপনাকে মানুষ পাইতে চাহিতেছে, আপনার মধ্যে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, কারণ সেইখানেই তাহার স্থিতি, সেইখানেই তাহার আনন্দ। সেই তাহার স্বাধীন আপনার সঙ্গেই তাহার সংসারকে তাহার সমস্ত কর্মকে যোজনা করিতে চাহিতেছে। সেখান হইতে যে পরিমাণে সে বিচ্ছিন্ন হয় সেই পরিমাণেই কর্ম তাহার বন্ধন, সংসার তাহার কারাগার। সেখানকার সঙ্গে পূর্ণযোগে কর্মই মানুষের মুক্তি, সংসারই মানুষের অমৃতধাম।

এইবার আর একবার গোড়ার কথাই বসাইতে হইবে। আমরা বলিয়াছিলাম, মানুষের সমস্তা এই যে, ছোটোকে বড়োর সঙ্গে মিলাইবার ভার তাহার উপর। আমরা দেখিয়াছি তাহার ছোটো শরীরের সার্থকতা বিশ্বশরীরের মধ্যে, তাহার ছোটো মনের সার্থকতা বিশ্বমানবমনের মধ্যে। 'এই শরীর মনের দিক্ মানুষের ব্যাপ্তির দিক্। আমরা ইহাও দেখিয়াছি শুধুমাত্র এই আমাদের ব্যাপ্তির দিকে আমরা



প্রকৃতির অধীন, আমরা বিশ্বব্যাপী অনন্ত নিয়মপরম্পরার দ্বারা চালিত,—এখানে আমাদের পূর্ণ সুখ নাই, এখানে বাহিরের তাড়নাই আমাদের কাজ করার। আমাদের মধ্যে যেখানে একটি সমাপ্তির দিক আছে, সে পরিমাণে সেইখানকার সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপ্তির যোগসাধন হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তখন আমার শরীর আমারই বশীভূত শরীর, আমার মন আমারই বশীভূত মন হইয়া উঠিবে। তখন সর্বমাত্মবশঃ সুখম্। তখন আমার শরীর মনের বহু বিচিত্র নিয়ম আমার এক আনন্দের অন্তর্গত হইয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাহার বহুত্বের দুঃসহ ভার একের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া সহজ হইয়া যাইবে।

কিন্তু যেখানে তাহার সমাপ্তির দিক, যেখানে তাহার সমগ্র একের দিক সন্ধানও কি তাহার সমস্তটি নাই?

আছে বই কী। সেখানেও মানুষের আপন, আপনার চেয়ে বড়ো আপনার সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে। মানুষ যখনই আত্মবশ হইয়া আপনার আনন্দকে পায় তখনই বড়ো আনন্দকে সর্বত্র দেখিতে পায়। সেই বড়ো আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব, সেই বড়ো আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের সহজ প্রকৃতি। মানুষের শরীর বড়ো শরীরকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের মন বড়ো মনকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের আত্মা বড়ো আত্মাকে সহজে দেখে।

এইখানে পৌঁছানো, এইখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে চেষ্টা তাহাকেই আমরা ধর্ম বলি। বস্তুত ইহাই মানবের ধর্ম; মানুষের ইহাই স্বভাব, ইহাই তাহার সত্যতম চেষ্টা। বীরের ধর্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম রাজত্ব—মানুষের ধর্ম ধর্মই—তাহাকে আর কোনো নাম দিবার দরকার করে না। মানুষের সকল কর্মের মধ্যে সকল সৃষ্টির মধ্যে এই ধর্ম কাজ করিতেছে। অন্য সকল কাজের উদ্দেশ্য হাতে হাতে বোঝা যায়—ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাই, শীত নিবারণের জন্য পরি কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্যকে তেমন করিয়া চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিবার জো নাই। কেননা, তাহা কোনো সাময়িক অভাবের জন্য নহে, তাহা মানুষের যাহা কিছু সমস্তের গভীরতম মূলগত। এইজন্য কোনো বিশেষ মানুষ তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিতে পারে, কোনো বিশেষ বুদ্ধিমান তর্কের দিক হইতে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে—কিন্তু সমস্ত মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে মানুষের সকল প্রয়োজনের মধ্যে, তাহার সমস্ত কাঁড়াকাড়ি মারামারি তাহার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে এই ধর্ম রহিয়াই গিয়াছে;—তাহা অন্নপান নহে, বসনভূষণ নহে, ধ্যাতিপ্রতিপত্তি নহে, তাহা এমন কিছুই নহে যাহাকে বাদ দিলে মানুষের আবশ্যকের হিসাবে একটু কিছু গরমিল হয়; তাহাকে বাদ

দিলেও শস্ত ফলে, ঘুটি পড়ে, আগুন জলে, নদী বহে ; তাহাকে বাদ দিয়া পশুপক্ষীর কোনো অনুবিধাই ঘটে না ; কিন্তু মানুষ তাহাকে বাদ দিতে পারিল না। কেননা, ধর্মকে কেমন করিয়া ছাড়িবে ? প্রয়োজন থাকে আর নাই থাকে আর তাহার তাপধর্মকে ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহাই তাহার স্বভাব। বাহির হইতে দেখিলে বলা যায় অগ্নি কাঠকে চাহিতেছে কিন্তু ভিতরের সত্য কথা এই যে, অগ্নি আপন স্বভাবকে সার্থক করিতে চাহিতেছে—সে জ্বলিতে চায় ইহাই তার স্বভাব—এইজন্য কখনো কাঠ, কখনো খড়, কখনো আর কিছুকে সে আশ্রয় করিতেছে ; সে দিক দিয়া তাহার উপকরণের তালিকার অস্ত্র পাওয়া যায় না কিন্তু মূল কথাটি এই যে, সে আপনার স্বভাবকেই পূর্ণ করিতে চাহিতেছে। যখন তাহার উজ্জল শিখাটি দেখা যায় না কেবল কৃষ্ণবর্ণ ধূমই উঠিতে থাকে, তখন সেই চাওয়া তাহার মধ্যে আছে ; যখন সে ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে তখনও সেই চাওয়া তাহার মধ্যে নির্বাপিত হয় না। কারণ তাহাই তাহার ধর্ম। মানুষেরও সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাহার ধর্ম। ইহাই তাহার আপনাকে পরম আপনার মধ্যে চাওয়া। অন্য সকল চাওয়ার হিসাব দেওয়া যায়, কারণ, তাহার হিসাব বাহিরে, কিন্তু এই চাওয়াটির হিসাব দেওয়া যায় না, কারণ ইহার হিসাব তাহার আপনারই মধ্যে। এই জন্য তর্কে ইহাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু মূলে ইহাকে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই, এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মূলে নিহিত। সেইজন্য আমাদের তর্কবিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নির্ভর নহে। ইহা আছেই। মানুষের একটা প্রয়োজন আজ মিটিতেছে আর একটা প্রয়োজন কাল মিটিতেছে, যেটা মিটিতেছে সেটা চুকিয়া যাইতেছে—কিন্তু তাহার স্বভাবের চরম চেষ্টা রহিয়াছেই। অবশ্য এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয় যে, ইহাই যদি মানুষের স্বভাব হয় তবে ইহার বিপরীত আমরা মনুষ্যসমাজে দেখি কেন ? চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তো দেখি শিশু চলিতে পারে না। সে বারংবার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি যে, শিশু যে বারবার করিয়া পড়িতেছে আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তাহার স্বভাব—সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতি-কূলতার মধ্যে, সমস্ত আশ্রয়বিরোধের মধ্যে, তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে পড়াইতেছে, যখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলই তাহাকে নিচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনও তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে



চাহিতেছে—সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভু চায়—টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না ;—ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য প্রকৃতি যখন তাহাকে ধূলার টানিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহার স্বভাব তাহাকে উপরে টানিয়া রাখিতে চাহে। সমস্ত টলিয়া পড়ার মধ্যে এই স্বভাব তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

আমাদের ধর্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব। প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদের খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবলই চেষ্টা করিতেছে—যখন ধূলার লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনও অস্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলেই গতিকে পাইবে—দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অন্তর্গত হইবে। তখনই তোমার ধর্ম সার্থক হইবে—তখনই তুমি তোমার চরিতার্থতাকে পাইবে।

এই চরিতার্থতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ বাহির হইতে যাহা কিছু পাইতেছে তাহাতেই তাহার অন্তরতম ইচ্ছা মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—যেনাহং নাস্তা স্তাম্ কিমহং ভেন কুর্ষাম্। এই চরিতার্থতা হইতে, এই পরিসমাপ্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যাহা কিছু দেখিতেছে তাহার মধ্যে সে মৃত্যুকেই দেখিতেছে—কেবল বিচ্ছেদ, কেবল অবসান; প্রয়োজন আছে তাহার আয়োজন পাই না, আয়োজন আছে তাহার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এ যে মৃত্যুকে দেখা, ইহার অর্থ, নিরর্থকতাকে দেখা। মানুষ ইচ্ছা করিল, কাজ করিল, সুখ দুঃখ ভোগ করিল, তাহার পর মরিয়া গেল। সেইখানে মৃত্যুকে যখন দেখি তখন মানুষের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কাজের অর্থকে আর দেখিতে পাই না। তাহার দীর্ঘকালের জীবন মুহূর্তকালে মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ মিথ্যা হইয়া গেল।

পদে পদে এই মৃত্যুকে দেখা, এই অর্থহীনতাকে দেখা ভো কখনোই সত্য দেখা নহে। অর্থাৎ ইহা কেবল বাহিরের দেখা; ভিতরের দেখা নহে; ইহাই যদি সত্য হইত তবে মিথ্যাই সত্য হইত—তাহা কখনোই সম্ভব হইতে পারে না। জীবনের কার্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। মুখে যতই বলি না কেন, কোনো অর্থ নাই; যতই বলি না কাজ কেবল কাজকে জন্য দিয়াই চলিয়াছে তাহার কোনো পরিণাম নাই, ব্যাপ্তি কেবলই দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে দেশকালাতীত সূর্য্যভীর পরিসমাপ্তির কোনোই যোগ নাই যেন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিতে পারে না।

ঘারী দরজার কাছে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ শ্রবণ করিয়া পড়িতেছে। আমি তাহার ভাষা বুঝি না। আমার কেবলই মনে হয়, একটার পর আর একটা শব্দ চলিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহাদের কোনো সঙ্ক জ্ঞানি না। ইহাই মৃত্যুর রূপ; ইহাই অর্থহীনতা। ইহাতে কেবল পীড়া দেয়। যখন ভাষা বুঝি, যখন অর্থ পাই, তখন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে আর শুনি না—তখন অর্থের অনবচ্ছিন্ন ঐক্যধারাকে দেখি, তখন অখণ্ড অমৃতকে পাই, তখন দুঃখ চলিয়া যায়। তুলসীদাসের রামায়ণে অর্থের অমৃত শব্দের ধণ্ডতাকে পূর্ণ করিয়া দেখাইতেছে। সেই পূর্ণটিকে দেখাই তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িবার চরম উদ্দেশ্য—যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে ততক্ষণ প্রত্যেক শব্দই কেবল আমাদিগকে দুঃখ দিবে। ততক্ষণ পাঠকের মন কেবলই বলিতে থাকিবে, অবিশ্রাম শব্দের পর শব্দ লইয়া আমি কী করিব—অমৃত যদি না পাই তবে ইহাতে আমার কিসের প্রয়োজন।

আমাদেরও সেই কাল। আমরা যখন কেবলই অসুস্থীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হইয়া আমাদিগকে কষ্ট দেয়—একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগ করিয়া যখন তাহাকে দেখি তখনই তাহার সমস্ত বার্তা দূর হইয়া যায়। তখন প্রতিপদেই আমাদিগকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন মৃত্যুই আমাদের কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। তখন এক অখণ্ড অমৃতে জগৎকে এবং জীবনকে আশ্রয় পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদের সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান হয়। তখন সা রি গা মা-র অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মরি না—রাগিণীর পরিপূর্ণ রসের সমগ্রতায় নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় লাভ করি।

পৃথিবী জুড়িয়া নানা দেশে নানা কালে নানা জাতির নানা ইতিহাসে মানুষ এই রাগিণী শিখিতেছে। যে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে বিশ্বজগৎ নব নব তানের মতো কেবলই আকাশ হইতে আকাশে বিস্তীর্ণ হইতেছে—সেই আনন্দ-রাগিণী মানুষ সাধিতেছে। গুস্তাদের ঘরে তাহার জন্ম, পিতার কাছে তাহার শিক্ষা। পিতার অনাদি বীণাযন্ত্রের সঙ্গে সে সুর মিলাইতেছে। সেই একের সুরে যতই তাহার সুর মিলিতে থাকে, সেই একের আনন্দে যতই তাহার আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে, বহুর তানমানের মধ্যে ততই তাহার বিয় কাটিয়া যায়, দুঃখ দূর হয়—বহুকে ততই সে আনন্দের লীলা বলিয়া দেখে; বহুর মধ্যে তাহার ক্লাস্তি আর থাকে না, সমস্তের সামঞ্জস্যকে সে একের মধ্যে লাভ করিয়া বিবেকের হাত হইতে রক্ষা পায়। ধর্ম সেই সংগীতশালা যেখানে পিতা তাহার পুত্রকে গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মার সুর সঞ্চারিত হইতেছে। এই সংগীতশালা যে সর্বত্রই সংগীত পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিতেছে তাহা নহে। সুর মিলিতেছে না, তাল কাটিয়া যাইতেছে; এই বেসুর বেতালকে সুরে তালে সংশোধন করিয়া লইবার ছুঃখ অত্যন্ত কঠোর; সেই কঠোর ছুঃখে কতবার তার ছিঁড়িয়া যার, আবার তার সারিয়া লইতে হয়। সকলের এক রকমের ভুল নহে, সকলের একজাতীয় বাধা নহে, কাহারও বা সুরে দোষ আছে, কাহারও বা তালে, কেহ বা সুর তাল উভয়েই কাঁচা; এইজন্য সাধনা স্বভাব। কিন্তু লক্ষ্য একই। সকলকেই সেই এক বিপুল সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া, এক বিপুল রাগিণী আলাপ করিয়া, এক বিপুল আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, যেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গিয়া যোগের সার্বকতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

## ধর্মশিক্ষা

বালকবালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এ তর্ক আজকাল খ্রীষ্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজে এই ধর্মশিক্ষার কিরূপ আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্মসম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে, ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয় অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উষ্টটুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করি।

সস্তা জিনিস পৃথিবীতে অনেক আছে তাহাদিগকে অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায় কিন্তু মূল্যবান জিনিস কী করিয়া বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি সিঁধ কাটিবার বা জাল করিবার পরামর্শ চাহে; সে জানে উপার্জনের বড়ো রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড়ো রাস্তাটা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহাজনি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তার চলিবার মতো সময় দিতে বা পাতের খরচ করিতে সে রাজি নহে।



তাই ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে আমরা সত্যই কিরূপ পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একটু ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ, গীতার বলিয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা যেকোনো ভাষার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কী? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন বাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে, তাহাকে বেশি কিছু নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই পূর্ণভাবে সকল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন ধর্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাসগ্রহণের মতোই সহজ। তবে কিনা যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনই মানুষ বলে আমার নিশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজে যখন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জল হয়, তখন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্মের জন্ত সকলের চেয়ে বড়ো ত্যাগ করিতে থাকে—তখন ধর্মের জন্ত মানুষের চেষ্টা চারিদিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে—তখন দেশের ধর্মমন্দির ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে—তখন ধর্ম যে কত বড়ো জিনিস তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্ত কোনো প্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্মসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এরূপ সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবন-যাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মজীরা বলিয়া যতই মন্ত্রণা করুক না কেন ধর্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে অস্তরের দিকে বিস্মৃতি আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কী নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না—বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মস্ততা দিনরাত্রি আমাদের দোঁড় করাইতেছে। এমন কি, আমাদের ধর্মসমাজসম্বন্ধীয় চেষ্টাগুলিও নিরন্তর ব্যস্ততাময় উদ্ভেজনা-পরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অস্তরের দিকে একটুও তাকাইবার

যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকাবিস্তীর্ণ নদীর মতো — সেখানে অগভীর ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিত্যসঙ্গ একপাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে ; তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না । আমরা নবযুগের মাছুষ, আমাদের জীবনযাত্রায় সরলতা নাই ; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও অত্যন্ত প্রবল ; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র । এমন কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন ।

এইরূপে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এককোণে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা কী করিয়া অঙ্গমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি তবে সেই উদ্বিগ্ন অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন । তবু, বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে । অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই ।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল । তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শাস্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না । এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিজ্ঞা ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না ; তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল । সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন । তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ, শিক্ষার্থীও ছিল অল্প, এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ । এই কারণে শিক্ষাসমস্তা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল ।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে । রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে বিজ্ঞার শাখা-প্রশাখাও চারিদিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে । এখন কেবল ধর্মযাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না ।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না । তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে । কিন্তু সমস্ত যুরোপখণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদ-



সাধনের জন্য ভূমূল চেপ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিজ্ঞাকে পালন করিয়া আসিয়াছে, পরে তাহারাই সে বিজ্ঞাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ বিজ্ঞা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারিদিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাসসম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিদিকনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রাঙ্কশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিজ্ঞাহী বিজ্ঞা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে ;—উভয়ের এক অঙ্গে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে, কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশ্বাস দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্থায়ঃ সর্বজ্ঞ দেবতার সীলমোহরের স্বাক্ষর আছে এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে—উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিজ্ঞাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় যুটতাকে নয় কপটতাকে প্রদ্রব্য দেওয়া হয়।

প্রথম কিছুদিন মারিয়া কাটিয়া বাধিয়া পুড়াইয়া একঘরে করিয়া বিজ্ঞার দলকে চিরকেন্দ্রে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার পুরাতন বুলি বলাইবার জন্য ধর্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কিন্তু বিজ্ঞার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই ক্ষুণ্ণতিক্ষুণ্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। এখন এমন একটা অস্বাভাবিক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে বর্তমান কালে যুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পশ্চাত্যদেশে প্রায় সর্বত্রই বিজ্ঞাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সম্মানদিককে বিনা ধর্মশিক্ষার মানুষ করিয়া তোলা ভালো ভালো কি মন্দ সে তর্ক কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্তা ক্রমশই ছুঁহু হইয়া উঠিতেছে।

কেমনা বিদ্যালয়দ্বারা দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ আমাদের দেশেও সৃষ্টিতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিজ্ঞাই পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে, কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পৃথক্ করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনই আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মোচাৰ্ঘ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনই তাহারা বিপদকে উপস্থিতমতো ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বন্ধমূল করিয়া দেন। কারণ বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে চিরদিন মকদ্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ অবতার যে সত্যসত্যই বরাহবিশেষ নহে তাহা ভূকম্পশক্তির রূপকমাত্র এ কথা বলাও যা আর ধর্মবিশ্বাসের শাস্ত্রীয় ভিত্তিকে কোনোপ্রকারে ভঙ্গতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনো মতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অল্প শিক্ষার প্রাণাত্মিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতেছেই। এই জন্ত এ দেশে হিন্দু-বিদ্যালয়সম্বন্ধীয় নূতন যে সকল উদ্যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিন্তা এই যে, বিদ্যালয়দ্বারা মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করিয়া।

আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সর্বাত্মক আদর্শের সহিত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই; যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথায়থরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে স্ফূর্ত করিয়া তোলা মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয় তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে এইরূপ বাধা ধর্মশাস্ত্রের একটা পুৰিধা আছে। ধর্মসম্বন্ধে বালকদিগকে কী শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব তাহা লইয়া বেশি কিছু ভাবিতে হয় না, তাহাদের বুদ্ধিবিচারকে উদ্বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, না করারই প্রয়োজন হয়; কতকগুলি নির্দিষ্ট মত কাহিনী ও আচারকে এবং সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বন্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে যে সমস্ত দাঁড়াইয়াছে তাঁহা এইখানেই। আমরা মানুষের মনকে বাধিব কী দিয়া? তাহাকে ব্যাপৃত করিব কিরূপে, তাহাকে আকর্ষণ করিব কী উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টি বর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই তেমনি কেবলমাত্র ধর্মবক্তৃতায় যদি বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একটু ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়, মধ্যাহ্নের পিপাসায়, গৃহদাহের ছবিপাকে তাহাকে ধুঁজিয়া পাই না। তা ছাড়া মন জিনিগটা কতকটা জলের মতো, তাহাকে কেবল একদিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আটপেঠে বাধিয়া ধরিবার বাধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি ছেলের মন যে আজগা হইয়া বসিয়া বসিয়া বাইতেছে। তথাপি এই প্রকার অনির্দিষ্টতার যে অনুবিধা আছে তাহা আমাদের স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতি-নির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব একটি বিশেষ ফিলজফি বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু বৈত, কতটুকু অবৈত, কতটুকু বৈতাবৈত; ইহার মধ্যে শংকরের প্রভাব কতটা, কতটা কাণ্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মতো ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে, উহা ধর্মই নহে উহা একটা ফিলজফি মাত্র; ইহারা সেই কলঙ্কেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মেরই ন্যায় ভক্তের জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্সটবুক কমিটির সংকলিত সামগ্রী নহে এবং ইহা গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো দপ্তরের হাতে মজবুত করিয়া বাধাই হইয়া যায় নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা বাড়িবে, তাহা চলিবে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনই কিন্তু একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই রহস্যকে যদি অনির্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর, তবে ইহাকে



জাঁতায় ফেলিয়া পেষ—ইহার জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেল। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন ব্রাহ্মধর্ম কোনো একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবনউৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ভোবা নহে, বাধানো সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী - তাহার রূপ প্রবহমান রূপ তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে,—নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাধাইয়া দিতে থাকিবে, - কিন্তু সে সকল ঘাটকেও তাহা বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিবে—কোনো স্পর্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দর্শনতত্ত্ব এই ধর্মকে একেবারে বাধিয়া ফেলিবার জ্ঞান যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোট্টে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? তাহা একটা মোটা কথা, তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অস্ত্র পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আসল কথা এই যে রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোট্টো করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব মোচনের জ্ঞান নিয়ত যে গৃঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মানুষ যতবারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোট্টো করিয়া আপনার সুবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রহি বাধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অদ্ভুত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলটিকে সর্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সুবিধা করিতে গিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বপ্ন বটে কিন্তু মানুষ এমন কাজ করিয়া থাকে। আইভিয়াকে সহজসাধ্য করিবার জ্ঞান সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া লয় ইহাতে মুণ্ডটাকে করতলমণ্ডল আমলকবৎ আরক্ত করা যায় বটে কিন্তু প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে।

এইরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়ে। এক দল আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিক্তি মনে করে—আর এক দল ইহাদের খেলার বিষয় না করিয়া অভিনূরে নিভৃত্তে গিয়া আপনার সাধনার বিস্তৃতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়া কখনোই চিরদিন চলে না। যখন চারিদিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে ধারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠে। এদেশে একদিন যখন রাসীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল; মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতধা করিয়া তুলিয়াছিল; মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম; বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম; উন্নতির দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভাবিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মত্ততন্ত্র তাগাতাবিজ্ঞ শাস্তিস্বস্ত্যয়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এইরূপে যখন চিন্তায় ভীকতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে যুততা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল—সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীব প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাহারা জাগিয়া উঠিলেন তাহারা একমুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার এই জড়তা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিধিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মজলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও বা সে



নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্তৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিন্যতির গভীর তলদেশে হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্ভোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্তই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন বায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিন্তা পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাঁহার মূল প্রেরণা নহে— ব্রাহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে, সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেই জন্তই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেই জন্ত কেবল যে তিনি স্বদেশের চিন্তাশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়া- ছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে, আরম্ভে এবং আজ পর্যন্ত এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতত্ত্ব বা পূজা-পদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্ত-বোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি—ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলোচনার পূর্বে আমরা কাহাকে ধর্ম বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা স্থির জানিতে হইবে যে, বীধা বচন মুখস্থ করা বা বীধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নহে। অতএব ইহার যে অপূর্ণবিধা আছে তাহা আমাদের কাছে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অগ্ন্যান্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মে অগ্নি প্রণালীতে কতকগুলি সহজ প্ৰয়োগ আছে এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদের কাছে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে যে ধূলা সহজ!

যাহা হউক এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম-তেমনি মানুষের সমগ্র-প্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকা পরসার মতো হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আত্মকুলোর দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্তের বোধকে তাহার এই ধর্ম-প্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মতো ইস্কুল-কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না; ইন্স্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরিমাণ ধরা পড়ে না, এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্ক দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্বপ্রকার অত্মকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাধা নিয়মে বিভাগে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ, “ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।” অর্থাৎ এটা কোনোমতেই পঠন পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদের কাছে বলিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, বেদাহমেতম্, আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন, য এতদ্বিত্বমুতান্তে ভবন্তি যাহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অস্বরস্বত যে, তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরূপ তর্কই থাকিত না।

অথচ ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করা যাইতে পারে একরূপ প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাধা প্রশংসার উপদেশ দিয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। একদিকে যেমন একদল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, চিন্তকে শুদ্ধ করো, পাপকে দমন করো, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী, অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেষ্টায় উদ্বোধিত করিয়া তোলো, অপরদিকে তেমনি আর এক দল বিশেষ বিশেষ বাহ্যপ্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহবা বলেন, যজ্ঞ করো, কেহবা বলেন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মূর্তিকে ধ্যান করো, এমন কি, কেহ বা বলেন মাদক পদার্থের দ্বারা অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে ভাঙনা করিয়া ক্ষণবেগে সিদ্ধি-লাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

এমনি করিয়া যখনই চেষ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনই প্রমাদের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখনই মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, কল্পনাকে সংযত করা অসাধ্য হয়, তখনই মানুষের বিশ্বাসমুগ্ধতা লুপ্ত হইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মানুষ আপনাকে ভোলায়, অন্তকে ভোলায়;

সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া ধর্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মূঢ়তায় একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

অথচ যাহারা এইরূপ উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিস, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর এক জিনিস।

মনে করো আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য ; আমাকে যদি কোনো বেচারী অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রার্থ করে তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনাদুঃখে হজম করিতে পার তবে আমি হয়তো সরল বিশ্বাসে তাহাকে বলিয়া দিতে পারি যে আহারের পর আমি দুই বগু কাঁচা পুপারি মুখে দিয়া বর্মাদেশজাত একটা করিয়া আন্ত চুক্রট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া যায়। আসলে আমি যে এতৎসম্বন্ধে হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না ; এমন কি, যে অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি কোনো দিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, আজ বুঝি পাকযন্ত্রটা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।

শুনা যায় কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জার্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয়তো একটা উদ্বেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত আপনি কী করিয়া এমন ভালো কবিতা লেখেন তবে তিনি আর কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ওই পচা আপেলটাকেই হয়তো উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড়ো কবি হউন না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিত্বচর্চার উপায় সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এমন কথা নাই। এরূপস্থলে তাঁহাকে যদি মুখের সামনে বলি তুমি কবিতাই লিখিতে পার তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কী জান, তবে তাঁহাকে কবি হিসাবে অশ্রদ্ধা করা হয় না। বস্তুত স্বাভাবিক প্রতিভাবশতই যাহারা কোনো একটা জিনিস পায় পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই সকল অভ্যাসমাত্রেরই যে শক্তির সঞ্চার করে তাহা নহে ; এমন কি, তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদুর্বল করিয়া রাখে। অনেক মহাপুরুষ এইরূপ দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন,



আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগুলি এই সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা সকল সময়ে নিজেরাও বুঝেন না, এবং কখনো বা মনে করেন এখন আমার পক্ষে এই সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহুল্য হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহার ফল হয় এই, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগুলিকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে আমরা সার্থকতালাভ করিয়াছি; তাহারা অহংকৃত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না, কারণ, তাহাদের কাছে এই সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে সকল জিনিসের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে, অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিক আবহুকুল্য আছে। ধর্মবোধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো একটা সাম্প্রদায়িক ক্যান্ডিডান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক এ কথা আমাদেরকে স্বীকার করিতেই হইবে; অর্থাৎ চারিদিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিন্তা বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই আবহুকুল্য অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাৎ সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্থামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্য ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকল প্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্কিতে তৌল না করিয়া, ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিত-ভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথা বলিলেই বা চলিবে কেন? এ সব দুর্লভ জিনিস তো আবশ্যক বুঝিয়া করমাশ দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশ্যকতা যদি

ধাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি, আমরা চেষ্টা করিতেছি। আমরা বাহা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যখনই বলিতেছি ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দ্র একটা যথার্থ আশ্রয় যথার্থভাবে পাইতেছে না তখনই সে জিনিসটা যে কেমনতরো হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাই না আমরা আশ্রয় চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রয়। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন কি কোনো একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে শাস্ত্রঃ শিবমহৈতম্ বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, স্ত্রীকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের ক্রাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকল প্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি যাহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাঙ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালোবাসেন তাহারা বলিবেন, এটা তো এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যযুগের Monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেলা হয়, ইহাতে, মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।

অন্য কোনো এককালে যে জিনিসটা ছিল এবং বাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্বরদের ধনুর্বাণ যতই মনোহর হউক তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভ্যযুগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভ্যযুগে যদি বা অনাদৃত হয় কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রবৃত্তিটা তো আছে। তাহা যতক্ষণ লুপ্ত না হয় ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুদ্ধ-ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব যুদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উলটা রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এখনও সকালেরই মতো সৈন্য লইয়া দল বাধিতে এবং দুইপক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।



মাহুষের মনের যে ইচ্ছা পূর্বে একদিন ধর্মসাধন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও অনেকটা সেই পূর্ব আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন আশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।

অথচ আমরা অস্বীকার করিতে অনেক জিনিস গ্রহণ করি যাহার সংগতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্তমানকালীন তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্তমান তাহা যে আমার বর্তমান নহে সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এই জন্যই যদি বলা যায় আমরা যথাসম্ভব গির্জার মতো একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব তবে আমাদের মনে মনে এই একটা সঙ্কল্প আসে যে আমরা বর্তমানের সঙ্গে ঠিক ভাল রাখিয়া চলিতেছি—অথচ গির্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে সকল ব্যবস্থা আমাদের স্বদেশীয়, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি—“না, ইহা চলিবে না। ইহা মতাবুন্ নহে।” মনের এমন অবস্থা মাহুষের যখন জন্মায় তখন সে আধুনিকতা নামক অপক্লপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলি বাধা মস্তকে কানে লয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া উর্ক করিতেছি না। আপনারা সকলেই জানেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়াতলে যেখানে একদিন তাঁহার নিভৃত সাধনার বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি ছিল তাহা নহে, ইহার প্রতি তাঁহার একটি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই স্থান প্রায় শূন্যই পড়িয়া ছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা তিনি চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল

তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মাহুষ করিয়া তুলিবার ভারই—এই আশ্রমের উপর। কারণ, যা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর এক দিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইন্সুলের বিদ্যা নহে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস একটি অমৃতরস অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষধের মতো কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না আমি এখানে কোনো অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মাহুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনও নিযুক্ত আছে তাহা এখানকার সর্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানাবিধ প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড়ো সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে যতদিন পর্যন্ত মনে করিয়াছিলাম, আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব আমরাই তাহাদের উপকার করিব, ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিয়াছি। ততদিন যত যত্নই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যত্নই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনও যত্ন গড়িবার উৎসাহ আমাদের একেবারে যায় নাই, কেননা এখনও ভিতরের জিনিসটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে হইবে; আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি; এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন; এখানে গুরুশিষ্য সকলেই একই ইন্সুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভরতি হইয়াছি; তখন হইতে কল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃঙ্খলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনও আমাদের যাহা কিছু নিষ্ফলতা সে এখানেই—যেখানেই আমরা মনে করি আমরা দিব অন্নে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের

এবং আমরা তাহার চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না, সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্তের স্বর্কে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করি।

নিজের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একথা আমাদের বিশেষভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্তকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, অন্তকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্তের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো ; তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইচ্ছা নাই, তাহার আশ্রম আছে,—যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অন্তরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিসটিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানব-সমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল, সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হুংপিঙের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে তবে পূর্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্মজীবনের শতদল পদ্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই প্রজ্ঞা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া থাকি অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও ধ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা, তাহা আমাদের মনে খুবই উচ্চ হইয়া আছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চ স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসঙ্গেও একথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব সেই আশ্রমের যে



আহ্বান তাহা সেই শাস্ত্রম্ শিবমধৈতম্ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি না কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গল-শব্দধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগভীর স্বরভরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে, এবং সেখানকার নির্মল আকাশের রঞ্জে রঞ্জে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অঙ্ককারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গেকিয়া পরিয়া মাথায় তিলক কাটিয়া আসিবেন না—তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমন-বার্তা জানিতেও পারিব না।—কিন্তু ইতিমধ্যে ওই যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। এই ভূমার আহ্বানের একেবারেই মাঝখানে আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে। সেই একাগ্র ধনি তাহাদের বিমুখ কর্ণের বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে। সে তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা একহিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ ভরজিত জনতাসমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক একটি রবিনসন ক্রুসোর মতো আপনার ফ্রাইডেটিকে লইয়া নিরালস্য দিন কাটাইতে থাকেন। এতবড়ো জনময় নির্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু এক-শ দু-শ মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জন বাস বলা চলে না। এই যে এক-শ দু-শ মানুষ ইহারা দুবের মানুষ নহে; ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গে লইলাম আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দাঁড় করিলাম এমনটি হইবার জো নাই; এই এক-শ দু-শ মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও

চিন্তা করিতে হইবে ; ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে আপনায় করিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাঁইয়া শৌখিন শাস্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা ?

আমার সেই বন্ধু হয়তো বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও—কিন্তু সংসারে যেখানে চারিদিকেই ভালো-মন্দর ভরজ কেবলই উঠা-পড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া ? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ—আর বারবার অতি ধরে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আভর একটা নবাবি জিনিস।

হায়, সাধুতার এই নিষ্কণ্টক আভরটি কোন্ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। কাব্যে পুরাণে সর্বত্রই তপোবনের আদর্শটি অতুল্যবর্ণনার বিরাজ করে কিন্তু তবু সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহুতর মুনীনাঞ্চ মত্তিলমঃ ঘন ঘন উকি মারিতেছে। মানুষের আদর্শও যেমন সত্য, সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনি সত্য—যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে, চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি, সেখানে লোকালয়ের অন্ত বিভাগেরই মতো মন্দের জন্ত সিংহদ্বার খোলাই আছে। শরতানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না—সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাকলা এবং অহং-পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না—কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপস করিয়া মিলিয়া-মিশিয়াই থাকে—এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কী ? বন্ধুরা বলিবেন, যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালয়ের চেয়ে কম না হইয়া বরঞ্চ বেশিই হয় এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া কেলিবার আশা না করিতে পার এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মতো মাঝারি রকমেরই মানুষ হন তবে সেই প্রকার স্থানই যে বালক-বালিকাদের ধর্মশিক্ষার অল্পকূল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে ?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই,—কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম



করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে— কারণ আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতার সন্মুখ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নমূলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থলদেহধারীর সঙ্গেই তাহার স্থল দেহের ঐক্য আছে একথা আমি বারংবার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম আয়ুগাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই, যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ—তাহা বাসনার দিকে নয় সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি বা পাকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে, সে আপনাকে যদি বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইতে চাহিতেছে; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের উর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু কেনই বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব? কেনই বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে যে ভাবটি ভরিয়া উঠে তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ, শুদ্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি—তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারি একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য এমন সূন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমালিপ্ত আকাশের নিচে জন্মগ্রহণ করি নাই, লীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে তো ক্রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বন্ধ করে নাই; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না; সূর্যোদয় যে ভক্তির পূজাঞ্জলির মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয়; কী উদার নদীর ধারা, কী নির্জন গভীর তাহার প্রসারিত তট; অব্যবহিত মাঠ ক্ষেত্রের যোগাসনের মতো স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মতো তাহার দিগন্তজোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর

লক্ষ্য করা যাইতেছে না ; এখানে তরুতল আমাদেরকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদেরকে আশ্রয় করে, আতপ্তবায়ু আমাদেরকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে ; আমাদের দেশে এ সমস্তই যে সত্য, চিরকালের সত্য ;—পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল—তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না ? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে ? আমরাই তো জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিন্তের বোধকে সর্বাত্মক, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি বাহ্য রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিরন্তর অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে—সেইজন্যই অনন্তের বাণীর সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্বানে আহায়ে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অস্ত নাই । সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে—আমাদের কাব্যপুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে—সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব । না হয় আজ যেকালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিতেছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কলুষ লাগাইয়া দিলেন ? না হয়, আমরা কয়জন এই শহরের পোস্তপুত্র হইয়া তাহার পথের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি কিন্তু যে যাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্রামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন ? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মজলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না ।

শাস্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে অতএব তাহার সকলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা আমার নিবন্ধিহীন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন । সেই আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি

আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম ; কারণ আত্মমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনয়ে অধচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনো প্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে, সাময়িক বদ্ধতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন সকল আশ্রমের প্রয়োজন, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্বাভাবিক ; যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিতাই মানুষের মনকে স্কন্ধ করিতেছে না ; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে ; কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্য-বুদ্ধিকে ধণ্ডিত না করিয়া যেখানে, বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে ; যেখানে পরম্পরের প্রতি ব্যবহারে প্রকার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনার উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত্র স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না, এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে ; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে,—তাহারা নানা প্রকারে কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।



## ধর্মের অধিকার

যে-সকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আশ্রয় অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়ো—অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেই-খানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এই জন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্মের মধ্যে যাহা গুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠে, বলিয়া বসে এসব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড়ো বড়ো কাজের কথা কালের স্রোতে বুবুদের মতো কেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে কাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অসম্ভবীয়ই সত্য হইল, বুদ্ধিমানের মন্তব্য নহে কিন্তু পাগলের পাগলামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বাহিরে, তাহার চিন্তার কর্মে, তাহার দর্শনে সাহিত্যে কত নব নব সৃষ্টিকলাপ করিয়া চলিল তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেইসকল অদ্ভুত কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরও অমর হইয়া উঠে, তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জল হয়, তাহাকে পুতিয়া ফেলিলে সে অকুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে সবলে বাধা দিতে গিয়াই আরও নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হয়—এবং যেন মস্তুর বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের অগোচরে, এমন কি, নিজের অনিচ্ছায়, সেই সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রং বদল হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর কিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটা কোনো বাধায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহাই তাহার চরম আশ্রয়, এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রকে প্রত্যেকে একেবারে নিশ্চিন্তরূপে পাকা করিয়া সনাতন বালা ঝাধিবার চেষ্টা করিয়াছে—সেইখানেই মহাপুরুষেরা আসিয়া গতি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন—বলিয়াছেন, পথ এখনও বাকি, পাথর এখনও শেষ হয় নাই, যে অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমার চরমলোক সে তোমাদের এই মিত্রের হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্মিত হয় না বিকলিত হয়, সঞ্চিত

হয় না সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কার্যকার্য নহে তাহা অক্ষয় জীবনের অক্লান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য, কেননা আমি দুর্বল আমি প্রান্ত; তাঁহারা বলেন এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, তুমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্স্থান নাই।

যে ব্যক্তি ছোটো সে বিশ্বসংসারকে অসংখ্য বাধার রাজ্য বলিয়াই জানে, বাধামাত্রই তাহার দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে ও তাহার আশাকে প্রতিহত করিয়া দেয় এই জন্ত সে সত্যকে জানে না, বাধাকেই সত্য বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি বড়ো তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারেই সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটোর সঙ্গে বড়োর কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনও তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্মং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাপ।

সমস্ত অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতেছি যিনি মহান্ পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ময়। এইজন্য যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, অধর্মই আমাকে বাঁচাইতে পারে এই মনে করিয়া হাজার হাজার লোক জালজালিয়াতি মারামারি কাড়াকাড়ির দিকে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে তখনও তাঁহারা অসংকোচে এমন কথা বলেন যে, স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্ত জায়তে মহতো ভয়াৎ—অতি অল্পমাত্র ধর্মও মহাভয় হইতে ভ্রাণ করিতে পারে; যখন দেখা যাইতেছে সংকর্ম পদে পদে বাধাগ্রস্ত, তাহা মৃত্যুর অড়ভুপুঞ্জ প্রতিহত, প্রবলের অত্যাচারে প্রণীড়িত, বাহিরে তাহার দারিদ্র্য সর্বপ্রকারেই প্রত্যক্ষ তখনও তাঁহারা অসংশয়ে বলেন, সর্বপরিমাণ বিশ্বাস পর্বতপরিমাণ বাধাকে জয় করিতে পারে। তাঁহারা কিছুমাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না, মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো করিয়া ধরেন না; তাঁহারা অসত্যের আশ্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে—এবং সংসারকেই যে-সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া পাক খাইয়া কিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন—সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি সত্যকে তাহার চেয়েও তাঁহারাই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাহারা বড়ো হইয়া জন্মিয়াছেন।

তাঁহাদের বাহা অনুশাসন তাহাও শুনিতে অত্যন্ত অসম্ভব। সংসারে যে লোকটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখে এ পরামর্শটি নিতান্ত সহজ নহে কিন্তু এখানেই তাঁহারা দাঁড়ি টানেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন আপনার মতো করিয়াই সকলকে দেখো। তাহার কারণ এই আত্মপরের ভেদ যেখানে সেইখানেই তাঁহাদের দৃষ্টি ঠেকিয়া যায় নাই



আত্মপরের মিল যেখানে সেইখানেই তাঁহারা বিহার করিতেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করিবে একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন শত্রুকেও প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ এই প্রেমের মধ্যেই তাঁহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, এইজন্য স্বভাবতই সে-পর্যন্ত না গিয়া তাঁহারা থামিতে পারেন না। ভূমি বড়ো হও, ভালো হও এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—

পরবৎ তুম্মরো ভবেৎ ।

পর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যার তেমনি করিয়া তুম্মর হইয়া ত্রুক্ষের মধ্যে প্রবেশ করো। ত্রুক্ষই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটার অস্তবদেবান্ত তদ্ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপমৃত হয়, স কৃপণঃ—সে কৃপাপাত্র।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাহারা সকলের বড়ো তাঁহারা সেইখানকার কথাই বলিতেছেন যাহা সকলের চরম। কোনো প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সে সত্যকে তাঁহারা ছোটো করেন না। সেই চরম লক্ষ্যকেই অসংশয়ে সুস্পষ্টরূপে সকল সত্যের পরম সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মানুষকে আত্ম-অবিশ্বাসী ও ভীত করিয়া রাখা হয়; বাধার ওপারে যে সত্য আছে তাহার কথাই তাহাকে বড়ো করিয়া না শুনাইয়া বাধাটার উপরেই যদি কোঁক দেওয়া হয় তবে সে অবস্থায় মানুষ সেই বাধার সঙ্গেই আপস করিয়াই বাসা বাঁধে এবং সত্যকেই আয়ত্তের অতীত বলিয়া ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু মানবগুণগণ যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাই মানুষের সত্য। যেমনি লোভ হইবে অমনি কাড়িয়া খাইবে মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি আছে সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তবু ইহাকে আমরা মানুষের ধর্ম অর্থাৎ মানুষের সত্যকার স্বভাব বলি না। লোভ হইলেও লোভ দমন করিবে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে না, একথা বলিলেও কম বলা হয় না—কিন্তু তবু এখানেও মানুষ থামিতে পারে না। সে বলিয়াছে, ক্ষুধিতকে নিজের অন্ন দান করিবে, ইহাই মানুষের ধর্ম, ইহাই মানুষের পুণ্য, অর্থাৎ তাহার পূর্ণতা। অথচ লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজনদরে মানুষের ধর্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন পরকে দান

করা মানুষের ধর্ম নহে ; কেননা অনেক-লোকই পরের অন্ন কাড়িবার বাধাহীন সুযোগ পাইলে নিজেকে সার্থক মনে করে । তবু আজ পর্যন্ত মানুষ একথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে দয়াই ধর্ম, দানই পুণ্য ।

কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা সত্য মানুষের পক্ষে তাহাই যে সহজ তাহা নহে । তবেই দেখা যাইতেছে সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ আরাম পাইতে চায় না, এবং যে-কোনো দুর্বলচিত্ত সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়াছে এবং ধর্মকে আপনার সুবিধামত সহজ করিয়া লইয়াছে তাহার আর দুর্গতির অস্ত থাকে না । আপন ধর্মের পক্ষে মানুষ বলিয়াছে—সুরস্র ধারা নিশিতা দুর্ভাগ্যা দুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি । দুঃখকে মানুষ মনুষ্যত্বের বাহন বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং সুখকেই সে সুখ বলে নাই, বলিয়াছে—ভূমৈব সুখম্ ।

এই জন্মই এই বড়ো একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় যে, যাহারা মানুষকে অসাধ্য-সাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মতো নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে । তাহার কারণ মহত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম ; সে মুখে যাহাই বলুক শেষকালে দেখা যায় সে বড়োকেই যথার্থ বিশ্বাস করে । সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই ; অসাধ্য-সাধনকেই সে সত্য সাধনা বলিয়া জানে ; সেই পথের পথিককেই সে সর্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না ।

যাহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন । তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না । বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে—তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস ; সেটাকে মায়া বলিলেই হয় । এই জন্ম তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে । তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখে ভয় তাহাকে ভয় দেখাইতেছে না, দুঃখ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না, বাধা তাহাকে পরাভূত করিতেছে না, এমন কি, নিষ্ফলতাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না । তখন সে হঠাৎ দেখিতে পায় ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, ক্লেশ তাহার পক্ষে আনন্দময়, এবং মৃত্যু তাহার পক্ষে অমৃতের সোপান ।

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার কালে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মানুষের মনে কামনা অত্যন্ত বেশি প্রবল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার চেয়েও প্রবল

পদার্থ আমাদের আছে ; সত্যের পিপাসা যদি আমাদের রিপূর চেয়ে প্রবলতর না হইত তবে আমাদের মধ্যে কেই বা ধর্মের পথে চলিতে পারিত।

মানুষের প্রতি এত বড়ো প্রকার কথা এত বড়ো আশার কথা সকলে বলিতে পারে না। কামনার আঘাতে মানুষ বারবার স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, কেবল ইহাই বড়ো করিয়া তাহার চোখে পড়ে যে ছোটো ; কিন্তু তৎসঙ্গেও সত্যের আকর্ষণে মানুষ যে পাশবতার দিক হইতে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে এইটাই বড়ো করিয়া দেখিতে পান তিনিই যিনি বড়ো। এই জন্য তিনিই মানুষকে বারংবার নির্ভয়ে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই মানুষের জন্য আশা করিতে পারেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটি শুনাইতে আসেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি কৃপণের ন্যায় মানুষকে ওজন করিয়া অল্পগ্রহ দান করেন না, এবং বলেন না তাহাই তাহার বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে যথেষ্ট,—প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তিনি আপন চিরজীবনের সর্বোচ্চ সাধনের ধন তাহার নিকট সম্পূর্ণ প্রকার সহিত উৎসর্গ করেন, জানেন সে তাহার যোগ্য। সে যে কত বড়ো যোগ্য তাহা সে নিজের তেমন করিয়া জানে না, তিনি যেমন করিয়া জানেন।

মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না—মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার। মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম খাড়া করো ; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের সাধ্য। মানুষের সমস্ত শক্তির উপরে তাহার দাবি করেন—কেননা সমস্ত অশক্তির পরিচয়কে অতিক্রম করিয়াও তাহার নিশ্চয়ই জানেন তাহার শক্তি আছে।

অতএব ধর্মই মানুষের প্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে। কোনো লোক রাজার ছেলে হইয়াও হয়তো আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে তবুও দেশের লোকের দিক হইতে একটা তাগিদ থাকা চাই। তাহার পৈতৃক গৌরব তাহাকে স্মরণ করাইতেই হইবে, তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে, এমন কি, তাহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে চাষা বলিয়া মিথ্যা ভুলাইয়া সমস্তকে দিব্য সহজ করিয়া দিলে চলিবে না ; সে চাষার মতো প্রত্যহ ব্যবহার করিলেও সত্য তাহার সম্মুখে স্থির রাখিতে হইবে। তেমনি ধর্ম কেবলই মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য ; ব্যবহারত মানুষের স্থলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চ ধরিয়া রাখিতেছে ; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না ; ইহাই তাহার সর্বপ্রধান কাজ।

ব্যাধি মানুষের শরীরের স্বভাব নহে তবু ব্যাধি মানুষকে ধরে। কিন্তু তখন



মানুষের শরীরের প্রকৃতি ভিতরের দিক হইতে ব্যাধিকে তাড়াইবার নানাপ্রকার উপায় করিতে থাকে। যতক্ষণ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ এই সংগ্রামে ভয় বেশি নাই কিন্তু যখন মস্তিষ্ককেই ব্যাধিশত্রু পরাভূত করে তখনই ব্যাধি সকলের চেয়ে নিদাক্ষণ হইয়া উঠে কারণ তখন বাহিরের দিক হইতে চিকিৎসকের চেষ্টা যতই প্রবল হউক ভিতরের দিকের শ্রেষ্ঠ সহায়টি দুর্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক যেমন শরীরে, ধর্ম তেমনি মানবসমাজে। এই ধর্মের আদর্শই নিয়ত ভিতরে ভিতরে মানবপ্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে কিন্তু যে পরম দুর্দিনে এই ধর্মের আদর্শকেই বিকৃতি আক্রমণ করে সেদিন বাহিরের নিয়ম সংযম আচার অভ্যুত্থান পুলিশ ও রাষ্ট্রবিধি যতই প্রবল হউক না কেন সমাজপ্রকৃতিকে দুর্গতি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? এই জন্ত দুর্বলতার দোহাই দিয়া ইচ্ছাপূর্বক ধর্মকে দুর্বল করার মতো আত্মঘাতকতা আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ, দুর্বলতার দিনেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় ধর্মের বল।

আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদাক্ষণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অভূত বিশ্বাস আমাদের কাছে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসংকোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্ত ধর্মকে ছাঁটিয়া ছোটো করিতে দোষ নাই, এমন কি, তাহাই কর্তব্য।

ধর্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এমন কথা কি বলা যায়? প্রয়োজন অনুসারে আমরা তাহাকে ছোটো বড়ো করিব! ধর্ম তো জীবনহীন জড় পদার্থ নহে; তাহার উপরে স্বরম্ভমতো অনায়াসে দরজির কাঁচি বা ছুতারের করাত তো চলে না। এ কথা তো কেহ বলে না যে, শিশুটি ক্ষুদ্র বলিয়া মাকেও চারিদিক হইতে কাটিয়া কম করিয়া ফেলো। মা তো শিশুর গায়ের জামার সঙ্গে তুলনীয় নহেন। প্রথমত মাকে কাটিতে গেলেই মারিয়া ফেলা হইবে, দ্বিতীয়ত অখণ্ড সমগ্র মাতাই বড়ো সন্তানের পক্ষে যেমন আবশ্যক ছোটো সন্তানটির পক্ষেও তেমনি আবশ্যক—তাহাকে কম করিলে বড়োও যেমন বঞ্চিত হইবে, ছোটোও তেমনি বঞ্চিত হইবে। ধর্ম কি মানুষের মাতার মতোই নহে?

আমি জানি আমাকে এই প্রশ্ন করা হইবে সকল মানুষেরই কি বুদ্ধি ও প্রকৃতি একই রকমের? সকলেই কি ধর্মকে একই ভাবে বোঝে? না, সকলের এক নহে; ছোটো বড়ো উঁচু নিচু জগতে আছে। অতএব সত্যকে আমরা সকলেই সমান দূর পর্যন্ত পাইয়াছি একথা বলিতে পারি না। আমাদের শক্তি পরিমিত; কিন্তু যতদূর বড়ো করিয়া সত্যকে পাইয়াছি তাহার চেয়েও সে ছোটো এ মিথ্যা কথা তো কণকালের জন্যও আমরা কাহারও খাতিরে বলিতে পারি না। গ্যালিলিও যে অ্যোডিকতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা তখনকার কালের প্রচলিত খ্রীষ্টানধর্মের সঙ্গে খাপ খায় নাই— তাই

বলিয়া একথা বলা কি শোভা পাইত যে, খ্রীষ্টান বেচারার পক্ষে মিথ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞাই সত্য? তাহাকে কি এই উপদেশ দেওয়া চলিত যে, তুমি খ্রীষ্টান অতএব তোমার উচিত তোমার উপযোগী একটা বিশেষ জ্যোতিষকেই একান্ত শ্রদ্ধার সহিত বরণ করা?

কিন্তু তাই বলিয়া গ্যালিলিওই কি জ্যোতিষের চরমে গিয়াছেন? তাহা নহে। তবুও তাহা সত্যের দিকে যাওয়া। সেখান হইতেও অগ্রসর হও কিন্তু কোনো কারণেই পিছু হটা আর চলিবে না; যদি হঠিতে থাকি তবে সত্যের উলটা দিকে চলা হইবে সুতরাং তাহার শাস্তি অবশ্যস্বাবী। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে একটিমাত্র লোকের বোধও যদি দেশের সকল লোকের বোধকে ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে তাহাই সমস্ত দেশের লোকের ধর্ম, কারণ তাহাই দেশের সর্বোচ্চ সত্য। অন্য লোকে তাহা গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব করিবে; কিন্তু তুমি যদি বুঝিয়া থাক তবে তোমাকে সকল লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে, ইহাই সত্য এবং ইহা সকল লোকেরই সত্য, কেবল একলা আমার সত্য নহে। কেহ যদি জড়ভাবে বলিতে থাকে ইহা আমি বুঝিতে পারিব না তবে তোমাকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কারণ ইহা সত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করাই মানুষের ধর্ম।

ইতিহাসে আমরা কী দেখিলাম? আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব যখন সত্যকে পাইয়াছি বলিয়া উপলক্ষ করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন আমার ভিতর দিয়া সমস্ত মানুষ এই সত্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তির পরিমাপ করিয়া সত্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিথ্যার খাদ মিশাইতে লাগিলেন না। তাঁহার মতো অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় এ কথা তিনি এক মুহূর্তের জ্ঞানও কল্পনা করেন নাই। অথচ সকল মানুষ তাহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, অনেকে তাহা বুদ্ধির দোষে বিকৃতও করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুণ্ণ করা কোনোমতেই চলে না—যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুষ আর না মানুষ, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সামনে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। বাপকে সকল ছেলে সমান শ্রদ্ধা করে না এবং অনেক ছেলে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াও থাকে তাই বলিয়া ছেলেদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া এমন কথা বলা চলে না যে, তোমার বাপ বায়ো আনা, তোমার বাপ সিকি, এবং তোমার বাপ বাপই নহে, তুমি একটা গাছের ডালকে বাপ বলিয়া গ্রহণ করো—এবং এইরূপে অধিকার ভেদে তোমরা বাপের সঙ্গে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে থাকো; তাহা হইলেই তোমাদের সম্মানধর্ম পালন করা হইবে। বস্তুত পিতার ভারতম্য নাই; তাঁহার সম্বন্ধে



সন্তানদের হৃদয়ের ও ব্যবহারের যদি তারতম্য থাকে তবে সেই অনুসারে তাহাদিগকে ভালো বলিব বা মন্দ বলিব, একথা কখনোই বলিব না ভূমি যখন এইটুকু মাত্র পার তখন এইটুকুই তোমার পক্ষে ভালো।

সকলেই জানেন যিশু যখন বাহ্যঅনুষ্ঠানপ্রধান ধর্মকে নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিক ধর্মের বার্তা ঘোষণা করিলেন তখন যিহুদিরা তাহা গ্রহণ করে নাই। তবু তিনি নিজের গুটিকয়েক অনুবর্তীমাত্রকেই লইয়া সত্যধর্মকে নিখিল মানবের ধর্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি একথা বলেন নাই, এ ধর্ম যাহারা বুঝিতে পারিতেছে তাহাদেরই, যাহারা পারিতেছে না তাহাদের নহে। মহান্নদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়েরা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম, তোমরা বাপ দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমাদের সত্য। তিনি এমন অদ্ভুত অসত্য বলেন নাই যে, যাহাকে দশজনে মিলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, যাহাকে দশজনে মিলিয়া পালন করা যায় তাহাই ধর্ম। একথা বলিলে উপস্থিত আপদ মিটিত কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।

একথা বলাই বাহুল্য, উপস্থিতমতো মানুষ যাহা পারে সেইখানেই তাহার সীমা নহে। তাহা যদি হইত তবে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ মউমাছির মতো একই রকম মউচাক তৈরি করিয়া চলিত। বস্তুত অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ নহে। আরও বেশি বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে ধূল্যমাটিপাথর। মানুষ কোনো একটা জায়গায় আসিয়া হাল ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া সীমাকে মানিতে চায় না বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের এই যে কেবলই আরও-র দিকে গতি, ভূমার দিকে টান এইখানেই তাহার শ্রেয়। এই শ্রেয়কে রক্ষা করিবার ইহাকে কেবলই স্মরণ করাইবার ভার তাহার ধর্মের প্রতি। এইজন্যই মানুষের চিন্তা তাহার কল্যাণকে যত সূদূর পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারে তত সূদূরেই আপনার ধর্মকে প্রহারের মতো বসাইয়া রাখিয়াছে—সেই মানবচেতনার একেবারে দিগন্তে দাঁড়াইয়া ধর্ম মানুষকে অনন্তের দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে।

মানুষের শক্তির মধ্যে দুটা দিক আছে, একটা দিকের নাম “পারে” এবং আর একটা দিকের নাম “পারিবে”। “পারে”র দিকটাই মানুষের সহজ, আর “পারিবে”র দিকটাতেই তাহার তপস্বী। ধর্ম মানুষের এই “পারিবে”র সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত “পারে”কে নিরন্তর টান দিতেছে তাহাকে বিজ্ঞান করিতে দিতেছে না, তাহাকে কোনো একটা উপস্থিত সামান্য লাভের মধ্যে সঙ্কট থাকিতে দিতেছে না।

এইরূপে মানুষের সমস্ত “পারে” যখন সেই “পারিবে”র দ্বারা অধিকৃত হইয়া সমুখের দিকে চলিতে থাকে তখনই মানুষ বীর—তখনই সে সত্যভাবে আত্মাকে লাভ করে। কিন্তু “পারিবে”র দিকে এই আকর্ষণ যাহারা সহিতে পারে না, যাহারা নিজেকে মূঢ় ও অক্ষম বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা ধর্মকে বলে আমি যেখানে আছি সেইখানে তুমিও নাথিয়া এস। তাহার পরে ধর্মকে একবার সেই সহজসাধ্যের সমতলক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারিলে তখন তাহাকে বড়ো বড়ো পাখর চাপা দিয়া অত্যন্ত সনাতনভাবে জীবিত সমাধি দিয়া রাখিতে চায় এবং মনে করে ফাঁকি দিয়া ধর্মকে পাইলাম এবং তাহাকে একেবারে ঘরের দরজার কাছে চিরকালের মতো বাধিয়া রাখিয়া পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিলাম। তাহারা ধর্মকে বন্দী করিয়া নিজেরাই অচল হইয়া বসে, ধর্মকে দুর্বল করিয়া নিজেরা হীনবীর হইয়া পড়ে, এবং ধর্মকে প্রাণহীন করিয়া নিজেরা পলে পলে মরিতে থাকে; তাহাদের সমাজ কেবলই বাহু আঁচारे অস্থিষ্ঠানে অস্থিসংস্থারে এবং কাল্পনিক বিভীষিকার কুজ্জ্বলিকার দশদিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুত ধর্ম যখন মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে বলে তখনই তাহা মানুষের বিরোধী হইয়া উঠে, আর যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনোমতে বন্ধুত্ব রাখিবার জন্য কানে কানে পরামর্শ দেয় যে তুমি যাহা পার তাহাই তোমার প্রের, অথবা দশজনে যাহা করিয়া আসিতেছে তাহাতেই নির্বিচারে যোগ দেওয়াই তোমার পুণ্য, ধর্ম তখন আমাদের প্রবৃত্তির চেয়েও নিচে নাথিয়া যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে এবং লোকাচারের সঙ্গে আপস করিয়া গলাগলি করিতে আসিলেই ধর্ম আপনার উপরের জায়গাটি আর রাখিতে পারে না; একেবারেই তাহার জাতি নষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে পুণ্যকে সত্তা করিবার জন্য বলিয়াছে, কোনো বিশেষ তিথিনক্ষত্রে কোনো বিশেষ জলের ধারায় স্নান করিলে কেবল নিজের নহে, বহুসংখ্য পূর্বপুরুষের সমস্ত পাপ ক্ষান্ত হইয়া যায়। পাপ দূর করিবার এতবড়ো সহজ উপায়ের কথাটা বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত লোভ হয় সন্দেহ নাই, সুতরাং মানুষ তাহার ধর্মশাস্ত্রের এই কথার আপনাকে কিছু-পরিমাণে ভুলায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলানো তাহার পক্ষেও অসাধ্য। একজন বিধবা রমণী একবার মধ্যরাত্রে চন্দ্রগ্রহণের পরে পীড়িত শরীর লইয়া যখন গঙ্গাস্নানে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে প্রের করিয়াছিলাম, “আপনি কি একথা সত্যই বিশ্বাস করিতে পারেন যে পাপ জিনিসটাকে ধূল্যামাটির মতো জল দিয়া ধুইয়া ফেলা সম্ভব? অথচ অকারণে আপনার শরীর-ধর্মের বিরুদ্ধে এই যে পাপ করিতে যাইতেছেন ইহার ফল কি

আপনাকে পাইতে হইবে না? তিনি বলিলেন, “বাবা, এ তো সহজ কথা, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বেশ বুঝি কিন্তু তবু ধর্ম যাহা বলে তাহা পালন না করিতে যে ভরসা পাই না।” একবার অর্থ এই যে, সেই রমণীর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের উপরে উঠিয়া আছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখো। একাদশীর দিনে বিধবাকে নির্জল উপবাস করিতে হইবে ইহা আমাদের দেশে লোকাচারসম্মত অথবা শাস্ত্রানুগত ধর্মশাসন। ইহার মধ্যে যে নিদাক্ষণ নিষ্ঠুরতা আছে স্বভাবত আমাদের প্রকৃতিতে তাহা বর্তমান নাই। একথা কখনোই সত্য নহে স্ত্রীলোককে ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িত করিতে আমরা সহজে দুঃখ পাই না। তবে কেন হতভাগিনীদিগকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দুঃখ দিই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আর কোনো যুক্তিসংগত উত্তর খুঁজিয়া পাই না, কেবল এই কথাই বলিতে হয় আমাদের ধর্মে বলে বিধবাদিগকে একাদশীর দিনে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিবে না, এমন কি, মরিবার মুখে রোগের ঔষধ পর্যন্ত সেবন করানো নিষেধ। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম আমাদের সহজবুদ্ধির চেয়ে অনেক নিচে নামিয়া গেছে।

ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ছেলেরা স্বভাবতই তাহাদের সহপাঠী বন্ধুদিগকে জাতিবর্ণ লইয়া ঘৃণা করে না—কখনোই তাহারা আপনাকে হীনবর্ণ বন্ধু অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না, কারণ অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠতা জাতিবর্ণের অপেক্ষা রাখে না তাহা তাহারা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে, তথাপি আহার কালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল—সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ার পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ার সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতিঅসহ্য মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান? এতটা মানবঘৃণা আমাদের জাতির মনে স্বভাবতই আছে একথা আমি তো স্বীকার করিতে পারি না। বস্তুত এখানে স্পষ্টই আমাদের ধর্ম আমাদের হৃদয়ের চেয়ে অনেক নিচে পড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপে মানুষ ধর্মকে যখন আপনার চেয়েও নিচে নামাইয়া দেয় তখন সে নিজের সহজ মনুষ্যত্বও যে কতদূর পর্যন্ত বিস্মৃত হয় তাহার একটি নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত আমার মনে যেন আঁশ্বিত দিয়া চিরকালের মতো দাগিয়া রহিয়া গিয়াছে। আমি জানি একজন বিদেশী



যোগী পথিক পল্লীগ্রামের পথের ধারে তিনদিন ধরিয়া অনাশ্রয়ে পড়িয়া তিল তিল করিয়া মরিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই মন্ত একটা পুণ্যস্থানের তিথি পড়িয়াছিল—হাজার হাজার নরনারী কয়দিন ধরিয়া পুণ্যকামনার সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনও বলে নাই এই মুমূর্ষুকে ধরে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি এবং তাহাতেই আমার পুণ্য। সকলেই মনে মনে বলিয়াছে, জানি না ও কোথাকার লোক, ওর কী জাত—শেষকালে কি ধরে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তের দ্বারে পড়িব? মানুষের স্বাভাবিক দয়া যদি আপনার কাজ করিতে যায় তবে ধর্মের রক্ষকস্বরূপে সমাজ তাহাকে দণ্ড দিবে। এখানে ধর্ম যে মানুষের হৃদয়প্রকৃতির চেয়েও অনেক নিচে নামিয়া বসিয়াছে।

আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অল্প জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে;—বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুঃসহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে একরূপ নিতান্তই অকারণে নির্ধাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ? আমরা নিজে তাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সেবা ও সাহায্য লইতে দ্বিধা করি না তাহাদিগকে সকল প্রকার সহায়তা হইতে বঞ্চিত করাকেই আমাদের গ্ৰামবুদ্ধি কি সত্যই সংগত বলিতে পারে? কখনোই না। কিন্তু মানুষকে এইরূপ অগ্নায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়। আমাদের হৃদয় দুর্বল বলিয়াই যে আমরা এইরূপ অবিচার করি তাহা নহে, ইহাই আমাদের কর্তব্য এবং ইহাই না করা আমাদের স্বলন বলিয়া করিয়া থাকি। আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নিচে নামিয়া অন্তরে আমাদের বোধিয়া রাখিয়াছে—গুণবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নর-নারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মতো পীড়ন করিয়া চলিয়াছে!

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ তো য়ুরোপেও আছে; সেখানেও তো অভিজাতবংশের লোক সহজে নীচবংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে চান না। ইহাদের একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ভূত হইয়া ওঠে ইহা সত্য,—কিন্তু ধর্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপস করিয়া তাহার সঙ্গে একাঙ্গনে আসিয়া বসিবে? ধর্ম কি

আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না? চোর তো সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাঞ্জিস্ট্রেটসুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস পরাইয়া দিতেছে! কোনোকালে বিচার পাইব কোথায়, কোনোমতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে?

এরূপ অদ্ভুত তর্ক আমাদের মুখেই শোনা যায় যে, যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, মদমাংস যাহারা খাইবেই এবং পাশবতা-যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, ধর্মের সম্মতিদ্বারা যদি তাহাদের পাশবতাকে নির্দিষ্টপরিমাণে স্বীকার করা যায়—যদি বলা যায় এইরূপ বিশেষভাবে মদমাংস খাওয়া ও চরিত্রকে কলুষিত করা তোমাদের পক্ষে ধর্ম, তবে তাহাতে দোষ নাই, বরং ভালোই। এরূপ তর্কের সীমা যে কোন্‌খানে তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমনতরো স্বভাবপাণ্ডিত্য অমানুষ দেখা যায় নরহত্যার যাহারা আনন্দ বোধ করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য ঠগধর্মকেই ধর্ম বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত একথাও বোধ হয় আমাদের মুখে বাধিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক নিজের গলাটা তাহাদের ফাঁসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত না হয়।

ধর্ম সম্বন্ধে সত্য সম্বন্ধে মানুষের উচ্চাধিকার নিম্নাধিকার একবার কোথাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেই মানুষ যে-মহাতরী লইয়া জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ছোটো ছোটো ভেলা তৈরি করা হয় তাহাতে মহাসমুদ্রের যাত্রা আর চলে না, তীরের কাছে থাকিয়া ইঁটুজলে খেলা করা চলে মাত্র। কিন্তু যাহারা কেবল খেলিবেই, কোনোদিন যাত্রা করিবেই না, তাহারা খড়্‌কুটা যাত্রা খুলি লইয়া আপনার খেলনা তৈরি করুক না—তাহাদের জড়তার খাতিরে অমূল্য ধর্মতরীকে টুকরা করিয়াই কি চিরদিনের মতো সর্বনাশ ঘটাইতে হইবে?

একথা আবার বলিতেছি, ধর্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো ঘিবা নাই। সে মানুষকে মূঢ় বলিয়া স্বীকার করে না দুর্বল বলিয়া অবজ্ঞা করে না। সেই তো মানুষকে ডাক দিয়া বলিতেছে, তুমি অজয়, তুমি অশোক, তুমি অভয়, তুমি অমৃত। সেই ধর্মের বলেই মানুষ যাত্রা পারে নাই তাহা পারিতেছে, যাত্রা হইয়া উঠিবে বলিয়া কোনোদিন স্বপ্নেও মনে করে নাই একদিন তাহাই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ধর্মের মুখ দিয়াই মানুষ যদি মানুষকে এমন কথা কেবলই বলাইতে থাকে যে, “তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না,” তবে তাহার মূঢ়তা ঘুচাইবে কে, যদি বলায় “তুমি অক্ষম, তুমি পারিবে না,” তবে তাহাকে শক্তি দান করে অগতে এমন সাধ্য আর কাহার আছে?



আমাদের দেশে বহুকাল হইতে তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্য তোমার অধিকার নাই; অসম্পূর্ণেই তুমি সমুদ্র হইয়া থাকো। কতশত লোক পিতা পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে মত্রে তোমাদের দরকার নাই, পুজার তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই; তোমাদের কাছে ধর্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধারণ পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। তোমরা স্কুলকে লইয়াই থাকো চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ওইখানেই নিচে পড়িয়া থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্মের কলগাভ করিতে পারিবে।

অথচ হীনতম মানুষেরও একটিমাত্র সম্মানের স্থান আছে ধর্মের দিকে—তাহার জানা উচিত সেইখানেই তাহার অধিকারের কোনো সংকোচ নাই। রাজা বল, পণ্ডিত বল, অভিজাত বল, সংসারের ক্ষেত্রেই তাহাদের যত কিছু প্রতাপ প্রভুত্ব—ধর্মের ক্ষেত্রে দীনহীন মূর্খেরও অধিকার কোনো কৃত্রিম শাসনের দ্বারা সংকীর্ণ করিবার ভার কোনো মানুষের উপর নাই। ধর্মই মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো আশা—সেইখানেই তাহার মুক্তি, কেননা সেইখানেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সেইখানেই তাহার অন্তহীন সম্ভাব্যতা, ক্ষুদ্র বর্তমানের সমস্ত সংকোচ সেইখানেই ঘুচিতে পারে। অতএব সংসারের দিকে, জ্ঞান বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মানুষের স্বত্বকে যতই ধণ্ডিত কর না, ধর্মের দিকে কোনো মানুষের অন্য কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এতবড়ো স্পর্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্তী সম্রাটের নাই।

ধর্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে পার - তুমি কে, যে, তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে! তুমি কি অসুধামী? মানুষের মুক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহংকার রাখ? তুমি লোকসমাজ তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্মের নামে গিণ্ট করিয়া ধর্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এতবড়ো একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্মে মর্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া কেলিয়া দিয়াছ তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্কল, যাহা অসত্য, যাহা অবিদ্বান্স তাহাকেও দেশকালপাত্র অনুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসংগত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ংকর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভয়ংকরও নিশ্চেষ্টপৌরুষ নতমস্তক মানুষ প্রদ্ব কহিতেও জানে না, প্রদ্ব কহিলেও

তাহার উত্তর কোথাও নাই—কেবল বিভীষিকার তাড়নার এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে ; চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পুরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেননা তুমি মুঢ় তুমি বুদ্ধিবে না ; যাহা পাচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেননা তুমি অক্ষম ; সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তীকালের সহিত তোমাকে আপাদমস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কেননা নূতন করিয়া নিজের কল্যাণচিন্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই। নিষেধজর্জরিত চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবার এত বড়ো সর্বদেশব্যাপী ভয়ংকর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই মল্লযন্ত্র চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে ?

দুর্গতি তো প্রত্যক্ষ, আর তো কোনো যুক্তির প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, চোখ বুজিয়া কি কেবল তর্কই করিব। আমাদের দেশে ব্রহ্মের ধ্যানে পূজার্তনায় যে বহুবিচিত্র স্থূলতার প্রচার হইয়াছে তর্ককালে তাহাকে আমরা চরম বলিয়া মানি না। আমরা বলিয়া থাকি, যে মানুষ আধ্যাত্মিকতার যে অবস্থায় আছে এ দেশে তাহার জন্ম সেই প্রকার আশ্রয় গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমশ স্বতই উচ্চতর অবস্থার জন্ম প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু জানিতে চাই অনন্ত কালের অসংখ্য মানুষের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্ম সেরূপ উপযুক্ত আশ্রয় গড়িতে পারে এমন সাধ্য কাহার ! সমস্ত বিচিত্রতাকেই স্থান দিবে, বাধা দিবে না, এতবড়ো বিশ্বকর্মা মানবসমাজে কে আছে ?

বস্তুত মানুষের অসীম বৈচিত্র্যকে যাহারা সত্যই মানে তাহারা মানুষের জন্ম অসীম স্থানকেই ছাড়িয়া রাখে। ক্ষেত্র যেখানে মুক্ত, বৈচিত্র্য সেখানে আপনি অবাধে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। এই জন্মই যে-সমাজে জাগ্রত ও নিদ্রিতকালের সমস্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাধা সেখানে মানুষের চরিত্র আপন স্বাভাব্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই একছাঁচে গড়া নির্জীব ভালোমানুষটি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কল্পনাকে পর্যন্ত যদি অবিচলিত স্থূল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায় অসীমকে তুমি কেবল এই একটিমাত্র বা কয়টিমাত্র বিশেষ রূপেই চিন্তা করিতে থাকো তবে সেই উপায়ে সত্যই কি মানুষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চিরধাবমান পরিণতিপ্রবাহকে সাহায্য করা হয় ? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বন্ধ

করাই হয় না, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয় না ?

এই যে এক সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাজাতির নানালোক শিশুকাল হইতে বার্ষিক্য পর্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চিন্তা করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, কর্ম করিতেছে ইহারা যদি একই জগতের মধ্যে সকলে ছাড়া না পাইত, যদি একদল প্রবলপ্রতাপশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্থণা করিয়া বলিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্ত এবং প্রত্যেকের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্ত স্বতন্ত্র করিয়া ছোটো ছোটো জগৎ একেবারে পাকা করিয়া বাধিয়া দেওয়া যাইবে তবে কি সেই হতভাগাদের উপকার করা হইত ? মানবচিত্তের চিরবিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে চিরদিনের মতো আটক করা যাইতে পারে একথা যিনি কল্পনাও করিতে পারেন তিনি বিশ্বের অমিত্র । ছোটো হইতে বড়ো, অবোধ হইতে সুবোধ পর্যন্ত সকলেই এই একই অসীম জগতে বাস করিতেছে বলিয়াই প্রত্যেকেই আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে ইহার মধ্য হইতে আপন শক্তির পরিমাণ পূরা প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে । সেই জন্তই শিশু যখন কিশোর বয়সে পৌঁছিতেছে তখন তাহাকে তাহার শৈশবজগৎটা বলপূর্বক ভাঙিয়া ফেলিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে হইতেছে না । তাহার বুদ্ধি বাড়িল, শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল তবু তাহাকে নূতন জগতের সন্ধানে ছুটোছুটি করিয়া মরিতে হইল না । নিতান্ত অবাচীন মূঢ় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সকলেরই পক্ষে এই একই সুবৃহৎ জগৎ । কিন্তু নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মূঢ়তাবশতঃ মানুষ যেখানেই মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেইখানেই হয় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নর, ভয়ংকর বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে । কোনো মতেই কোনো বুদ্ধিমানই মানুষের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মতো সনাতন বন্ধনে বাধিতে পারেই না । মানুষকে না মারিয়া তাহাকে গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে । মানুষের বুদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও তবে তাহার বুদ্ধিকে বিনষ্ট করো, তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটা সুদূর অতীতের সুগভীর কূপের তলদেশে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চাও তবে তাহাকে নির্জীব করিয়া ফেলো । নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অধিনেত্রী হইয়া উঠিলে মানুষ তো মানুষকে এইরূপ নির্মমভাবে পঙ্গু করিতেই চায় ; সেই জন্তই তো মানুষ নির্লজ্জ ভাষায় এমন কথা বলে যে, আপামর সকলকেই যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে আমরা আর চাকর পাইব না ; জীলোককে যদি বিজ্ঞানান করা যায় তবে তাহাকে দিয়া আর বাটনা বাটানো চলিবে না ; প্রজাদিগকে যদি অবাধে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তাহারা নিজের সংকীর্ণ অবস্থার



সম্পূর্ণ থাকিতে পারিবে না। বস্তুত এ কথা নিশ্চিত সত্য, মানুষকে কৃত্রিমশাসনে বাঁধিয়া ধর্য করিতে না পারিলে কোনো মতেই তাহাকে একই স্থানে চিরকালের মতো স্থির রাখিতে পারিবে না। অতএব যদি কেহ মনে করেন ধর্মকেও মানুষের অন্ত্যস্ত শত শত নাগপাশবন্ধনের মতো অশ্রুতম বন্ধন করিয়া তাহার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিকে, বিশ্বাসকে, আচরণকে চিরদিনের মতো একই আয়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে জাঁহার কর্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে শতসহস্র নিষেধের দ্বারা বিতীষিকা দ্বারা প্রলোভনের দ্বারা এবং অসংযত কাল্পনিকতার দ্বারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মানুষকে জ্ঞানে কর্মে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ না দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার ক্রটি যেন বন্দী থাকে সামান্য ব্যাপারেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঙ্গলচিন্তায় সে যেন নিজের নুষ্টিবিচারকে খাটাইতে না পারে এবং বাহ্যিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমুদ্রপার হইবার কোনো সুযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃঙ্খলে অবিচলিত হইয়া একই পথে বাঁধানো ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে। ১

কিন্তু তাত্ত্বিকের সহিত তর্ক করিতে গিয়া আমি হয়তো নিজের দেশের প্রতি অবিচার করিতেছি। এই যে দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্মচিন্তায় স্থূলতা এবং আমাদের ধর্মকর্মে মূঢ়তা নানা রূপ ধরিয়া আজ সমস্ত দেশকে পর্দার উপর পর্দা ফেলিয়া বহুস্তরের অন্ধতার আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহা কোনো একদল বিশেষ বুদ্ধিমানের মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঘটায় নাই। যদিও আমরা অহংকার করিয়া বলি ইহা আমাদের বহুদূরদর্শী পূর্বপুরুষদের জ্ঞানকৃত কিন্তু তাহা সত্য হইতেই পারে না— বস্তুত ইহা আমাদের অজ্ঞানকৃত। আমাদের দেশের ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে

১. এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অধিকারভেদ চিরন্তন নহে, তাহা সাধনার অবধাভেদ মাত্র। কিন্তু আমাদের যে সমাজে বর্ণবিভেদের পক্ষে ধর্মের উচ্চতম অধিকার মুক্ত ও অন্ত্যস্ত ধর্মের পক্ষে তাহা বন্ধ সেখানে কি এমন কথা বলা চলে? একে তো প্রত্যেক মানুষের অধিকার কোনো কৃত্রিম দ্বারা কেহই স্থির করিয়া দিতেই পারে না। তৎসঙ্গে ধর্মের দেবিতাম সমাজে সেই চেষ্টা সম্ভব হইয়া আছে, যদি দেবিতাম কখনো বা ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া বাইতেছে ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলেও অস্বস্তি ইহা বুদ্ধিতে পারিতাম এখানে মানুষের অধিকারলাভ তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে সমাজের এবং ধর্মের অধিকারভেদ হয়তো এককালে সচল ও সম্ভবভাবে ছিল—কিন্তু যখনই তাহা সচলতা হারাইয়াছে তখনই তাহা আমাদের পথের বাধা হইয়াছে, যখনই তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে না তখনই তাহা আমাদের জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক পুরাকালে আর্যসমাজ কী নিয়মে চলিত তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

বিপাকে পড়িয়া এইরূপ ঘটনা উঠিয়াছে। এ কথা কখনোই সত্য নহে যে, আমরা অধিকারভেদ চিন্তা করিয়া মানুষের বুদ্ধির ওজনমতো ভিন্ন অবস্থার উপযোগী পূজার্চনা ও আচারপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের ঘাড়ে আসিয়া যাহা চাপিয়া পড়িয়াছে তাহাই আমরা বহন করিয়া লইয়াছি। ভারতবর্ষে আর্থেরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহারা আপনার ধর্মকে সত্যতাকে চিরদিন অবিমিশ্রভাবে নিজেদের প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। পদে পদেই নানা অল্পমত জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে করিতেও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিতেছিল, পুরাণে ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন করিয়া একদিন ভারতবর্ষীয় আর্থজাতির ঐক্যধারা বিভক্ত ও বিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। নানা নিকৃষ্ট জাতির নানা পূজাপদ্ধতি আচারসংস্কার কথাকাহিনী তাঁহাদের সমাজের ক্ষেত্রে জোর করিয়াই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অত্যন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর অনার্থ ও কুংসিত সামগ্রীকেও ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। এই সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্থশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার অল্প প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা অসাধ্য। যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কোশলে তাহাদের মিল করা যায় না। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে সমাজ যদি তাহাকেই সম্মতি দিতে বাধ্য হয় তবে সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার আর স্থান থাকে না। কাঁটাগাছকে পালন করিবার ভার যদি কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে শস্তকে রক্ষা করা অসাধ্য হয়। কাঁটাগাছের সঙ্গে শস্তের যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে তাহার সমন্বয় সাধন করিতে পারে এমন কৃষক কোথায়! তাই আজ আমরা ধৈর্য্যকার যত আগাছাকেই স্বীকার করিয়াছি; জঙ্গলে সমস্ত খেত একেবারে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে;—সেই সমস্ত আগাছার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ঠেলাঠেলি চাপাচাপি চলিতেছে, আজ যাহা প্রবল, কাল তাহা দুর্বল হইতেছে, আজ যাহা স্থান পাইতেছে কাল তাহা স্থান পাইতেছে না, আবার এই ভিড়ের মধ্যে কোথা হইতে বাতাসে বাহিরের বীজ উড়িয়া আসিয়া ক্ষেত্রের কোন্ এক কোণে রাতারাতি আর একটা অদ্ভুত উদ্ভিদকে তুঁই ফুড়িয়া তুলিতেছে। এখানে আর সমস্ত জঙ্গলই অবোধে প্রবেশ করিতে পারে, একমাত্র নিবেদ কেবল কৃষকের নিড়ানির বেলাতেই; যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে হইতেছে;—প্ৰিডামহেরা এককালে সত্যের যে বীজ ছড়াইয়াছিলেন তাহার শস্ত কোথায় চাপা পড়িয়াছে সে আর দেখা যায় না—কেহ যদি সেই শস্তের দিকে তাকাইয়া জঙ্গলে হাত দিতে যায় তবে ক্ষেত্রপাল একেবারে লাঠি হাতে হাঁ হাঁ করিয়া



ছুটিয়া আসে, বলে, এই অর্ধাটীনটা আমার সনাতন ধর্ম নষ্ট করিতে আসিয়াছে। এই সমস্ত নানা জাতির বোঝা ও নানা কালের আবর্জনাকে লইয়া নির্বিচারে আমরা কেবলই একটা প্রকাণ্ড মোট বাঁধিতে বাঁধিতেই চলিয়াছি এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্থ ও অনার্থ অসম্বন্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি ;—ইহার ভয়ংকর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলি-লুপ্তিত, কোনোমতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না ; এই বিমিশ্রিত বিপুল বোঝাটাই তাহার জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; এই বোঝাকে কোনো দিকে কিছুমাত্র হ্রাস করিতে গেলেই সেটাকে সে অধর্ম বলিয়া প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে ; এবং দুর্গতির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতেও আজ সেই জাতির শিক্ষাভিমानी ব্যক্তিরা গর্ব করিতে থাকেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই, অঙ্কসংস্কারের একরূপ বাধাহীন একাধিপত্য আর কোনো সমাজে দেখা যায় না, সকল প্রকার মুগ্ধ বিশ্বাসের একরূপ প্রশস্ত ক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও প্রস্তুত হয় নাই, এবং পরম্পরের মধ্যে এত ভেদ এত পার্থক্যকে আর কোথাও এমন করিয়া চিরদিন বিভক্ত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে—অতএব বিশ্ব-সংসারে একমাত্র হিন্দুসমাজেই উচ্চ নীচ সমান নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে বাঁধিতে পারিবে না—সেইরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না। স্থূলভম তামসিকতাই বলে যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাক, যাহা বিনাশের যোগ্য তাহাকেও এই তামসিকতাই সনাতন লিয়া আঁকড়িয়া থাকিতে চায় এবং যাহা তাহাকে একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে বলে তাহাকেই সে আপনার ধর্ম বলিয়া সম্মান করে।

মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য। যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্মই তাহাকে দান করে। এই কারণে মানুষ আপন ধর্মের আদর্শকে আপন তপস্তার সর্বশেষে, আপন শ্রেষ্ঠতার চরমেই স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্মের মতো সর্বশেষে তার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নিচে রাখিলে সে

নিচেই টানিয়া লয়। অতএব ধর্মকে কোনো জাতি যদি নীতির দিকে না বসাইয়া রীতির দিকে বসায়, বুদ্ধির দিকে না বসাইয়া সংস্কারের দিকেই বসায়, অস্তরের দিকে আসুন না দিয়া যদি বাহ্য অলুষ্ঠানে তাহাকে বদ্ধ করে এবং ধর্মের উপরেই দেশকাল-পাত্রের ভার না দিয়া দেশকালপাত্রের হাতেই ধর্মকে হাত পা বাধিয়া নির্মমভাবে সমর্পণ করিয়া বসে; ধর্মেরই দোহাই দিয়া কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক করিতে থাকে, এক শ্রেণীর অভিমানকে আর এক শ্রেণীর মাথার উপরে চাপাইয়া দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সংকুচিত ও ক্ষতধণ্ড করিয়া ফেলে; তবে সে-জাতিকে হীনতার অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন কোনো সভা-সমিতি কংগ্রেস কনফারেন্স, এমন কোনো বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি, এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইঙ্গুজাল বিশ্বজগতে নাই। সে জাতি এক সংকট হইতে উদ্ধার পাইলে আর এক সংকটে আসিয়া পড়িবে এবং এক প্রবলপক্ষ তাহাকে অল্পগ্রহপূর্বক সম্মান-দান করিলে আর এক প্রবলপক্ষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে লাজনা করিতে কুষ্ঠিত হইবে না; যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনোই উচ্চাসন পাইবে না। ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্মের বিকায়েই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকায়েই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই। এবং ইহাতেও কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, যদি উদ্ধার ইচ্ছা করি তবে কোনো বাহিরের দিকে তাকাইয়া কোনো কল নাই, কোনো উপস্থিত বাহ্য সুবিধার সুযোগ করিয়া কোনো লাভ নাই;—রক্ষার উপায়কে কেবলই বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্বল আত্মার মূঢ়তা;—ইহাই ঐক্য সত্য যে, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

১৩১৮

## আমার জগৎ

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছানিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষীর শুভ্রলগাটে একটি কৃষ্ণভিলও সে নয়। ওই তারাগুচ্ছির মধ্যে যে-খুলি সেই আপন শাড়ির একটি বুট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগবে তা অতি বড়ো নিন্দকের চোখেও পড়বে না।

এ যেন আলোক মায়ের কোলের কালো শিশু, সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেবে তার এই ধরণী-দোলার শিররের কাছে দাঁড়িয়ে। তারা একটু নড়ে না পাছে এর ঘুম ভেঙে যায়।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বললেন, তুমি কোন্ সাবেককালের ওয়েটিং রুমের আরাম-কেন্দ্রারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ ওদিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা? একেবারে নিছক কবিত্ব!

আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব। কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতোই শোনাবে।

আমার কবিত্বকলঙ্কটুকু স্বীকার করেই নেওয়া গেল। এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর স্বাতিটুকুরই মতো। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ ক'রে বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক।

আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তারাগুলো চূপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে তো তর্ক চলে না।

বিজ্ঞান বলে, তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ বলেই দেখছ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারছ বলেই বলছ ওরা চলছে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছেই পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পার তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন?

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উলটো কথা বলে তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

আমি বলি, তুমি তা তো মান না। পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়। তখন বল, কাছে আছি বলেই পৃথিবীটাকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটার সার দিতে রাজি আছি। এই জন্তই তো আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহংকার। কেননা আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, আপনাকে যে লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে— অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

দূরকে যদি এতটা খাতিরই কর তবে কোন্ মুখে বলবে, তারাগুলো ছুটোছুটি ক'রে মরছে? মধ্যাহ্নসূর্যকে চোখে ধাঁকতে গেলে কালো কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় ছর্দশরূপকে আমরা সমগ্রভাবে দেখব বলেই পৃথিবী এই কালো



রাজিটাকে আমাদের চোখের উপর ধরেছেন। তার মধ্যে দিয়ে কী দেখি? সমস্ত শাস্ত, নীরব। এত শাস্ত, এত নীরব যে আমাদের হাউই, তুবড়ি, তারাবাজিগুলো তাদের মুখের সামনে উপহাস করে আসতে শুরু করে না।

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্কসঙ্গে মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি তারা অবিচলিত স্থির। তখন তারা যেন গজমুক্তার সাতনগী হার। জ্যোতির্বিজ্ঞা যখন এই সঙ্কসঙ্ককে বিচ্ছিন্ন করে কোনো তারাকে দেখে তখন দেখতে পায় সে চলছে—তখন হার-ছেঁড়া মুক্তা টলটল করে গড়িয়ে বেড়ায়।

এখন মুশকিল এই, বিশ্বাস করি কাকে? বিশ্বাস করা অন্ধকার সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ভাষা নিভাস্ত সরল—একবার কেবল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেই হয়, আর কিছুই করতে হয় না। আবার যখন দু-একটা তারা তাদের বিশ্বাসন থেকে নিচে নেমে এসে গণিতশাস্ত্রের গুহার মধ্যে ঢুকে কানে কানে কী সব বলে যায় তখন দেখি সে আবার আর এক কথা। যারা স্বদলের সঙ্কসঙ্ক ছেড়ে এসে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাইভেট কামরার ঢুকে সমস্ত দলের একজোট সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার ভান করে সেই সমস্ত অ্যাপ্রভারদেরই যে পরম সত্যবাদী বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা নেই।

কিন্তু এই সমস্ত অ্যাপ্রভাররা বিস্তারিত খবর দিয়ে থাকে। বিস্তারিত খবরের জোর বড়ো বেশি। সমস্ত পৃথিবী বলছে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বলছে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যেটুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর, বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

আমার কথাটা এই যে কোনোটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিজ্ঞান নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত কিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারও প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমার দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়োচ্ছে তাতে দোষ কী? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা ভয়ংকর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেই জগ্গেই উপনিবং বলেছেন—

ভদ্রেজতি ভদ্রেজতি তদুদ্রে ভদ্রিকৈ ।

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমগ্রকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ঋবঙ্গটা আমাদের বিচার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা ব'লে জানা ব'লে পদার্থটা থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিচার মায়া। আবার আর-এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ঋব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিচার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অস্ত থাকবে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র, যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্বেই ব্যবহার করেছি, এখনও ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো—

ভদ্রেজতি ভদ্রেজতি তদুদ্রে ভদ্রিকৈ ।

সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।

যদি এই পাতাটিকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে একে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ওই পাতার আকার আরও বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাবে। ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বললেই হয়।

এই তো গেল দেশ। তার পরে কাল। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনিই থাকত অথচ গাছের ওই পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম তবে পাতা হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত এমনি হ্রস্ব করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখতে পেতুম না। জগতের যে সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত দ্রুত কালে চলছে তারা আমাদের চারদিকে থাকলেও তাদের দেখতেই পাচ্ছিলাম এমন হওয়া অসম্ভব নয়।



একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আর একটু স্পষ্ট হবে। গণিত সম্বন্ধে এমন অসামান্য শক্তিশালী লোকের কথা শোনা গেছে যারা বহুসময়সাধ্য দুঃস্বপ্ন অথবা এক মুহূর্তে গণনা করে দিতে পারেন। গণনা সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা যে কালকে আশ্রয় করে আছে আমাদের চেয়ে সেটা বহু ক্ষুদ্র কাল—সেই জন্যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়ে তাঁরা অঙ্ককলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন সেটা আমরা দেখতেই পাইনে এমন কি তাঁরা নিজেরাই দেখতে পান না।

আমার মনে আছে, একদিন দিনের বেলা আমি অনেকগুলির ক্ষুদ্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার ভ্রম হল আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমোইনি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল। আমি যদি একই সময়ে এই দুই কাল সম্বন্ধে সচেতন থাকতুম তাহলে হয় স্বপ্ন এত ক্ষুদ্রবেগে মনের মধ্যে চলে যেত যে, তাকে চেনা শক্ত হত, নয় তো সেই স্বপ্নবর্তীকালের রেলগাড়িতে করে চলে যাওয়ার দরুন স্বপ্নের বাইরের অগন্ত রেলগাড়ির বাইরের দৃষ্টির মতো বেগে পিছিয়ে যেতে থাকত; তার কোনো একটা জিনিসের উপর চোখ রাখা যেত না। অর্থাৎ স্বভাবত যার গতি নেই সেও গতি প্রাপ্ত হত।

যে ঘোড়া দৌড়োচ্ছে তার সম্বন্ধে এক মিনিটকে যদি দশঘণ্টা করতে পারি তাহলে দেখব তার পা উঠছেই না। ঘাস প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে অথচ আমরা তা দেখতেই পাচ্ছি। ব্যাপক কালের মধ্যে ঘাসের হিসাব নিয়ে তবে আমরা জানতে পারি ঘাস বাড়ছে। সেই ব্যাপক কাল যদি আমাদের আয়ত্তের চেয়ে বেশি হত তাহলে ঘাস আমাদের পক্ষে পাহাড় পর্বতের মতোই অচল হত।

অতএব আমাদের মন যে কালের ভালে চলছে তারই বেগ অনুসারে আমরা দেখছি বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীটা চলছে। কালের পরিবর্তন হলে হয়তো দেখতুম বটগাছটা চলছে কিংবা নদীটা নিস্তব্ধ।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, আমরা যাকে অগন্ত বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। যখন আমরা পাহাড় পর্বত স্রষ্টা চক্ষু দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখছি। কেন আমার মন আয়তনমাত্র। কিন্তু আমার মন আয়তন নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্তে দেখছি সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি। অন্য কোনো অবস্থায় মনের প্রকৃতি যদি অন্য রকম হয় তবে সৃষ্টিও অন্য রকম হবে।

আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘন দেশের জিনিসকে একরকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিসকে অন্য রকম দেখে, ক্ষুদ্রকালের গতিতে এক রকম দেখে, মন্দকালের গতিতে অন্য রকম দেখে—এই প্রভেদ অজুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা। আকাশে লক্ষকোটি ক্রোশ পরিমাণ দেশকে যখন সে এক হাত আধ হাতের মধ্যে দেখে তখন দেখে তারাগুলি কাছাকাছি এবং স্থির। আমার মন কেবল যে আকাশের তারাগুলিকে দেখছে তা নয়, লোহার পরমাণুকেও নিবিড় এবং স্থির দেখছে—যদি লোহাকে সে ব্যাপ্ত আকাশে দেখত তাহলে দেখত তার পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। এই বিচিত্র দেশকালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা দেখা। সেই অগ্নেই লোহা হচ্ছে লোহা, জল হচ্ছে জল, মেঘ হচ্ছে মেঘ।

কিন্তু বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে সমস্তকে দেখতে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে। কিন্তু এই এক আদর্শ সৃষ্টির আদর্শই নয়। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিস্মিষ্ট ক'রে ফেলে। অবশেষে অণু পরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি তো অণু পরমাণু নয়—দেশকালের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি। ঈশ্বর-পদার্থের কম্পনমাত্র সৃষ্টি নয় আলোকের অশুভূতিই সৃষ্টি। আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি দ্বারা যা দেখছি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি তাই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন বলে। তিনি বলবেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি—কারণ আমার বোধ এক কথা বলে, তোমার বোধ আর-এক কথা বলে। আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন আর এক কথা বলে।

আমি বলি ওই তো হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি তো কালের সৃষ্টি নয় সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক বলবেন—এক এক মন এক এক রকমের সৃষ্টি যদি ক'রে বসে তাহলে সেটা যে অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি,—তা তো হয়নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও তো দেখি সেই বৈচিত্র্যসম্পন্ন তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই তো তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হচ্ছে, আমার এক-টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হত তাহলে

মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা অগম্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেই অন্তরেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যভঙ্গ আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাকত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করছেন, এই মন পদার্থটা কী শুনি।

আমি উত্তর করি যে, তোমার ঈশ্বর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এসব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। খ্যাপার বংশ সনাতনকাল থেকে চলে আসছে। তাই পুরাতন কবি বলছেন—

অজ্ঞং তমঃপ্রবিশন্তি যেষাং বিজ্ঞানুপাসতে।

ততো হুয় ইব তে তমো য উ বিজ্ঞানং রতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অজ্ঞকারে ডোবে। আর যে অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অজ্ঞকারে ডোবে।

বিজ্ঞানবিজ্ঞান বস্তুযেদোভয়ং সহ।

অবিজ্ঞানং যুত্বাং ভীষা বিজ্ঞান্যুতযশ্নুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্যে দিয়ে যুত্বাকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অযুত্বকে পার।

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে? আবার যদি বিরোধ থাকে তাহলেই বা সৃষ্টি হয় কী করে? সেই অন্তে অসীম যেখানে সীমার আপনাকে সংকুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেননি।

নিজের অন্তিমটার কথা চিন্তা করলে একথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাকেরা কথাবার্তার প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করছি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুত্বে আমি অতিক্রম ক'রে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত



আর এক কোটিতে অনন্ত । আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য ।  
আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য ।

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে । সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয় । অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার । সোহহমস্মি । সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি । অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, অহমস্মি । আমি আছি । যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমার পালা । সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বসেছেন, অহমস্মি । আমি আছি, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা ।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই । যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে একথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত । তিনি আমার আমি আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন । সেই জগ্গেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে । সেই জগ্গেই উপনিষৎ বলেছেন,—সর্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাকতে পারে না । আপনাকে সেই জানে না যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অগ্গকেও যে আপন বলে জানে না ।

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই—আমি সেদিক থেকে কিছু বলছিও নে । আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না । আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য গতিও সত্য । অণু পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিস্মিষ্ট এবং ইঞ্জির মনের আশ্রয় থেকে একেবারে লষ্ট হতে হতে ক্রমে আকার আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয় সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায় সেটা আমার কাছে বিশ্বরূপ বা মনোহর বোধ হয় না । রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর । সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের কোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না । আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জলতা বেড়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য বনীবৃত্ত হয় - সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত । যে ছুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন । আমি-যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনার পূর্ণ হয়ে উঠেছে,

চিত্রকরের চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে—তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তক্ত দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না ; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাকত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত । কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিয়ো-চাকলা-মাত্র নয় । তত্ত্বজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, বিজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, কিন্তু কবি বলছে আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্ছেন সেই তো এই বিশ্বসংগীত নইলে কিছুই বাজত না । বীণার তার একটি নয়—লক্ষ তারে লক্ষ সুর কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই । এই হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি অড়মন্ত্র নয়, এ যে প্রাণবান—এই জন্তু এ যে কেবল বীণা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে তা নয় ; এর সুর এগিয়ে চলছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে, একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই ; কোথাও গিয়ে সে থামবে না ; মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন । আমি ধন্য যে, আমি পাছশালার বাস করছি, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয়নি । এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি ; সেই জন্তুই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ ।



পরিচয়

# পরিচয়

## ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিশ্রা ও জাগরণের পালা আছে ; একবার ভিতরের দিকে একবার বহিরের দিকে নামা উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে। থামা এবং চলার অবিরত যোগেই বিশ্বের গতিক্রিয়া সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলে, বস্তুমাত্রই সচ্ছিন্ন, অর্থাৎ “আছে” এবং “নাই” এই দুইয়ের সমষ্টিতেই তাহার অস্তিত্ব। এই আলোক ও অন্ধকার, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এমনি ছন্দে ছন্দে যতি রাখিয়া চলিতেছে যে, তাহাতে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে না, তাহাকে তালে তালে অগ্রসর করিতেছে।

ঘড়ির কলকটার উপরে মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহা অবাধে একটানা চলিয়াছে কিংবা চলিতেছেই না। কিন্তু সেকেন্ডের কাঁটা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহা টিকটিক করিয়া লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছে। দোলনদণ্ডটা যে একবার বামে ধামিয়া দক্ষিণে যায়, আবার দক্ষিণে ধামিয়া বামে আসে তাহা ওই সেকেন্ডের তালে লয়েই ধরা পড়ে। বিশ্বব্যাপারে আমরা ওই মিনিটের কাঁটা ঘড়ির কাঁটাটাকেই দেখি কিন্তু যদি তাহার অণুপরিমাণ কালের সেকেন্ডের কাঁটাটাকে দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম বিশ্ব নিমেষে নিমেষে ধামিতেছে ও চলিতেছে—তাহার একটানা তানের মধ্যে পলকে পলকে লয় পড়িতেছে। সৃষ্টির ঘন্মদোলকটির এক প্রান্তে ইং অস্ত্র প্রান্তে না, একপ্রান্তে এক অস্ত্র প্রান্তে দুই, একপ্রান্তে আকর্ষণ অস্ত্র প্রান্তে বিকর্ষণ, একপ্রান্তে কেন্দ্রের অতিমুখী ও অস্ত্র প্রান্তে কেন্দ্রের প্রতিমুখী শক্তি। তর্কশাস্ত্রে এই বিরোধকে মিলাইবার জন্য আমরা কত মতবাদের অসাধ্য ব্যারামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সৃষ্টিশাস্ত্রে ইহারা সহজেই মিলিত হইয়া বিশ্বরহস্যকে অনির্বচনীয় করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিসটা যদি একলা থাকে তবে সে নিজের এককোঁকা জোরে কেবল একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভীষণ উচ্চবেগে সোজা চলিতে থাকে, ভাইনে বাঁয়ে ক্রমশঃপমাত্র করে না ; কিন্তু শক্তিকে অগতে একাধিপত্য দেওয়া হইল নাই বলিয়াই, বরাবর তাহাকে জুড়িতে জোড়া হইয়াছে বলিয়াই, দুইয়ের উলটাটানে বিশ্বের সকল জিনিসই নশ্ব হইয়া

গোল হইয়া সুষ্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। সোজা লাইনের সমাপ্তিহীনতা, সোজা লাইনের অতি তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারের সুষ্পূর্ণ পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তিই বিশ্বের স্বভাবগত। -এই এক শক্তির একাগ্র সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না— তাহা কেবল ভেদ করিতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুকেই ধরিতে পারে না, বেড়িতে পারে না, তাহা একেবারে রিক্ত, তাহা প্রলয়েরই রেখা; ক্রয়ের প্রলয়পিনাকের মতো তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সংগীত নাই; এই অন্য শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির যোগেই বিশ্বের যত কিছু ছন্দ। আমাদের এই জগৎকাব্য মিত্রাকর—পদে পদে তাহার জুড়িজুড়ি মিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছন্দটি যত স্পষ্ট এবং বাধাহীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে ভ্রমেন নহে। সেখানেও এই সংকোচন ও প্রসারণের তত্ত্বটি আছে—কিন্তু তাহার সামঞ্জস্যটিকে আমরা সহজে রাখিতে পারি না। বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সময়ে স্বপ্নের এক প্রান্তে আসিয়া এমনি খুঁকিয়া পড়ি যে অন্য প্রান্তে কিরিতে বিলম্ব হয় তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ক্রটি সারিয়া লইতে গলদঘর্ম হইয়া উঠিতে হয়। একদিকে আত্ম একদিকে পর, একদিকে অর্জন একদিকে বর্জন, একদিকে সংযম একদিকে স্বাধীনতা, একদিকে আচার একদিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই তাল-অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনার ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।

গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতি-সংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ ক্রটিক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমদিকেই আমরা আৰ্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্যের প্রতি আৰ্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কা আৰ্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আৰ্যেরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আৰ্য উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া

বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না। আপনাদের সামান্য বাহ্য ভেদগুলিকেই বড়ো করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াই আর্ষেরা আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

বিশ্বের সকল পদার্থের মতো সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে—তাহার একপ্রান্তে বিচ্ছেদ, আর এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্বর্ণের ভেদরক্ষার দিকে আর্ষদের যে আত্মসংকোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল ধামিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দ-তত্ত্বের নিয়মে আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহাসকে একদিন ফিরিতে হইয়াছিল।

অনার্ঘদের সহিত বিরোধের দিনে আর্ষসমাজে যাহারা বীর ছিলেন, জানি না তাঁহারা কে। তাঁহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া তো বর্ণিত হয় নাই। হয়তো জনমেজয়ের সর্পসত্ত্বের কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষাশুক্রমিক শত্রুতার প্রতিহিংসা সাধনের জন্য সর্প-উপাসক অনার্ঘ নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জনমেজয় নিদারুণ উদ্যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণকথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বটে তবু এই রাজ্য ইতিহাসে তো কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।

কিন্তু অনার্ঘদের সহিত আর্ষদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসারে যিনি সকলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর্ষ অনার্ঘের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটি মহা উদ্যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্যোগের নেতাক্রমে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিন জনের মধ্যে কেবল মাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে একটা এক অভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা—এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়—তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া নক্ষত্র আছে, কালের ব্যবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ঐক্য



হাঁরাইয়া যায়—কিন্তু আভ্যন্তরিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হইয়া মিলিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য নহে।

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণ-কথায় যেমন রাজা আর্চার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সেইরূপ আর্ষ ইতিহাসগত একটি বিশেষ ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছেন, রাজা আর্চার মধ্যযুগের যুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের একটি বিশেষ খ্রীষ্টীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত লড়াই করিতেছেন এই যেমন দেখি, তেমনি ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধিদলের সহিত দীর্ঘকাল যোঁরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।

তখনকার কালের নবক্ষত্রিয়দের এই ভাবটা কী, তাহার পুরা-পুরি সমস্তটা জানা এখন অসম্ভব, কেননা বিপ্লবের জয় পরাজয়ের পরে আবার যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রক্ষা হইয়া গেল তখন সমাজের মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি আর পৃথক হইয়া রহিল না এবং ক্ষতচিহ্নগুলি যত শীঘ্র জোড়া লাগিতে পারে তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন নূতন দলের আদর্শকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় আপন স্থান গ্রহণ করিলেন।

তথাপি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদর্শের প্রভেদ কোন্ পথ দিয়া কী আকারে ঘটিয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞবিধিগুলি কৌলিকবিদ্যা। এক এক কুলের আর্ষদলের মধ্যে এক একটি কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ স্তবমন্ত্র ও দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিধিবিধান রক্ষিত ছিল। যাহারা এই সমস্ত ভালো করিয়া জানিতেন পৌরোহিত্যে তাঁহাদেরই বিশেষ যশ ও ধনলাভের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই ধর্মকার্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল এবং কুলপণের ধনের মতো ইহা সকলের পক্ষে সূগম ছিল না। এই সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র বিধি বিশেষরূপে আয়ত্ত ও তাহা প্রয়োগ করিবার ভার স্বভাবতই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর ছিল। আত্মরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকারে ঋষাদিগকে নিরস্ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাহারা এই কাজের ভার লইতে পারেন না, কারণ ইহা দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অভ্যাস সাপেক্ষ। কোনো এক শ্রেণী এই সমস্তকে রক্ষা করিবার ভার



যদি না লন তবে কৌলিকসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং পিতৃপিতামহদের সহিত যোগধারা নষ্ট হইয়া সমাজ শৃঙ্খলাভেদ হইয়া পড়ে। এই কারণে যখন সমাজের একশ্রেণী যুদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নব নব অধ্যবসায়ে নিযুক্ত তখন আর-এক শ্রেণী বংশের প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত অরণীয় ব্যাপারকে বিস্মৃত ও অবিকল্পিত করিয়া রাখিবার জন্যই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু যখনই বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখনই সমস্ত জাতির চিত্তবিকাশের সঙ্গে তাহার ধর্মবিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পড়িয়া যায়। কারণ সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্মবিধিগুলিকে বাঁধের মতো এক জায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন সুতরাং সমস্ত জাতির মনের অগ্রসরগতির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামঞ্জস্য এতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় যে, অবশেষে একটা বিপ্লব ব্যতীত সমস্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। এইরূপে একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্ষদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগলাইয়া বসিয়াছিলেন, যখন সেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়লাভে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন। এইজন্যই তখন আর্ষদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয়সমাজ। শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মতো এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। যত্নের সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্যের স্বাভাব্য রক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের বহুরূপ জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘটপ্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথমূলক বাহ্যচুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ বিস্তারের উপলক্ষ্যে সমস্ত আর্ষদের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যস্তরে একই যে সত্যপদার্থ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিজ্ঞা হইয়া উঠিয়া ঋক যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিজ্ঞা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সমস্তে বন্ধিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।

সমাজে যখন একটা বড়ো ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয় তখন তাহা একান্তভাবে কোনো গড়িকে মানে না। আর্ষজাতির নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ যতই

পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল ততই সমাজের সর্বত্রই এই অমূল্যভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে, দেবতারা নামে নানা কিন্তু সত্যে এক ;—অতএব বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব ও বিশেষ বিধিতে সন্তুষ্ট করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় এই ধারণা সমাজের সর্বত্রই ক্ষয় হইয়া দলভেদে উপাসনাভেদ স্বভাবতই ঘুচিবার চেষ্টা করিল। তথাপি ইহা সত্য যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা অমূল্য আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রভেদটি সামান্য নহে। ইহা একেবারে বাহিরের দিক ও অন্তরের দিকের ভেদ। বাহিরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি রাখি তখনই আমরা কেবলই বহুকে ও বিচিত্রকে দেখিতে পাই, অন্তরে যখন দেখি তখনই একের দেখা পাওয়া যায়। যখন আমরা বাহ্যশক্তিকেই দেবতা বলিয়া জানিয়াছি তখন মন্ত্রতন্ত্র ও নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহির হইতে বিশেষভাবে আপনাদের পক্ষতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য বাহিরের বহু শক্তিই যখন দেবতা তখন বাহিরের নানা অমুষ্ঠানই আমাদের ধর্মকাৰ্য্য এবং এই অমুষ্ঠানের প্রভেদ ও তাহারই গুণশক্তি-অনুসারেই ফলের তারতম্য কর্তন।

এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল, সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরিগ্রহ-স্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদ—তাহা চিরকালের মতো ধ্যানরত স্থির ;—আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়ালীল হস্ত কেবলই নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্যকে বিকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অমূল্য না হয় তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই গো চাই, আয়ু চাই, শত্রুপরাজব চাই ; যাগযজ্ঞ-অমুষ্ঠানের ক্রটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অগ্রসর হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদের অতিক্রান্ত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়—সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নিগূর্ণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ হুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই এককে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে

পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে এককে না মানিলে ভক্তি হয় না। বৈতবাদী যিহুদিদের দূরবর্তী দেবতা ভয়ের দেবতা, শাসনের দেবতা, নিয়মের দেবতা। সেই দেবতা নূতন টেস্টামেন্টে যখন মানবের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন তখনই তিনি প্রেমের দেবতা ভক্তির দেবতা হইলেন। বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যগীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনই সেই অস্বরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এই অমৃত ব্রহ্মবিজ্ঞার আনুষ্ঠানিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু।

বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণবধর্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন কিন্তু গোড়ার যে তাহা করেন নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞকলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন—বহুপল্লবিত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে কেলিয়া ভক্তি-ধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল তখন সেই সঙ্ক্ষিপ্তে একটা বড়ো ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া যাহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।

এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত ধর্ম, তাহার একটি প্রমাণ একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই—এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক যজ্ঞ ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই—প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয়দের এই ভক্তিধর্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল।

বুদ্ধিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উজ্জ্বল উদ্গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবন্ধ হইয়া আছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে



আশ্রয় করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পরের বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক রাজা ছিলেন যাহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের বিজ্ঞা বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া বোদন করিতেছিল, হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উত্তত হইয়াছিলেন; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। সেই জরাসন্ধ রাজা তখনকার ক্ষত্রিয়দের শত্রু-পক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন। ভীমার্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করাইয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের অন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের সেই অত্যাতিরিক্ত প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ—কৃপ ও অন্বথামাও বড়ো সামান্য ছিলেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। বলিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম, বলিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিত-বংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বলিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পক্ষা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে এই কাব্য যখন জাতীয়সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্বতিকে কোনো এক রাজবংশের

পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত জ্ঞেয়তাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া রটাইয়াছে।

রামচন্দ্র যে নব্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার আর এক প্রমাণ আছে। একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্ভব পরশুরামের ত্রাত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অস্বাভাবিক করা যায়, ঐক্যসাধনত্রাত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্বেই কতক বীর্ষবলে কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্যেই এই উদার বীর্ষবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মূল কথা এই, জনক ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছিল। এ বিদ্যা কেবল মাত্র তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল না ; এ বিদ্যা তাঁহার সমস্ত জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ; তিনি তাঁহার রাজ্যসংসারের বিচিত্র কর্মের কেন্দ্রস্থলে এই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবিচলিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। চরমতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের আশ্চর্য যোগসাধন ইহাই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের সর্বোচ্চ কীর্তি। আমাদের দেশে যাহারা ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা ভাগকেই ভোগের পরিণাম করিয়া কর্মকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জনক একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অন্বেষণ, আর এক দিকে স্বহস্তে হলচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জানিতে পারি কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্থসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ত্রাতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আর্থদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই খেতুই অরণ্যপ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বনভূমিতে গোচারণ সহজ ; তপোবনে যাহারা শিয়রূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকি তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

অবশেষে একদিন বনজরী ক্ষত্রিয়েরা আর্থাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের স্বলে কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় যুরোপীয়



ঔপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন, তখন যেমন যুগযাজ্ঞবী আরণ্যকগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল— ভারতবর্ষেও সেক্ষণ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষিব্যাপার কেবলই বিষসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে যাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন—ইহা হইতেই জানা যায় আর্ষাবর্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আর্ষ উপনিবেশ আপনার সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তখন দুর্গম বিজ্ঞাচলের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল এবং দ্রাবিড়সভ্যতা সেই দিকেই প্রবল হইয়া আর্ষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ বীরপরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি বেদের দেবতাকে পরাস্ত করিয়া আর্ষদের যজ্ঞের বিষ ষটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে স্বকীয় দলের দেবতার প্রভাব প্রকাশ পায় পৃথিবীতে সকল সমাজেরই বিশেষ অবস্থায় এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে—কোনো পক্ষের পরাভবে সে পক্ষের দেবতারই পরাভব গণ্য হয়। রাবণ আর্ষদেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এই যে লোকশ্রুতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ইহার অর্থই এই যে, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি বৈদিক দেবতার উপাসকদিগকে বারংবার পরাভূত করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিবে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আর্ষসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্ষদের কৃষিবিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিজ্ঞাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্টার সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনু ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালন-রেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। তখনকার অনেক বীর রাজাই এই সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা হরধনু ভাঙিতে পারেন নাই, এইজন্য রাজর্ষি জনকের কন্যাকে লাভ করিবার গৌরব হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুঃসাধ্য ক্রতের অধিকারী কে হইবেন, ক্ষত্রিয় তপস্বিগণ সেই সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। একদা বিশ্বামিত্রের সেই সন্ধান রামচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া সার্থক হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব ব্রাহ্মসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের

অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পায়ণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্ততম ঋষি গোতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন ; তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রযি বিশ্বামিত্রের শিশু আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন ।

অকস্মাৎ ষৌবরাজ্য-অভিষেক বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ স্ফুটিত হইয়াছে । রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল—এবং স্বভাবতই অস্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল । বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এই জন্ত একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন । সেই নির্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাহার সেই ব্রত । এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও ব্রাহ্মণদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন ।

আর্য অনার্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা আগ্রত রাধিয়া যুদ্ধের দ্বারা নিধনের দ্বারা তাহার সমাধানের প্রয়াস অস্তহীন দুশ্চেষ্টা । প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে ইহার মীমাংসা হইলেই এত বড়ো বৃহৎ ব্যাপারও সহজ হইয়া যায় । কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিসটা তো ইচ্ছা করিলেই হয় না । ধর্ম যখন বাহিরের জিনিস হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয়সম্পত্তির মতো অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই ঘুচিতে চায় না । জ্যু-দের সঙ্গে জেন্টাইলদের মিলনের কোনো সেতু ছিল না । কেননা জ্যু-রা জিহোভাকে বিশেষভাবে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই জানিত এবং এই জিহোভার সমস্ত অঙ্গুশাসন, তাহার আদিষ্ট সমস্ত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে জ্যু-জাতিরই পালনীয় এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল । তেমনি আর্য দেবতা ও আর্য-বিধিবিধান যখন বিশেষ আতিগতভাবে সংকীর্ণ ছিল তখন আর্য অনার্যের পরস্পর সংঘাত, এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ছাড়া, কিছুতেই মিটিতে পারিত না । কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণা যখন বিশ্বজনীন হইয়া উঠিল—

১. অসম্ভব হইল “ব্রাহ্মস-ব্রহ্ম” নামক একটি স্বাধীনচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাণ্ডুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই “অহল্যা” শব্দের এই তাৎপর্যবাহী আমি দেখিলাম । লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার দিকট আমি কৃতজ্ঞতা বীকার করিতেছি ।

বাহিরের ভেদ বিভেদ একান্ত সত্য নহে এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্পনা হইতে দৈব বিভীষিকাসকল যখন চলিয়া গেল তখনই আৰ্য অনার্যের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইল। তখনই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের দেবতা অস্ত্রের ভক্তির দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শাস্ত্র ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূত্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিত্রের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন সমাজের প্রতি কর্তব্যের অমুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আৰ্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচাররক্ষার অমুকুল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিত্রের মধ্যে যে একটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অঙ্গুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিত্রকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিচ্ছেদের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্তার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মতো বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিজ্ঞাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারই চরিত্রকে সমাজ পুরাতন বিধিবদ্ধনের অমুকুল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীৰ প্রকাশ করিয়াছিলেন আর একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

তৎসত্ত্বেও এ কথা ভাবতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালের মিত্রা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষম্য করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব



নহে তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিধেবিরোধকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্থ অনার্থের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নৃত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্ষের জাতির অনেকেই মধ্যে এক একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্দায় রামচন্দ্র যে অনার্থ-দলকে বশ করিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল ভো বানর নহে রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র এই যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, যে-কোনো মহাত্মাই বাহুধর্মের স্থলে ভক্তিধর্মকে আগাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং পূজা লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিখ, শূক, কবিরপদী প্রভৃতি সর্বত্রই দেখিতে পাই, ভক্তি যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অল্পবর্তীদের কাছে তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ভগবানের সহিত ভক্তের অন্তরতম যোগ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তাহারাও যেন দেবত্বের সহিত মহাত্ম্যের ভেদসীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে হুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্থদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সন্ত্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সেই যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এই দক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্মও ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দক্ষিণাত্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার এক দ্বার ভক্তিশ্রোত ও আর-এক দ্বার অষ্টভুজান উন্মুসিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্রাবিত করিয়া দিল।

আমরা আর্থের ইতিহাসে সংকোচ ও প্রসারণের এই একটি রূপ দেখিলাম। মানুষের একদিকে তাহার বিশেষত্ব আর একদিকে তাহার বিশ্বত্ব এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আশ্চর্যজনক শক্তির দিকে

ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণ শক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাধিয়া লইয়াছে। যুরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষে চিরদিন ব্রাহ্মণদের এই কাজটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাবে করিয়াছেন যেন এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ নামক একটি বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণির চাতুরী। তাঁহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যথার্থ জাতিগত ভেদ নাই, তাহারা একই জাতির দুই স্বাভাবিক শক্তি। ইংলণ্ডে সমস্ত ইংরেজ জাতি লিবারাল ও কন্সারভেটিভ এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে—ক্ষমতা লাভের জন্য এই দুই শাখার প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবাদও আছে, কৌশলও আছে, এমন কি, ঘৃণা এবং অন্তায়ও আছে, তথাপি এই দুই সম্প্রদায়কে যেমন দুই স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের মতো করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হয়—বস্তুত তাহারা প্রকৃতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তির মতো বাহিরে দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু অন্তরে একই সৃজনশক্তির এ-পিঠ ও-পিঠ, তেমনি ভারতবর্ষে সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতি-শক্তি দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়াছে—কোনো পক্ষেই তাহা কৃত্রিম নহে।

অবে দেখা গিয়াছে বটে ভারতবর্ষে এই স্থিতি ও গতি-শক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই এখানকার সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্যই তাহার কারণ এমন অদ্ভুত কথা ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে জাতি-সংঘাত ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংঘাত। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এতই গুরুতর যে এই প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতে ভারতবর্ষের আত্ম-রক্ষণীশক্তিই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আত্মপ্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতাবৃত্তি পদে পদে আপনাকে আগ্রত রাখিয়াছে।

ভুয়ারায়ত আত্ম-গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাধিয়া বাধিয়া অগ্রসর হয়—তাহারা চলিতে চলিতে আপনাকে বাধে, বাধিতে বাধিতে চলে—সেখানে চলিবার উপায় স্বভাবতই এই প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা চালকদের কৌশল নহে। বন্দিশালার যে বন্ধনে স্থির করিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির সহায়। ভারতবর্ষেও সমাজ কেবলই দড়িদড়া লইয়া আপনাকে বাধিতে বাধিতে চলিয়াছে কেননা নিজের পথে অগ্রসর



হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া অন্তের পথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এই জন্যই ভারতবর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণীশক্তি আত্মপ্রসারণী শক্তির অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

রামচন্দ্রের জীবন আলোচনার আমরা ইহাই দেখিলাম যে ক্ষত্রিয়েরা একদিন ধর্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে পাইয়াছিলেন যাহাতে অনার্যদের সহিত বিরুদ্ধতাকে তাঁহারা মিলননীতির দ্বারাই সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোনো সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না—হয় এক পক্ষকে মারিতে, নয় দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে এই ধর্ম ও এই মিলননীতি বাধা পাইয়াছিল কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

আর্যে অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্ষউপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্যেরা কখনো অনার্যেরা জয়ী হইতেছিল। কুষের অমুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ-অশুরের কন্তা উষাকে কুষের পোত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন—এই সংগ্রামে কুষ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, সেই উপলক্ষ্যে শিবের অনার্য অমুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক ক্রত্বের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্ষ অনার্যের এই ধর্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে ক্রত্বের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে—সেই সংগ্রামে ক্রত্ব বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্ষদের সহিত অনার্যদের যজ্ঞের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মরক্ষণীশক্তি বারংবার সীমানির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধে বাঁধিয়া দিয়াছে। মজুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্তি-পূজা-ব্যবসারী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে যুগা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যজ্ঞ ও ধর্মে অনার্যদের মিলনকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার

প্রয়াস কোনো দিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্তেই সংকোচন আপনাকে বায়ংবার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহারই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসম্রাটকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ডশক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের দ্বারা নহে, এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না ক্ষত্রিয় তাপস বৃদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গুরু প্রভাব ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সেটা সম্পূর্ণ ভালো হইয়াছিল এমন কথা কোনোমতেই বলিতে পারি না। এইরূপ একপক্ষের ঐকান্তিকতায় জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণেই বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া ঘেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনোকালেই করে নাই। এতদিন ভারতবর্ষে আর্ষ অনার্ষের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংঘর্ষ ছিল— মাঝে মাঝে বাধ বাধিয়া প্রলয়স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল। আর্ষজাতি অনার্ষের কাছ হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিতেছিল তাহাকে আর্ষ করিয়া লইয়া আপন প্রকৃতির অনুরাগত করিয়া লইতেছিল—এমনি করিয়া ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়িয়া আর্ষে অনার্ষে একটি আন্তরিক সংস্রব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই মিলন-ব্যাপারের মাঝখানে কোনো এক সময়ে বাধা-বাধি ও বাহ্যিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছিল, নহিলে এত বড়ো বিপ্লব উৎপন্ন হইতেই পারিত না এবং সে বিপ্লব কোনো সৈন্তবল আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র ধর্মবলে সমস্ত দেশকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই ভূতপূর্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হইয়া একেবারে সমাজের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। রোগের আক্রমণও যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি সংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা যখন সরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলো ভাঙিয়া গিয়াছে। যে একটি ব্যবস্থার ভিত্তর দিয়া ভারতবর্ষের

জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল—যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।

তাহার প্রধান কারণ এই, একদিন ভারতসমাজে কখনো ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষত্রিয় যখন প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন তখনও উভয়ের ভিতরকার একটা জাতিগত ঐক্য ছিল। এইজন্য তখনকার জাতি-রচনাকার্য আর্ষদেব হাতেই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের সময় কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনাধেবা নহে ভারতবর্ষের বাহির হইতেও অনাধেবের সমাগম হইয়া তাহারা এমন একটি প্রবলতা লাভ করিল যে আর্ষদেব সহিত তাহাদের সুবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। যতদিন বৌদ্ধধর্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য অস্বাস্থ্য আকারে প্রকাশ পায় নাই কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন তাহা নানা অদ্ভুত অসংগতিক্রমে অবাধে সমস্ত দেশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

অনাধেবা এখন সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া একেবারে সমাজের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে সুতরাং এখন তাহাদের সহিত ভেদ ও মিলন বাহিরের নহে তাহা একেবারে সমাজের ভিতরের কথা হইয়া পড়িল।

এই বৌদ্ধপ্রাবনে আর্ষসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিল কারণ আর্ষজাতির স্বাভাব্য রক্ষার ভার চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন তখনও ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনাধেবের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রায় কোনো বাধা ছিল না তাহা পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য দেখা যায় বৌদ্ধযুগের পরবর্তী অধিকাংশ রাজবংশ ক্ষত্রিয়বংশ নহে।

এদিকে শক ছন প্রভৃতি বিদেশীয় অনাধীগণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবাধে মিশিয়া বাইতে লাগিল—বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই সমস্ত বন্টার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল। কারণ, বাধা দিবার ব্যবস্থাটা তখন সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে দুর্বল। এইরূপে ধর্মকর্মে অনাধিসংমিশ্রণ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্বপ্রকার অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যখন কোনো সংগতির সূত্র রহিল না তখনই সমাজের অন্তরস্থিত আর্ষপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। আর্ষপ্রকৃতি নিজেকে



হারাইয়া কেলিয়াছিল বলিয়াই নিজেকে স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার একটা চেষ্টা উদ্ভূত হইয়া উঠিল।

আমরা কী এবং কোন্ জিনিসটা আমাদের—চারিদিকের বিপুল বিপ্লবিতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধসমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার কলেবরটাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেছিল না। এইজন্য আর্য জনশ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্যসীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সজ্জাকে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে, সামাজিক প্রলয়ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত স্মৃতিগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহ-কর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। ষথার্থ বৈদিককালে মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালীগুলিকে সমাজ যত করিয়া শিখিয়াছে ও রাখিয়াছে, তবু তখন তাহা শিক্ষণীয় বিজ্ঞামাত্র ছিল এবং সে বিজ্ঞাকেও সকলে পরাবিজ্ঞা বলিয়া মানিত না।

কিন্তু একদিন বিপ্লবিত সমাজকে বাধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার দরকার হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে নানা লোক নানা প্রকার তর্ক করিতে পারিবে না—যাহা আর্যসমাজের সর্বপুরাতন বাণী; যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিবুদ্ধসম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এই জন্য বেদ যদিচ প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে তখন অনেক দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি দূরের জিনিস বলিয়াই তাহাকে দূর হইতে মান্য করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিষ্ঠা-কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ধণ্ড ধণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হইল।

যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন, তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিসূত্রও তো চাই—সেই পরিধিসূত্রেই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক

করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আৰ্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্র্যনৈতিকতাও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আৰ্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আৰ্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এইসমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিস্মিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আৰ্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আৰ্যজাতির ইতিহাস আৰ্যজাতির স্বতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসংগত কিছু বা পরস্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতস-কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরশ্মি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটাই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারতইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্তার মীমাংসা কোনো তত্ত্ব-নির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে—নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেক মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরম-তত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্র-ভাবে, এমন কি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে যুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজ্জাকর অসংগতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে



তাহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার—অর্থাৎ তাহাদের মতে ইহার মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার পরবর্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা। হইতেও পারে মূল ভগবদ্গীতা ভারতবর্ষের সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিষ্ট, কিন্তু মহাত্মার তৎকালনের যুগে সেই মূলের বিস্তৃতি-রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না—সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্তব্যপথ নির্দেশ করা হইয়াছে সে গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হউক যোগই হউক বেদান্তই হউক সকল তত্ত্বেরই কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন, তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ মানবজীবনের পরমাগতি, তাহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌছিতে পারে না; অতএব ভারতচিন্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাত্মার দেখা। তাই মহাত্মার এই গীতার মধ্যে লজ্জিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য, অতএব এক জায়গায় মিল আছেই। এমন কি, গীতার যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞ-ব্যাপার এমন একটি বড় ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন।

এইরূপে ইতিহাসের নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে তখনকার কালের প্রতিভা যেমন একটি মূলমন্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল তেমনি বেদের মধ্য হইতেও তাহা একটি মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মসূত্র। তখনকার ব্যাসের এও একটি কীর্তি। তিনি যেমন একদিকে ব্যক্তিকে রাখিয়াছেন আর-একদিকে তেমনি সমষ্টিকেও

প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন ; তাঁহার সংকলন কেবল আয়োজনমাত্র নহে তাহা সংযোজন, শুধু সংকলন নহে তাহা পরিচয়। সমস্ত বেদের নানা পথের দ্বিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও একটি লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই বেদান্ত। তাহার মধ্যে একটি দৈতেরও দিক আছে একটি অদৈতেরও দিক আছে কারণ এই দুইটি দিক ব্যতীত কোনো একটি দিকও সত্য হইতে পারে না। লজ্জিক ইহার কোনো সমস্বয় পায় না, এইজন্য যেখানে ইহার সমস্বয় সেখানে ইহাকে অনির্বচনীয় বলা হয়। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈত অদ্বৈত দুই দিককেই রক্ষা করা হইয়াছে। এই জন্য পরবর্তীকালে এই একই ব্রহ্মসূত্রে লজ্জিক নানা বাদ বিবাদে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত ব্রহ্মসূত্রে আৰ্যধর্মের মূলতত্ত্বটি দ্বারা সমস্ত আৰ্যধর্মশাস্ত্রকে এক আলোকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেবল আৰ্যধর্ম কেন সমস্ত মানবের ধর্মের ইহাই এক আলোক।

এইরূপে নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা পীড়িত আৰ্যপ্রকৃতি একদিন আপনার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনার মূল ঐক্যটি লাভ করিবার জন্য একান্ত যত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, আৰ্য জাতির বিধিনিষেধগুলি যাহা কেবল স্মৃতিরূপে নানাস্থানে ছড়াইয়া ছিল এই সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন—ইহা ভাবগত যুগ—অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না। বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তাহা স্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব—শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্বেও যে অল্প বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারাপরম্পরা যাহা গোঁতমবুদ্ধে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগও তেমনি কবে আরম্ভ তাহা স্থির করিয়া বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের মধ্যে ছড়ানো ও ফুড়ানো এক সঙ্গেই চলিতেছে। যেমন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। ইহা যে পুরাতন পক্ষ ও নূতন পক্ষের বোঝাপড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। একপক্ষ বলিতেছেন যেসকল মন্ত্র ও কৰ্মকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনাদি, তাহার বিশেষ গুণবশতই তাহার দ্বারাই চরমসিদ্ধি লাভ করা যায়। অপর পক্ষ বলিতেছেন জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুক্তি নাই। যে দুই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া এই দুই মত বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার রচনাকাল যখনই হইক এই মতবৈধ যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আৰ্যসমাজের যে উত্তম আপনার সামগ্রাণ্ডলিকে বিশেষভাবে

সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সংকলন করিয়া স্বজাতির প্রাচীন পথটিকে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। আৰ্য অনাৰ্যের চিরন্তন সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি চিরকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে ; ইহাই আমাদের বক্তব্য।

একথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনাৰ্যেরা আমাদের দিবার মত কোনো জিনিস দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতার হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দুসভ্যতা, রূপে বিচিত্র, ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিজ্ঞান তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ দেবতার বধু ছিল কলাবধু। আৰ্যদের বিস্তৃত তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আৰ্যও নহে সম্পূর্ণ অনাৰ্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয়প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে না মেলে সেখানে মৃত্যুতা ও অন্ধ সংস্কারের আর অস্ত থাকে না ; যেখানে মেলে সেখানে অনন্তের অস্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্বত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন একটি জিনিস পাইয়াছে যাহাকে ঠিকমত ব্যবহার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মৃত্যুর ভারে ধূলিলুপ্তিত করিয়া দেয়। আৰ্য ও দ্রাবিড়ের এই চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধতার সম্মিলন যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে সেখানে সৌন্দর্য জাগিয়াছে, যেখানে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কদৰ্ভতার সীমা দেখি না। একথাও মনে রাখিতে হইবে শুধু দ্রাবিড় নহে, বরং অনাৰ্যদের সামগ্রীও একদিন দ্বার খোলা পাইয়া অসংকোচে আৰ্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই অনধিকার প্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে সূতীত্ব হইয়া ছিল।

যুদ্ধ এখন বাহিরে নহে যুদ্ধ এখন দেহের মধ্যে—কেননা অস্ত্র এখন শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে, শত্রু এখন ঘরের ভিতরে। আৰ্য সভ্যতার পক্ষে ব্রাহ্মণ এখন একমাত্র। এই অস্ত্র এই সময়ে বেদ যেমন অস্ত্রান্ত্র ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপ সমাজে সর্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। ভখনকার পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এই চেষ্টা এমনি প্রবল আক্রমণে পুনঃপুন



প্রকাশ পাইতেছে যে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহা একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রয়াস, তাহা উজ্জানস্রোতে গুণটানা, এইজন্ত গুণবন্ধন অনেকগুলি এবং কঠিন টানের বিরামমাত্র নাই। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোনো একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতা-লাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সংকীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেখা হয়। এ চেষ্টা তখনকার সংকটগ্রস্ত আৰ্যজাতির অন্তরের চেষ্টা। ইহা আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস। তখন সমস্ত সমাজের লোকের মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারিদিকে ভাঙিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল। এক, পূর্বধারাকে রক্ষা করা, আর এক, নূতনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনীপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অনার্যদেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক ক্রত্ৰ উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আৰ্য-দেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মার আৰ্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।

শিব যদিচ ক্রত্ৰনামে আৰ্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আৰ্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আৰ্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্বাস সম্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী গঞ্জিকা ও ভাং ধুতুরায় উন্মত্ত। আৰ্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিকূপ এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন; অশ্বদিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি স্বপ্নানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। একদিকে প্রকৃষ্টিকে শাস্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অশ্বদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি বাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্রেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

এইরূপে আৰ্য অনার্যের ধারা গজায়মূনার মতো একত্র হইল ভবু তাহার দুই রং পাশাপাশি রহিয়া গেল। এইরূপে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও কৃষ্ণের নামকে আশ্রয় করিয়া যেসমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পাণ্ডবসখা জাগবতধর্মপ্রবর্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকা-পুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে। বৈষ্ণব ধর্মের একদিকে ভগবদ্গীতার বিস্তৃত অবিমিশ্র

উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর-একদিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল। শৈবধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিসগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদাক্ষণ ; তাহার শাস্তি এবং তাহার মন্তব্য তাহার স্বাধুৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্যম তাণ্ডবনৃত্য উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই আৰ্য-সভ্যতার অধৈতনুত্র। ইহাই নেতি নেতির দিক—ত্যাগ ইহার আভরণ, আশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী আৰ্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্যের এবং যৌবনের লীলা ; প্রলয়পিনাকের স্থলে সেখানে বাপির ধ্বনি ; ভূতপ্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস ; সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলোকধামের চির-ঐশ্বর্য ; এইখানে আৰ্যসভ্যতার দ্বৈতনুত্র।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই যে আভীরসম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার একটি সত্যপথ ছিল। নারক নারিকার সম্বন্ধকে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপক ভাবে পৃথিবীর নানাস্থানেই মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আৰ্যবৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে অনার্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেইসমস্ত কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া লইল। অনার্যের চিন্তে যাহা কেবল রসমাদকতারূপে ছিল আৰ্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণকথারূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল। আৰ্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতার সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে—এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে।

আৰ্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতত্ত্ব, অনার্যসমাজের মূলে মাতৃশাসনতত্ত্ব। এইজন্য বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। আৰ্যসমাজে অনার্যপ্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাচুর্য্য ঘটিতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীভক্তের মধ্যেও একদিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আৰ্যমূর্তি অন্তরিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্যমূর্তি।

কিন্তু সমস্ত অনার্য অনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনাকাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আৰ্যভাবের ঐক্যনুত্রে আত্মোপাস্ত মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর



হয় না—তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার মধ্যে ঋত সহস্র অসংগতি থাকিয়া যায়। এইসমস্ত অসংগতির কোনোপ্রকার সমধর হয় না—কেবল কালক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে অসংগতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে, বাহার বৈরুপ শক্তি ও প্রবৃত্তি সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাকে। ইহা একপ্রকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া নীতি। যখন বিরুদ্ধগুলিকে পাশে রাখিতেই হইবে অথচ কোনো মতেই মিলাইতে পারা যাইবে না, তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই পারে না।

এইরূপে বৌদ্ধযুগের প্রলয়াবসানে বিপর্যস্ত সমাজের নূতন পুরাতন সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ লইয়া ত্রাঙ্গণ যেমন করিয়া পারে সেগুলিকে সাজাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বসিল। এমন অবস্থায় স্বভাবতই শৃঙ্খল অভ্যস্ত কঠিন হইয়া উঠে। বাহারা স্বতই স্বতন্ত্র, বাহারা নানা জাতির নানা কালের সামগ্রী, তাহাদিগকে এক করিয়া বাধিতে গেলে বাধন অভ্যস্ত জট করিয়া বাধিতে হয়—তাহারা জীবনধর্মের নিয়ম অনুসারে আপনার যোগ আপনিই সাধন করে না।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ভযুগে যখন আর্য অনার্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিরোধ ছিল। এই প্রকার বিরোধের মধ্যেও এক প্রকারের সমকক্ষতা থাকে। মানুষ বাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে তীব্রভাবে ঘেঁষ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এই জন্ত ক্ষত্রিয়েরা অনার্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ ধরিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী যুগে যখন আর-একদিন অনার্য বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল অনার্যেরা তখন আর বাহিরে নাই তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। স্মৃতরাং তখন যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এই জন্ত সেই অবস্থায় বিদেব একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দূরে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, বাহাকে সকল প্রকারে ঘৃণা করা যায় তাহারও মন আপনি খাটো হইয়া আসে; সেও আপনার হীনতার সংকোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনোরূপ অধিকার দাবি করে না। এইরূপ যখন সমাজের একভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর-একভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধাই পায় না—তখন নিচে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে

আত্মপ্রসারণের দিনে যে অনার্যবিষেব ছিল এবং আত্মসংকোচনের দিনে যে অনার্যবিষেব জাগিল উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রথম বিবেকের সমতলটানে মনুষ্যত্ব খাড়া থাকে দ্বিতীয় বিবেকের নিচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। যাহাকে মারি সে যখন কিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি। বেদে অনার্যদের প্রতি যে বিবেক প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূত্রের প্রতি যে একান্ত অশ্রায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে, সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তুত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদাক্ষণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূত্র, যুরোপীয় ও এসিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো, যেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্বনাশকে ঘনাইয়া আনে। বরং ক্ষত্রতা শ্রেয়, কিন্তু ঘৃণা ভয়ংকর।

ব্রাহ্মণ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের একেশ্বর হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সকলকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া বাধিল। ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সংকোচনের যুগ স্বভাবতই ঘটিল।

বিপদ হইল এই যে, পূর্বে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার যোগে সমাজের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল; এখন সমাজে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি আর কাজ করিল না। সমাজের অনার্যশক্তি ব্রাহ্মণশক্তির প্রতি-যোগীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না—ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আপন পরাভবের উপরেও জয়ন্তস্ত স্থাপিত করিল।

এদিকে বাহির হইতে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নামে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সিংহাসনগুলিই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অশ্রান্ত অনার্যদের স্রায় তাহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইয়া একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। এই ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রকৃতিতে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ নহে। ইহারা প্রাচীন আর্য ক্ষত্রিয়দের স্রায় সমাজের সৃষ্টিকার্ষে আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিতে পারে নাই, ইহারা সাহস ও বাহুবল লইয়া ব্রাহ্মণশক্তির সহায় ও অমুর্খ হইয়া বন্ধনকে দৃঢ় করিবার দিকেই সম্পূর্ণ যোগ দিল।

একরূপ অবস্থায় কখনোই সমাজের ওজন ঠিক থাকিতে পারে না। আত্মপ্রসারের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আত্মরক্ষণীশক্তি সংকোচের দিকেই যখন পাকের পর পাক জড়াইয়া চলে তখন জাতির প্রতিভা ক্ষুণ্ণিত পাইতে পারে না। কারণ সমাজের এই বন্ধন একটা কৃত্রিম পদার্থ; এইরূপ শিকল দিয়া বাধার দ্বারা কখনো কলেবর গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশাঙ্কুরে জাতির মধ্যে কালের ধর্মই জাগে ও জীবনের ধর্মই দ্বাস পায়; এরূপ জাতি চিন্তায় ও কর্মে কর্তৃত্বভাবের অযোগ্য হইয়া পরাধীনতার জগতই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আর্থইতিহাসের প্রথম যুগে যখন সমাজের অভ্যাস-প্রবণতা বিস্তার বাহিরের জিনিস জমাইয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল তখন সমাজের চিন্তাবৃত্তি তাহার মধ্যে দিয়া একেবারে পথ সঙ্কান করিয়া এই বহর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিল। আজও সমাজে তেমনি আর একদিন আসিয়াছে। আজ বাহিরের জিনিস আরও অনেক বেশি এবং আরও অনেক অসংগত। তাহা আমাদের জাতির চিন্তাকে ভারগ্রস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে একমাত্র শক্তি আধিপত্য করিতেছে তাহা রক্ষণীশক্তি। তাহা যা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিয়াছে, যাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। জাতির জীবনের গতিকে এইসকল অভ্যাসের জড়সঞ্চয় পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না; ইহা মানুষের চিন্তাকে সংকীর্ণ ও কর্মকে সংকল্প করিবেই;—সেই দুর্গতি হইতে বাচাইবার জন্য এইকালেই সকলের চেয়ে সেই চিন্তাশক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছে যাহা অটলতার মধ্য হইতে সরলকে, বাহ্যিকতার মধ্য হইতে অন্তরকে এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে এককে বাধামুক্ত করিয়া বাহির করিবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিন্তাশক্তিকেই অপরাধী করিয়া তাহাকে সমাজ হাজার শিকলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু এই বন্ধনজর্জর চিন্তা একেবারে চূপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে ঘুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্য যুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবির প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবিরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আকর্ষণকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের প্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উল্লিখ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার পন্থাকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিশুল বিক্লিষ্টতা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিম্নস্তে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্যযুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুগণই অভ্যাস



হইয়াছে—তাহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইহারাই লোকাচার, শাস্ত্রবিধি, ও সমস্ত চিন্তাভ্যাসের বন্ধ দ্বারে কড়াঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে আঁগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই যুগের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিন্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে;— ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক; আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জ্বরগায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনোই তাহার প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা! ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভারতকে এই সমস্ত নিরর্থক বাহুল্যের ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই! তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধ্যরূপে বাধাসংকুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্বত-প্রমাণ বিঘ্নবাহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে—যত বড়ো সমস্যা তত বড়োই তাহার তপস্যা হইবে। যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ভুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মতো হার মানিবে না। একপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। যাহা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা যদি শুদ্ধমাত্র সেখানে পড়িয়াই থাকিত তবে সে অসুবিধা কোনো মতে সহ্য করা যাইত—কিন্তু তাহাকে যে ধোরাক দিতে হয়। জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত—সে এমন কথা যদি বলে যে, যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুষিব তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তি ক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকটকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকটকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের অশ্রু মূঢ়তা, দুর্বলের অশ্রু দুর্বলতা, অনাধারের অশ্রু বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য আঁগাইতে হয় তখন জাতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যাহই তাহার ভাগ

নষ্ট হয় এবং প্রত্যাহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল ও বীৰ্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি বাহা প্রস্তর উচ্চের প্রতি তাহাই বকনা ;—কখনোই তাহাকে ঐদার্য বলা যাইতে পারে না ; ইহাই তামসিকতা—এবং এই তামসিকতা কখনোই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।

ঘোরতর দুর্যোগের নিশীথ অঙ্ককারেও এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই। যে সমস্ত অদ্ভুত দুঃস্বপ্নভার তাহার বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার জন্য তাহার অভিজুত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা যে-কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না ; তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে কিরিয়া পাইবার জন্য উত্তত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাধের উপর বাধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর শ্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার ঘেন মহাসমুদ্রের সংশ্রব পাইয়াছি, আবার ঘেন বিশ্বের জোয়ার ভাটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্ভোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তশ্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে কিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বজাতিকতা তাহাকে ঘরে কিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বদ্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজেকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজেকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজস্বই হারানো হয় সর্বদ্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে সুকৃতি করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।



## আত্মপরিচয়

আমাদের পরিচয়ের একটা ভাগ আছে, যাহা একেবারে পাকা—আমার ইচ্ছা অল্পসারে যাহার কোনো নড়চড় হইবার জো নাই। তাহার আর একটা ভাগ আছে যাহা আমার স্থোপার্জিত—আমার বিজ্ঞা ব্যবহার ব্যবসায় বিশ্বাস অল্পসারে যাহা আমি বিশেষ করিয়া লাভ করি এবং যাহার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে। যেমন মানুষের প্রকৃতি; তাহার একটা দিক আছে যাহা মানুষের চিরন্তন, সেইটেই তাহার ভিত্তি,—সেইখানে সে উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার প্রকৃতির আর একটা দিক আছে যেখানে সে আপনাকে আপনি বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে—সেইখানেই একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্য।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সবই যদি চিরন্তন হয়, কিছুই যদি তাহার নিজে গড়িয়া লইবার না থাকে, আপনার মধ্যে কোথাও যদি সে আপনার ইচ্ছা খাটাইবার আয়গা না পায় তবে তো সে মাটির ঢেলা। আবার যদি তাহার অতীতকালের কোনো একটা চিরন্তন ধারা না থাকে তাহার সমস্তই যদি আকস্মিক হয় কিংবা নিজের ইচ্ছা অল্পসারেই আগাগোড়া আপনাকে যদি তাহার রচনা করিতে হয় তবে সে একটা পাগলামি, একটা আকাশকুসুম।

মানুষের এই প্রকৃতি অল্পসারেই মানুষের পরিচয়। তাহার খানিকটা পাকা খানিকটা কাঁচা, তাহার এক আয়গায় ইচ্ছা খাটে না আর এক আয়গায় ইচ্ছারই সৃজনশীলতা। মানুষের সমস্ত পরিচয়ই যদি পাকা হয় অথবা তাহার সমস্তই যদি কাঁচা হয় তবে দুইই তাহার পক্ষে বিপদ।

আমি যে আমারই পরিবারের মানুষ সে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার পরিবারের কেহ বা মাতাল, কেহ বা বিজ্ঞানগত পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া ঠেকিয়া গেল এবং লোকসমাজেও উচ্চশ্রেণীতে গণ্য হইল না। এই কারণেই আমি আমার পারিবারিক পরিচয়টাকে একেবারে চাপিয়া যাইতে পারি কিন্তু তাহা হইলে সত্যকে চাপা দেওয়া হইবে।

কিংবা হয়তো আমাদের পরিবারে পুরুষাঙ্কুরে কেহ কখনো হাবড়ার পুল পার হয় নাই কিংবা দুইদিন অন্তর গরম জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাই বলিয়া আমিও যে পুল পার হইব না কিংবা স্নানসর্বস্ব আমাকে কার্পণ্য করিতেই হইবে একথা মানা যায় না।

অবশ্য, আমার সাত পুরুষে যাহা ঘটে নাই অষ্টমপুরুষে আমি যদি তাহাই করিয়া বসি, যদি হাবড়ার পুল পার হইয়া যাই তবে আমার বংশের সমস্ত মাসীপিসী ও খুড়ো-জ্যোষ্ঠার দল নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চকুভারকা ললাটের দিকে তুলিয়া বলিবে, “তুই অমুক গোষ্ঠিতে অনিরাও পুল পারাপারি করিতে শুরু করিয়াছিস ! ইহাও আমাদেরকে চক্ষে দেখিতে হইল !” চাই কি লজ্জায় কোভে তাঁহাদের এমন ইচ্ছাও হইতে পারে আমি পুলের অপর পারেই বরাবর থাকিয়া যাই কিন্তু তবু আমি যে সেই গোষ্ঠিরই ছেলে সে পরিচয়টা পাকা। যা মাসীরা রাগ করিয়া তাহা স্বীকার না করিলেও পাকা, আমি নিজে অভিমান করিয়া তাহা অস্বীকার করিলেও পাকা। বস্তুত পূর্ব-পুরুষগত যোগটা নিত্য, কিন্তু চলাকেরাসবন্ধে অভ্যাসটা নিত্য নহে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অস্তুত ব্রাহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অর্থাৎ এ তর্কটা রামমোহন বাবুর মনের মধ্যে একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এদিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রাহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন ; সমাজে নিন্দার কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে, এমন কি যদি কোনো নিরাপদ স্বেচ্ছাপ্রিয় মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না,—কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনো দিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা যে কী, সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা বলিতেছি আমরা আর কিছু নই আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটা তো একটা নূতন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশি দূর যায় না আমি হয়তো কেবলমাত্র গতকল্য ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই ? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটা নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই ?

এরূপ কখনো সম্ভবই হইতে পারে না। অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই ; সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।

কথা এই, সেই আমার অতীতের পরিচয়ে আমি হয়তো গৌরব বোধ করিতে না পারি। সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু এইরূপ যে-সকল গৌরব পৈতৃক তাহার ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে বিধাতা আমাদের সম্মতি লন না, এই সকল সৃষ্টিকার্যে কোনোরূপ ভোটের প্রথাও নাই। আমরা কেহ বা জর্মনির সম্রাটবংশে জন্মিয়াছি আবার কাহারও বা এমন বংশে জন্ম—ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে বা কালো অক্ষরে যাহার কোনো উল্লেখমাত্র নাই। ইহাকে জন্মান্তরের কর্মকল বলিয়াও কথঞ্চিৎ সাধনালভ করিতে পারি অথবা এ সম্বন্ধে কোনো গভীর তত্ত্বালোচনার চেষ্টা না করিয়া ইহাকে সহজে স্বীকার করিয়া গেলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নাই।

অতএব, আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ, বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আপিলআদালতের জজ পাইব কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে, হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে মুসলমানের সঙ্গে আমার যোগ অস্বীকার করা হয়, তাহাতে ঐদার্যের ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে।

বস্তুত পরিচয়মাত্রেরই এই অসুবিধা আছে। এমন কি, যদি আমি বলি আমি কিছুই না, তবে যে বলে আমি কিছুই, তাহার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে; হয়তো সেই সূত্রেই তাহার সঙ্গে আমার মারামারি লাঠাগাঠি বাধিয়া যাইতে পারে। আমি যাহা এবং আমি যাহা নই এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আছে—পরিচয়মাত্রই সেই বিচ্ছেদেরই পরিচয়।

এই বিচ্ছেদের মধ্যে হয়তো কোনো একপক্ষের অপ্রিয়তার কারণ আছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াই হয়তো কোনো একজন বা একদল লোক আমার প্রতি খড়গহস্ত হইতে পারে। এটা যদি আমি বাঞ্ছনীয় না মনে করি তবে আমার সাধ্যমতো আমার তরফ হইতে অপ্রিয়তার কারণ দূর করিতে চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য—যদি এটা কোনো সংগত ও উচিত কারণের উপর নির্ভর না করে, যদি অঙ্গসংস্কারমাত্র হয়, তবে আমার নামের সঙ্গে সঙ্গে এই অহেতুক বিদ্বেষটুকুকেও আমার বহন করিতে হইবে। আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলিয়া শাস্তিস্থাপনের প্রয়াসকে কেহই প্রাশংসা করিতে পারিবে না।

ইহার উত্তরে তর্ক উঠিবে, ওটা তুমি ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিলে। নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অসুবিধা স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু একটা বড়ো জাতির বা সম্প্রদায়ের সমস্ত দায় আমার স্বকৃত নহে সুতরাং যদি তাহা অপ্রিয় হয় তবে তাহা আমি নিঃসংকোচে বর্জন করিতে পারি।



আচ্ছা বেশ, মনে করা যাক, ইংরেজ এবং আইরিশ ; ইংরেজের বিরুদ্ধে আইরিশের হয়তো একটা বিদ্বেষের ভাব আছে এবং তাহার কারণটার জন্ত কোনো একজন বিশেষ ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে দায়ী নহে ; তাহার পূর্বপিতামহেরা আইরিশের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়াছে এবং সম্ভবত এখনও অধিকাংশ ইংরেজ সেই অশ্রদ্ধার সম্পূর্ণ প্রতিকার করিতে অনিচ্ছুক । এমন স্থলে যে ইংরেজ আইরিশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আইরিশকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার জন্ত বলেন না আমি ইংরেজ নই ; তিনি বাক্য ও ব্যবহারে জানাইতে থাকেন তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে । বস্তুত এরূপ স্থলে স্বজাতির অধিকাংশের বিরুদ্ধে আইরিশের পক্ষ লওয়াতে স্বজাতির নিকট হইতে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে সকলে গালি দিবে, তাঁহাকে Little Englander-এর দলভুক্ত ও স্বজাতির গৌরবনাশক বলিয়া সকলে নিন্দা করিবে, কিন্তু তবু এ কথা তাঁহাকে বলা সাজিবে না, আমি ইংরেজ নহি ।

তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনার কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে । এই জগতই সে পরামর্শে সত্য কল পাওয়া যায় না । কারণ, আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই একলা তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি ।

এস্থলে অপর পক্ষে বলিবেন, আমাদের আসল বাধা ধর্ম লইয়া । হিন্দুসমাজ বাহাকে আপনার ধর্ম বলে আমরা তাহাকে আপনার ধর্ম বলিতে পারি না । অতএব আমরা ত্রাস্ত বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায় ; তাহার দ্বারা দুই কাজই হয় । এক, হিন্দুর যে ধর্ম আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ তাহাকে অস্বীকার করা হয় এবং যে ধর্মকে আমি জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া জানি তাহাকেও স্বীকার করিতে পারি ।

এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, ত্রাস্ত বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অস্বরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর একটির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না । যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, “তুমি কি চৌধুরিবংশীয় ?” আর সে, যদি তাহার উত্তর দেয়, “না আমি দণ্ডবির কাজ করি,” তবে প্রমোত্তরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় না । হইতে পারে চৌধুরিবংশের কেহ আজ পর্যন্ত দণ্ডবির কাজ করে নাই, তাই বলিয়া তুমি দণ্ডবির হইলেই যে চৌধুরি হইতে পারিবেই না এমন কথা হইতে পারে না ।

তেমনি, অন্তর্কার দিনে হিন্দুসমাজ বাহাকে আপনার ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে

তাহাই যে তাহার নিত্য লক্ষণ তাহা কখনোই সত্য নহে। এ সম্বন্ধে বৈদিককাল হইতে অষ্ট পর্বন্তের ইতিহাস হইতে নজির সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিতে ইচ্ছাই করি না। আমি একটা সাধারণতত্ত্বরূপেই বলিতে চাই, কোনো বিশেষ ধর্মমত ও কোনো বিশেষ আচার কোনো জাতির নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। ইস্রায়েল পক্ষে জলে সাঁতার যেমন, মানুষের পক্ষে বিশেষ ধর্মমত কখনোই সেরূপ নহে। ধর্মমত জড় পদার্থ নহে—মানুষের বিজ্ঞাবুদ্ধি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে—এই জন্ত ধর্ম কোনো জাতির অবিচলিত নিত্য পরিচয় হইতেই পারে না। এই জন্ত যদিচ সাধারণত সমস্ত ইংরেজের ধর্ম খ্রীষ্টানধর্ম, এবং সেই ধর্মমতের উপরেই তাহার সমাজ-বিধি প্রধানত প্রতিষ্ঠিত তথাপি একজন ইংরেজ বৌদ্ধ হইয়া গেলে তাহার যত অনুবিধাই হউক তবু সে ইংরেজই থাকে।

তেমনি ব্রাহ্মধর্ম আপাতত আমার ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু কাল আমি প্রটেস্ট্যান্ট, পরন্তু রোমানক্যাথলিক এবং তাহার পর দিনে আমি বৈষ্ণব হইতে পারি, তাহাতে কোনো বাধা নাই, অতএব সে পরিচয় আমার সাময়িক পরিচয়,—কিন্তু জাতির দিক দিয়া আমি অতীতের ইতিহাসে এক জায়গার বাধা পড়িয়াছি, সেই স্মৃহংকালব্যাপী সত্যকে নড়াইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই।

হিন্দুরা একথা বলে বটে আমার ধর্মটা অটল; এবং অস্ত্র ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহারা আমাকে অহিন্দু বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তাহাদের এই আচরণ আমার হিন্দু পরিচয়কে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। অনেক দিন পর্বন্ত হিন্দুমাত্রই বৈজ্ঞমতে ও মুসলমান হাকিমিমতে আপনাদের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে। এমন কি, এমন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা থাকিতে পারেন যিনি ডাক্তারি ঔষধ স্পর্শ করেন না। তথাপি অভিজ্ঞতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির চিকিৎসা-প্রণালী বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজও ইহা লইয়া অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন যে বিদেশী চিকিৎসা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক এবং ইহাতে আমাদের শরীর জীর্ণ হইয়া গেল, দেশ উজাড় হইবার জো হইল কিন্তু তবু কুইনীনমিক্চার যে অহিন্দু এমন কথা কোনো তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা আজও প্রমাণের চেষ্টা হয় নাই। ডাক্তারের ভিজিটে এবং ঔষধের উগ্র উপদ্রবে যদি আমি ধনেপ্রাণে মরি তবু আমি হিন্দু এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না। অথচ হিন্দু আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্বন্ত ঋজিলে ঔষধতালিকার মধ্যে কুইনীনের নাম পাওয়া যাইবে না।

এই যেমন শরীরের কথা বলিলাম, তেমনি, শরীরের চেয়ে বড়ো জিনিসেরও কথা বলা যায়। কারণ, শরীর রক্ষাই তো মানুষের একমাত্র নহে, তাহার যে প্রকৃতি ধর্মকে



আশ্রয় করিয়া শূন্য ও বলিষ্ঠ থাকে তাহাকেও বাঁচাইয়া চলিতেই হইবে। সমাজের অধিকাংশ লোকের এমন মত হইতে পারে যে, তাহাকে বাঁচাইয়া চলিবার উপযোগী ধর্ম আয়ুর্বেদ আমাদের দেশে এমনই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো কথা চলিতে পারে না। এটা তো একটা বিশ্বাসমাত্র, এরূপ বিশ্বাস সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, অতএব যে লোকের প্রাণ লইয়া কথা সে যদি নিজের বিশ্বাস লইয়া অস্ত্র কোনো একটা পক্ষা অবলম্বন করে তবে গায়ের জোরে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি কিন্তু সত্যের জোরে পারি না। গায়ের জোরের তো যুক্তি নাই। পুলিশ দারোগা যদি ঘুষ লইয়া বলপূর্বক অন্ত্রায় করে তবে দুর্বল বলিয়া আমি সেটাকে হয়তো মানিতে বাধ্য হইতে পারি কিন্তু সেইটেকেই রাজ্যশাসনতন্ত্রের চরম সত্য বলিয়া কেন স্বীকার করিব? তেমনি হিন্দুসমাজ যদি ধোবানাপিত বন্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া আমাকে বলে অমুক বিশেষ ধর্মটাকেই তোমার মানিতে হইবে কারণ এইটাই হিন্দুধর্ম—তবে যদি ভয় পাই তবে ব্যবহারে মানিয়া যাইব কিন্তু সেইটাই যে হিন্দু-সমাজের চরম সত্য ইহা কোনোক্রমেই বলা চলিবে না। বাহা, কোনো সত্য সমাজেরই চরম সত্য নহে তাহা হিন্দুসমাজেরও নহে, ইহা কোটি কোটি বিকল্পবাদীর মুখের উপরেই বলা যায়—কারণ, ইহাই সত্য।

হিন্দুসমাজের ইতিহাসেও ধর্মবিশ্বাসের অচলতা আমরা দেখি নাই। এখানে পরে পরে যত ধর্মবিপ্রব ঘটনাছে এমন আর কোথাও ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল দেবতা ও পূজা আদি সমাজের নহে তাহাও হিন্দুসমাজে চলিয়া গিয়াছে—সংখ্যা হিসাবে তাহারাই সব চেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষে উপাসকসম্প্রদায়সম্বন্ধে যে কোনো বই পড়িলেই আমরা দেখিতে পাইব হিন্দুসমাজে ধর্মাচরণের কেবল যে বৈচিত্র্য আছে তাহা নহে, তাহার পাশাপাশি আছে, ইহা ছাড়া তাহাদের পরস্পরের আর কোনো ঐক্যমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ধর্ম হিন্দুর ধর্ম, যেটা না মানিলে তুমি আমাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিবে না? তখন এই উত্তর পাওয়া যায়, যে-কোনো ধর্মই কিছুকাল ধরিয়া যে-কোনো সম্প্রদায়ে হিন্দুধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ধর্মের এমনভরো জড়সংজ্ঞা আর হইতেই পারে না। বাহা শ্রের, বা বাহার আন্তরিক কোনো সৌন্দর্য বা পবিত্রতা আছে তাহাই ধর্ম, এমন কোনো কথা নাই;—তুপের মধ্যে কিছুকাল বাহা পড়িয়া আছে তাহাই ধর্ম—তাহা যদি বীভৎস হয়, যদি তাহাতে সাধারণ ধর্মনীতির সংঘম নষ্ট হইতে থাকে তথাপি তাহাও ধর্ম। এমন উত্তর যতগুলি লোকে মিলিয়াই দিক্ না কেন তথাপি তাহাকে আমি আমার সমাজের পক্ষের সত্য উত্তর বলিয়া কোনোমতেই গ্রহণ করিব না। কেননা, লোক গণনা করিয়া ওজন দরে বা গজের মাপে সত্যের মূল্যনির্ণয় হয় না।

নানাপ্রকার অনাধি ও বীভৎস ধর্ম কেবলমাত্র কালক্রমে আমাদের সমাজে যদি স্থান পাইয়া থাকে তবে যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও ভক্তির সাধনায় আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্মদীক্ষার দ্বারা আমি হিন্দুসমাজের মধ্যে আমার সত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব এতবড়ো অন্ত্য আমরা কখনোই মানিতে পারিব না। ইহা অন্ত্য, স্মৃত্যং ইহা হিন্দুসমাজের অথবা কোনো সমাজেরই নহে।

প্রশ্ন এই, হিন্দুসমাজ যদি জড়ভাবে ভালোমনা সকলপ্রকার ধর্মকেই পিণ্ডাকার করিয়া রাখে এবং যদি কোনো নূতন উচ্চ আদর্শকে প্রবেশে বাধা দেয় তবে এই সমাজকে তোমার সমাজ বলিয়া স্বীকার করিবার দরকার কী? ইহার একটা উত্তর পূর্বেই দিয়াছি—তাহা এই যে, ঐতিহাসিক দিক দিয়া আমি যে হিন্দু এ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো তর্কই নাই।

এ সম্বন্ধে আরও একটা বলিবার আছে। তোমার পিতা যেখানে অন্ত্য করেন সেখানে তাহার প্রতিকার ও প্রায়শ্চিত্তের ভার তোমারই উপরে। তোমাকে পিতৃধ্বংস শোধ করিতেই হইবে—পিতাকে আমার পিতা নয় বলিয়া তোমার ভাইদের উপর সমস্ত বোঝা চাপাইয়া পর হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তকে সোজা করিয়া তোলা সত্যচরণ নহে। তুমি বলিবে, প্রতিকারের চেষ্টা বাহির হইতে পরক্ৰমেই করিব—পুত্ররূপে নয়। কেন? কেন বলিবে না, যে পাপ আমাদেরই সে পাপ আমরা প্রত্যেকে ক্ষালন করিব?

জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুসমাজকে অস্বীকার করিয়া আমরা যে-কোনো সম্প্রদায়কেই তাহার স্থলে বরণ করি না কেন সে সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত দায় কি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই গ্রহণ করিতে হয় না? যদি কখনো দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজে বিলাসিতার প্রচার ও ধনের পূজা অত্যন্ত বেশি চলিতেছে, যদি দেখি সেখানে ধর্মনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতেছে তবে এ কথা কখনোই বলি না যে যাহারা ধনের উপাসক ও ধর্মে উদাসীন তাহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম, কারণ সংখ্যায় তাহারা অধিক, অতএব আমাকে অন্য নাম লইয়া অণু আর-একটা সমাজ স্থাপন করিতে হইবে। তখন এই কথাই আমরা বলি এবং ইহা বলাই সাজে যে, যাহারা সত্যধর্ম বাক্যে ও ব্যবহারে পালন করিয়া থাকেন তাহারা যথার্থ আমাদের সমাজের লোক;—তাঁহাদের যদি কর্তৃত্ব না-ও থাকে ভোটসংখ্যা গণনায় তাঁহারা যদি নগণ্য হন তথাপি তাঁহাদেরই উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই সমাজের উদ্ধার হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য ওজনদ্বারে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না—তাহা ছোটো হইলেও তাহা বড়ো। পর্বতপরিমাণ খড়বিচালি ফুলিপরিমাণ আঙনের চেয়ে

দেখিতেই বড়ো কিছু আসলে বড়ো নহে। সমস্ত শেজের মধ্যে যেখানে সংজ্ঞার সূচ্যগ্র পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে সেইখানেই সমস্ত শেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে তাহার পরিমাণ যতই হউক সেইটেকে আসল জিনিস বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজেই সমস্ত সমাজপ্রদাপের আলোটুকু ধাহারা জ্বলাইয়া আছেন তাঁহারা সংখ্যা হিসাবে নহে সত্য হিসাবে সে সমাজে অগ্রগণ্য। তাঁহারা দৃষ্ট হইতেছেন, আপনাকে তাঁহারা নিমেষে নিমেষে ত্যাগই করিতেছেন তবু তাঁহাদের শিখা সমাজে সকলের চোরে উঠে—সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান।

অতএব, যদি এমন কথা সত্যই আমার মনে হয় যে, আমি যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছি তাহাই সকলের চোরে শ্রেষ্ঠ, তবে এই কথা আমাকে নিশ্চয় বলিতে হইবে এই ধর্মই আমার সমাজের ধর্ম। সমাজের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়েই সত্যকে পায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজ সিদ্ধিলাভ করে। ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নব্বজন যদি পাস করে তবে সেই নব্বজনের মধ্যেই ইস্কুল সার্থক। একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠকে উপহাস পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধকাব্য বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠকাব্য। এইরূপ সকল বিষয়েই। রামমোহন রায় তাঁহার চারিদিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। একথা কোনো মতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্ত্যন্ত অনেক হিন্দু তাঁহার চোরে অনেক নিচে ছিল, এবং নিচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা একথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন—অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না—হিন্দু-সমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং একজ্ঞ বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্সপীয়ার নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দু-সমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবল মাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে—তবে অপরিণীম অঙ্ককারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অঙ্গণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাজির অঙ্ককার



হইতে অকণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ষাণ্ড-প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্যাদাসিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উত্তমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্র সমাজের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদূর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্ধামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।

আমি জানি এ কথায় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিবেন,—না, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলিতে পারিব না, তাহা বিশ্বের সামগ্রী। বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কী? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না—তাহা তো দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার তো বিশেষ নামরূপ আছে। গোলাপ ফুল তো বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল তো বিশেষভাবে গোলাপগাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী, তাহা তো অশ্বখগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া উঠিত,—নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর একজাতির কোনোপ্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। ইংরেজের ইতিহাসে লড়াই কাটাকাটি মারামারি কী হইয়াছে, তাহার কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে এবং সে রাজাকে কে কবে সিংহাসনচ্যুত করিল এ সমস্ত তাহারই ইতিহাসের বিশেষ কাঠখড়—কিন্তু এই সমস্ত কাঠখড় দিয়া সে যদি এমন কিছুই গড়িয়া না থাকে যাহা মানবচিন্তার মধ্যে দেব-সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে তবে ইংরেজের ইতিহাস একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুত বিশ্বের চিন্তাশক্তির কোনো একটা দিব্যরূপ ইংরেজের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আপনাকেই অপূর্ব করিয়া ব্যক্ত করিতেছে।

হিন্দুর ইতিহাসেও সে চেষ্টার বিরাম নাই। বিশ্বসত্যের প্রকাশশক্তি হিন্দুর ইতিহাসেও ব্যর্থ হয় নাই; সমস্ত বাধা-বিরোধও এই শক্তিরই লীলা। সেই হিন্দু-ইতিহাসের অন্তরে যে বিশ্বচিন্তা আপন সৃজনকার্যে নিযুক্ত আছেন ব্রাহ্মসমাজ কি বর্তমানযুগে তাহারই সৃষ্টিবিকাশ নহে? ইহা কি রামমোহন রায় বা আর দুই একজন

মানুষ আপন খেয়ালমতো আপন ঘরে বসিয়া গড়িয়াছেন? ব্রাহ্মসমাজ এই যে ভারত-বর্ষের পূর্বপ্রান্তে হিন্দুসমাজের মাঝখানে মাথা তুলিয়া বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল ইহার কি একেবারে কোনো মানেই নাই—ইহা কি বিশ্ববিধাতার দ্যুতক্রীড়াঘরে পাশা-খেলায় দান পড়া? মানুষের ইতিহাসকে আমি তো এমন ধামখেয়ালির সৃষ্টিক্রমে সৃষ্টিছাড়া করিয়া দেখিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। এই বিকাশ হিন্দুসমাজের একটি বিশ্বজনীন বিকাশ। হিন্দুসমাজের এই বিকাশটিকে আমরা কয়জনে দল বাধিয়া ঘিরিয়া লইয়া ইহাকে আমাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া চারিদিক হইতে তাহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিব এবং মুখে বলিব এইরূপেই আমরা তাহার প্রতি পরম ঐদার্য আরোপ করিতেছি—একথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

অন্যপক্ষে আমাকে বলিবেন ভাবের দিক হইতে এ সমস্ত কথা শুনিতে বেশ লাগে কিন্তু কাজের বেলা কী করা যায়? ব্রাহ্মসমাজ তো কেবলমাত্র একটা ভাবের ক্ষেত্র নহে—তাহাকে জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগাইতে হইবে, তখন হিন্দুসমাজের সহিত তাহার মিল করিব কেমন করিয়া?

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুসমাজ বলিতে যদি এমন একটা পাষণ্ডও কল্পনা কর যাহা আজ যে অনস্বীয় আছে তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিসমাপ্ত তবে তাহার সঙ্গে কোনো সম্ভব মানুষের কোনোপ্রকার কারবারই চলিতে পারে না—তবে সেই পাষণ্ড দিয়া কেবলমাত্র মৃত মানবচিত্তের গোর দেওয়াই চলিতে পারে। আমাদের বর্তমান সমাজ যে কারণে মৃত নিশ্চল হইয়াই পড়ুক না, তথাপি তাহা সেরূপ পাষণ্ডের স্তূপ নহে। আজ, যে বিষয়ে তাহার যাহা কিছু মত ও আচরণ নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহাই তাহার চরম সম্পূর্ণতা নহে—অর্থাৎ সে মরে নাই। অতএব বর্তমান হিন্দু-সমাজের সমস্ত বাধা মত ও আচারের সঙ্গে নিজের সমস্ত মত ও আচারকে নিঃশেষে মিলাইতে পারিলে তবেই নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব একথা সত্য নহে। আমাদেরই মত ও আচারের পরিণতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। আমাদের মধ্যে কোনো বদল হইলেই আমরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তখনই নিজেকে সমাজের বহির্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তবে সমাজের বদল হইবে কী করিয়া?

একথা স্বীকার করি, সমাজ একটা বিরাট কলেবর। ব্যক্তিবিশেষের পরিণতির সমান তাতে কে তখনই-তখনই অগ্রসর হইয়া চলে না। তাহার নড়িতে বিলম্ব হয়



এবং সেরূপ বিলম্ব হওয়াই কল্যাণকর। অতএব সেই সমাজের সঙ্গে যখন ব্যক্তি-  
বিশেষের অমিল শুরু হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সুখকর নহে। সেই কারণে  
তখন তাড়াতাড়ি সমাজকে অস্বীকার করার একটা কৌক আসিতেও পারে। কিন্তু  
যেখানে মানুষ অনেকের সঙ্গে সত্যসঙ্কে যুক্ত সেখানে সেই অনেকের মুক্তিতেই তাহার  
মুক্তি। একলা হইয়া প্রথমটা একটু আরাম বোধ হয় কিন্তু তাহার পরেই দেখা যায় যে,  
যে-অনেককে ছাড়িয়া দূরে আসিয়াছি দূরে আসিয়াছি বলিয়াই তাহার টান ক্রমশ  
প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। 'যে আমারই, তাহাকে, সঙ্গে থাকিয়া উদ্ধার করিলেই,  
যথার্থ নিজের উদ্ধার পাওয়া যায়—তাহাকে যদি স্বত্ত্ব নিচে ফেলিয়া রাখি তবে একদিন  
সেও আমাকে সেই নিচেই মিলাইয়া লইবে; কারণ, আমি যতই অস্বীকার করি না  
কেন তাহার সঙ্গে আমার নানাদিকে নানা মিলনের যোগসূত্র আছে—সেগুলি বহুকালের  
সত্য পদার্থ। অতএব সমস্ত বাধা সমস্ত অসুবিধা স্বীকার করিয়াই আমার সমস্ত  
পরিবেষ্টনের মধ্যে আমার সাধনাকে প্রবর্তিত ও সিক্তিকে স্থাপিত করিতেই হইবে। না  
করিলে কখনোই তাহার সর্বাঙ্গীণতা হইবে না—সে দিনেদিনে নিঃসন্দেহই কুশ ও প্রাণ-  
হীন হইয়া পড়িবে, তাহার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস সে কখনোই লাভ করিতে  
পারিবে না।

অতএব আমি যাহা উচিত মনে করিতেছি তাহাই করিব, কিন্তু একথা কখনোই  
বলিব না যে, সমাজের মধ্যে থাকিয়া কর্তব্যপালন চলিবে না। একথা জোর করিয়াই  
বলিব যাহা কর্তব্য তাহা সমস্ত সমাজেরই কর্তব্য। এই কথাই বলিব, হিন্দুসমাজের  
কর্তব্য আমিই পালন করিতেছি।

হিন্দুসমাজের কর্তব্য কী? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের  
মঙ্গল তাহারই অন্তর্ধান করা। কেমন করিয়া জানিব কিসে সকলের মঙ্গল? বিচার ও  
পরীক্ষা ছাড়া তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায়ই নাই। বিচারবুদ্ধিটা মানুষের আছে  
এইজন্যই। সমাজের মঙ্গলসাধনে, মানুষের কর্তব্যানুরূপে সেই বুদ্ধি একেবারেই  
কাটাইতে দিব না এমন পণ যদি করি তবে সমাজের সর্বনাশের পথ করা হয়। কেননা  
সর্বদা হিতসাধনের চিন্তা ও চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিলেই তবে সেই বিচারবুদ্ধি নিজের  
শক্তিপ্রয়োগ করিয়া সবল হইয়া উঠিতে পারে এবং তবেই, কালে কালে সমাজে  
স্বভাবতই যে সমস্ত আবর্জনা জমে, যে সমস্ত অভ্যাস ক্রমশই জড়ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া  
উন্নতির পথরোধ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে কাটাইয়া তুলিবার শক্তি সমাজের মধ্যে সর্বদা  
প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রম ও বিপদের আশঙ্কা করিয়া সমাজকে চিরকাল  
চিন্তাহীন চেষ্টাহীন শিশু করিয়া রাখিলে কিছুতেই তাহার কল্যাণ হইতে পারে না।

একথা যখন নিশ্চিত তখন নিজের দৃষ্টান্ত ও শক্তিস্বার্থই সমাজের মধ্যে এই মঙ্গল-চেষ্টাকে সজীব রাখা নিতান্তই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। যাহা ভালো মনে করি তাহা করিবার জন্য কখনোই সমাজ ত্যাগ করিব না।

আমি দৃষ্টান্তরূপে বলিতেছি, জাতিভেদ। যদি জাতিভেদকে অগ্রাহ্য মনে করি তবে তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত হিন্দুসমাজের পক্ষে অগ্রাহ্য—অতএব তাহাই স্বার্থ অহিন্দু। কোনো অগ্রাহ্য কোনো সমাজেরই পক্ষে নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। যাহা অগ্রাহ্য তাহা ভ্রম, তাহা স্বপ্ন, সুতরাং তাহাকে কোনো সমাজেরই চিরপরিণাম বলিয়া গণ্য করা একপ্রকার নাস্তিকতা। আগুনের ধর্মই যেমন দাহ, অগ্রাহ্য কোনো সমাজেরই সেরূপ ধর্ম হইতেই পারে না। অতএব হিন্দু থাকিতে গেলে আমাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে অধর্ম করিতে হইবে একথা আমি মুখে উচ্চারণ করিতে চাই না। সকল সমাজেই বিশেষ কালে কতকগুলি মহুশ্যের বিশেষ বাধা প্রকাশ পায়। যে সকল ইংরেজ মহাত্মারা জাতিনির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই ন্যায়চরণের পক্ষপাতী, যাহারা সকল জাতিরই নিজের বিশেষ শক্তিকে নিজ নিজ পন্থায় স্বাধীনতার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন—তাহারা অনেকে আক্ষেপ করিতেছেন বর্তমানে ইংরেজজাতির মধ্যে সেই উদার ন্যায়পরতার, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার, সেই মানবপ্রেমের ধ্বংস ঘটিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়াই এই দুর্গতিকে তাহারা নিত্য বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তাই তাহারা ইহারই মাঝখানে থাকিয়া নিজের উদার আদর্শকে সমস্ত বিক্রম ও বিরোধের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তাহারা স্বজাতির বাহিরে নূতন একটা জাতির সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন নাই।

তেমনি, জাতিভেদকে যদি হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া জানি তবে তাহাকেই আমি অহিন্দু বলিয়া জানিব এবং হিন্দুসমাজের মাঝখানে থাকিয়াই তাহার সঙ্গে লড়াই করিব। ছেলেমেয়ের অসবর্ণ বিবাহ দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না এবং তাহাকেই আমি নিজে হইতে অহিন্দুবিবাহ বলিব না—কারণ বস্তুত আমার মতামুসারে তাহাই হিন্দুবিবাহনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যদি এমন হয় যে, হিন্দুসমাজের পক্ষে জাতিভেদ ভালোই, কেবলমাত্র আমাদের কয়েকজনের পক্ষেই তাহার অসুবিধা বা অনিষ্ট আছে তবেই এই ক্ষেত্রে আমার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়া খোজা পায় নতুবা কদাচ নহে।

হিন্দুসমাজে কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ ছিল না এ কথা সত্য নহে, কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না ইহাও সত্য নহে—হিন্দুসমাজের সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়া যে সমাজ, সেই বর্তমান সমাজকেই একমাত্র সত্য বলিয়া তাহার আশঙ্ক্য ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়াকে আমি ধর্মসংগত বলিয়া কখনোই মনে করি না।

অপর পক্ষ বলিবেন আচ্ছা বেশ, বর্তমানের কথাই ধরা যাক, আমি যদি জাতিভেদ না মানিতেই চাই তবে এ সমাজে কাজকর্ম করিব কাহার সঙ্গে? উত্তর, এখনও যাহাদের সঙ্গে করিতেছ। অর্থাৎ যাহারা জাতিভেদ মানে না।

তবেই তো সেই ক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া উঠিল। না, ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে ইহা সম্প্রদায় মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক কাঁকা হইতে অন্য কাঁকার যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া?

তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারের তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বীড়ুজ্যো মশায় হিন্দু খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহিনিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসঙ্গেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীষ্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতাগাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই স্বার্থ সত্য। সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্ষদের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া, অক্ষর ও বাহিরের বহুবিধ ষাণ্ডপ্রতিষাণ্ডপরম্পরার একই ইতিহাসের দ্বারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। কালীচরণ বীড়ুজ্যো, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন বলিয়াই এই



সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কী করিয়া ? জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক অন্তরভর ; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না । ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোনো একটা পৌরাণিক মতকে যখন আমি বিশ্বাস করিতাম তখনও আমি সে জাতি ছিলাম, তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত যখন বিশ্বাস করি তখনও আমি সেই জাতি । যদিচ আজ ব্রহ্মাণ্ডকে আমি কোনো অণুবিশেষ বলিয়া মনে করি না ইহা জানিতে পারিলে এবং সুযোগ পাইলে আমার প্রপিতামহ এই প্রকার অদ্ভুত নব্যতার নিঃসন্দেহ আমার কান মলিয়া দিতেন ।

কিন্তু চীনের মুসলমানও মুসলমান, পারস্যেরও তাই, আফ্রিকারও তদ্রূপ । যদিচ চীনের মুসলমানসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না তথাপি এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের ধর্মমতের অনেকটা হয়তো মেলে কিন্তু অন্ত অসংখ্য বিষয়েই মেলে না । এমন কি, ধর্মমতেরও মোটামুটি বিষয়ে মেলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে মেলে না । অথচ হাজার হাজার বিষয়ে তাহার স্বজাতি কনুয়াসীরা অথবা বৌদ্ধের সঙ্গে তাহার মিল আছে । পারস্যে চীনের মতো কোনো প্রাচীনতর ধর্মমত নাই বলিলেই হয় । মুসলমান বিজ্ঞতার প্রভাবে সমস্ত দেশে এক মুসলমান ধর্মই স্থাপিত হইয়াছে তথাপি পারস্যে মুসলমান ধর্ম সেখানকার পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে—আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না ।

ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না । এখানেও আমার জাতি-প্রকৃতি আমার মতবিশেষের চেয়ে অনেক ব্যাপক । হিন্দুসমাজের মধ্যেই তাহার হাজার দৃষ্টান্ত আছে । যে সকল আচার আমাদের শাস্ত্রে এবং প্রথায় অহিন্দু বলিয়া গণ্য ছিল আজ কত হিন্দু তাহা প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে ; কত লোককে আমরা জানি যাহারা সভায় বক্তৃতা দিবার ও কাগজে প্রবন্ধ লিখিবার বেলায় আচারের শ্রলম লেশমাত্র সহ্য করিতে পারেন না অথচ যাহাদের পানাহারের তালিকা দেখিলে মনু ও পরাশর নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন এবং রঘুনন্দন আনন্দিত হইবেন না । তাঁহাদের প্রবন্ধের মত অথবা তাঁহাদের ব্যবহারিক মত, কোনো মতের ভিত্তিতেই তাঁহাদের হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার ভিত্তি আরও গভীর । সেই জন্যই হিন্দুসমাজে আজ যাহারা আচার মানেন না, নিয়ন্ত্রণ স্বাক্ষর যাহারা ভাটপাড়ার বিধান স্বীকা করেন না, এবং স্তব্ব বাড়ি আসিলে গুরুতর কাজের ভিড়ে যাহাদের অনবসর ঘটে, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন । তাহার একমাত্র কারণ এ নয় যে হিন্দুসমাজ দুর্বল—তাহার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত বীধাবীধির মধ্যেও হিন্দুসমাজ একপ্রকার অর্ধচেতন

ভাবে অল্পভব করিতে পারে যে, বাহিরের এই সমস্ত পরিবর্তন হাজার হইলেও ভবু বাহিরের—যথার্থ হিন্দুত্বের সীমা এইটুকুর মধ্যে কখনোই বন্ধ নহে।

যে কথাটা সংকীর্ণ বর্তমানের উপস্থিত অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া বৃহৎভাবে সত্য, অনেক পাকা লোকেরা তাহার উপরে কোনো আস্থাই রাখেন না। তাঁহারা মনে করেন এ সমস্ত নিছক আইডিয়া। মনে করেন, কল্পন কিন্তু আমাদের সমাজে আজ এই আইডিয়ার প্রয়োজনই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন। এখানে জড়ত্বের আয়োজন যথেষ্ট আছে যাহা পড়িয়া থাকে, বিচার করে না, যাহা অভ্যাসমাত্র, যাহা নড়িতে চায় না তাহা এখানে যথেষ্ট আছে, - এখানে কেবল সেই তত্ত্বেরই অভাব দেখিতেছি, যাহা সৃষ্টি করে, পরিবর্তন করে, অগ্রসর করে, যাহা বিচিত্রকে অস্তরের দিক হইতে মিলাইয়া এক করিয়া দেয়। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সেই আইডিয়াকেই জন্ম দিয়াছে, যাহা তাহাকে উদ্বোধিত করিবে; যাহা তাহাকে চিন্তা করাইবে, চেষ্টা করাইবে, সন্ধান করাইবে; যাহা তাহার নিজের ভিতরকার সমস্ত অনৈক্যকে সত্যের বন্ধনে এক করিয়া বাধিয়া তুলিবার সাধনা করিবে, যাহা জগতের সমস্ত প্রাণশক্তির সঙ্গে তাহার প্রাণ-ক্রিয়ার যোগসাধন করিয়া দিবে। এই যে আইডিয়া, এই যে সৃজনশক্তি, চিন্তাশক্তি, সত্যগ্রহণের সাধনা, এই যে প্রাণচেষ্টার প্রবল বিকাশ, যাহা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আকার গ্রহণ করিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজের বলিয়া অস্বীকার করিব? যেন আমরাই তাহার মালেক, আমরাই তাহার জন্মদাতা। হিন্দুসমাজের এই নিজেরই ইতিহাসগত প্রাণগত সৃষ্টি হইতে আমরা হিন্দুসমাজকেই বঞ্চিত করিতে চাহিব? আমরা হঠাৎ এত বড়ো অন্তর্য কথা বলিয়া বসিব যে, যাহা নিশ্চল, যাহা বাধা, যাহা প্রাণহীন তাহাই হিন্দুসমাজের, আর যাহা তাহার আইডিয়া, তাহার মানসরূপ, তাহার মুক্তির সাধনা, তাহাই হিন্দু-সমাজের নহে, তাহাই বিশ্বের সরকারি জিনিস। এমন করিয়া হিন্দুসমাজের সত্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টাই কি ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা?

এতদূর পর্যন্ত আসিয়াও আমার শ্রোতা বা পাঠক যদি একজনও বাকি থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় আমাকে শেষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন যদি আতিভেদ না মানিয়াও হিন্দু থাকে, যদি মুসলমান খ্রীষ্টান হইয়াও হিন্দু না যায় তবে হিন্দুত্বটা কী? কী দৈর্ঘ্যে হিন্দুকে চিনিতে পারি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আমি বাধ্য হই তবে নিশ্চয়ই তিনিও বাধ্য। হিন্দুত্ব কী—ইহার যে-কোনো উত্তরই তিনি দিব না, বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাহার প্রতিবাদ আছে। শেষকালে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইবে, যে সন্তানদায় কিছুদিন ধরিয়া যে ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে



তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দু এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুদের ব্যতিক্রম। এই কারণে যাহাতে বাংলার হিন্দু দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দু দূষিত হয় না, যাহা ড্রাবিড়ের হিন্দুর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে তাহা কান্তকূলের হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক।

বাহিরের দিক হইতে হিন্দুকে বিচার করিতে গেলেই এত বড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিতে হয়। কিন্তু বাহিরের দিক হইতেই এইরূপ বিচার করাটাই অবিচার;—সেই অবিচারটা হিন্দুসমাজ স্বয়ং নিজের প্রতি নিজে প্রয়োগ করিয়া থাকে বলিয়াই যে সেটা তাহার স্বার্থ প্রাপ্য একথা আমি স্বীকার করি না। আমি নিজেকে নিজে যাহা বলিয়া জানি তাহা যে প্রায়ই সত্য হয় না একথা কাহারও অগোচর নাই।

মামুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোনো সংজ্ঞা পৌঁছিতে পারে না—কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও আছে। কেবল মাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে—কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না, সেখানে সে পা রাখিবার জায়গাই পায় না।

এই জন্তই জীবনের দ্বারা আমরা জীবনকে জানিতে পারি কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা তাহাকে বাধিতে পারি না। ইংরেজের লক্ষণ কী, যদি সংজ্ঞা নির্দেশের দ্বারা বলিতে হয় তবে বলিতেই পারিব না—এক ইংরেজের সঙ্গে আর এক ইংরেজের বাধিবে—এক যুগের ইংরেজের সঙ্গে আর এক যুগের ইংরেজের মিল পাইব না। তখন কেবলমাত্র এই একটা মোটা কথা বলিতে পারিব যে, এক বিশেষ ভূখণ্ড ও বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে এই যে জাতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মামুষ হইয়াছে এই জাতি আপন ব্যক্তিগত কালগত সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়াও এক ইংরেজজাতি। ইহাদের মধ্যে যে খ্রীষ্টান সেও ইংরেজ, যে কালীকে মানিতে চায় সেও ইংরেজ; যে পরজাতির উপরে নিজের আধিপত্যকে প্রবল করিয়া তোলাকেই দেশহিতৈষিতা বলে সেও ইংরেজ এবং যে এইরূপে অল্প জাতির প্রতি প্রভুত্বচেষ্টা দ্বারা স্বজাতির চরিত্রনাশ হয় বলিয়া উৎকণ্ঠিত হয় সেও ইংরেজ,—যে ইংরেজ নিজেদের মধ্যে কাহাকেও বিধর্মী বলিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে সেও ইংরেজ এবং যে লোক সেই বিধর্মকেই সত্যধর্ম বলিয়া পুড়িয়া মারিয়াছে সেও ইংরেজ। তুমি বলিবে ইহারা সকলেই আপনাকে ইংরেজ বলিয়া মনে করে সেই-খানেই ইহাদের যোগ; কিন্তু শুধু তাই নয়, মনে করিবার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে; ইহারা যে যোগসন্ধে প্রত্যেকে সচেতন তাহাওই একটি যোগের জাল আছে।

সেই জালটিতে সকল বৈচিত্র্য বাধা পড়িয়াছে। এই ঐক্যজালের সূত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করাই যায় না অথচ তাহা সুলব্ধনের চেয়ে দৃঢ়।

আমাদের মধ্যেও তেমনি একটি ঐক্যজাল আছে। জানিয়া এবং না জানিয়াও তাহা আমাদের সকলকে বাধিয়াছে। আমার জানা ও স্বীকার করার উপরেই তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। কিন্তু তথাপি আমি যদি তাহাকে জানি ও স্বীকার করি তবে তাহাতে আমারও জোর বাড়ে তাহারও জোর বাড়ে। এই বৃহৎ ঐক্যজালের মহত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে যদি মূঢ়তার ফাদ করিয়া তুলি তবে সত্যকে খর্ব করার যে শাস্তি তাহাই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যদি বলি, যে লোক দক্ষিণ শিয়রে মাথা করিয়া শোয় সেই হিন্দু, যে অমুকটা ধার না এবং অমুককে ছোঁয় না সেই হিন্দু, যে লোক আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দেয় এবং সর্বণে বিবাহ করে সেই হিন্দু তবে বড়ো সত্যকে ছোটো করিয়া আমরা দুর্বল হইব, ব্যর্থ হইব, নষ্ট হইব।

এই জগুই, যে আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি সেই আমার এ কথা নিশ্চয়রূপে জানা কর্তব্য, জানে তবে কর্মে যাহা কিছু আমার শ্রেষ্ঠ তাহা একলা আমার নহে, তাহা একলা আমার সম্প্রদায়েরও নহে তাহা আমার সমস্ত সমাজের। আমার মধ্য দিয়া আমার সমস্ত সমাজ তপস্কা করিতেছে—সেই তপস্কার ফলকে আমি সেই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মানুষকে বাদ দিয়া কোনো সমাজ নাই, এবং যাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ তাহারাই মানুষের প্রতিনিধি, তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানুষের বিচার হয়। আজ আমাদের সম্প্রদায়ই যদি জানে ও আচরণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে তবে আমাদের সম্প্রদায়ের দ্বারাই ইতিহাসে সমস্ত হিন্দুসমাজের বিচার হইবে এবং সে বিচার সত্য বিচারই হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের দশজন যদি আমাকে হিন্দু না বলে এবং সেই সঙ্গে আমিও যদি আমাকে হিন্দু না বলি তবে সে বলামাত্রের দ্বারা তাহা কখনোই সত্য হইবে না। সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো ইষ্ট নাই। আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিন্তা দ্বিগুণে চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিন্তা দ্বিগুণে গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছে—এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশতাব্দীর হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অকুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়, আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়াই সত্যের এই রূপটিকে—এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। ব্রাহ্ম

সমাজের সাধনাকে আমরা অন্ধ অহংকারে নূতন বলিতেছি কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি সত্য অহংকারে বলিব ইহা আমাদেরই ভিতরকার চিরন্তন—নবযুগে নববসন্তে সেই আমাদের চিরপুরাতনেরই নূতন বিকাশ হইয়াছে। যুরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম সেখানকার মানুষের কর্ষশক্তি হইতে একটি বিশ্বসত্যের বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। সেই অন্ধ খ্রীষ্টানধর্ম নিউটেস্টামেন্টের শাস্ত্রলিখিত ধর্ম নহে ইহা যুরোপীয় জাতির সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট জীবনের ধর্ম; একদিকে তাহা যুরোপের অস্বরণতম চিরন্তন, অন্ধ দিকে তাহা সকলের। হিন্দুসমাজের মধ্যেও আজ যদি কোনো সত্যের জন্ম ও প্রচার হয় তবে তাহা কোনোক্রমেই হিন্দুসমাজের বাহিরের জিনিস হইতেই পারে না,—যদি তাহা আমাদের চিরদিনের জীবন হইতে জীবন না পাইয়া থাকে, যদি সেইখান হইতেই তাহার স্তম্ভরস না জুটিয়া থাকে, আমাদের বৃহৎ সমাজের চিত্তবৃত্তি যদি খাত্তীর মতো তাহার সেবা না করিয়া থাকে তবে কেবল আমাদের হিন্দুসমাজে নহে পৃথিবীর কোনো সমাজেই এই পথের ধারের কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস প্রকার যোগ্য হয় নাই—তবে ইহা কৃত্রিম, ইহা অস্বাভাবিক, তবে সত্যের চির অধিকারসম্বন্ধে এই দরিত্রের কোনো নিজের বিশেষ দলিল দেখাইবার নাই, তবে ইহা কেবল ক্ষণকালের সম্প্রদায়ের, ইহা চিরকালের মানবসমাজের নহে।

আমি জানি কোনো কোনো ব্রাহ্ম এমন বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুর কাছে যাহা পাইয়াছি, খ্রীষ্টানের কাছে তাহার চেয়ে কম পাই নাই—এমন কি, হয়তো তাঁহারা মনে করেন তাহার চেয়ে বেশি পাইয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, বাহির হইতে যাহা পাই তাহাকেই আমরা পাওয়া বলিয়া জানিতে পারি—কেননা, তাহাকে চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় এবং তাহার প্রত্যেক অংশকে অনুভব করিয়া করিয়া পাই। এই অন্ধ বেজনের চেয়ে মানুষ সামান্ত উপরি পাওনায় বেশি খুশি হইয়া উঠে। আমরা হিন্দু বলিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা আমাদের রক্তে মাংসে অঙ্গিমজায়, তাহা আমাদের মানস-প্রকৃতির ভিত্তিতে ভিত্তিতে জড়িত হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পাই না তাহাকে লাভ বলিয়া মনেই করি না—এই অন্ধ ইংরেজি পাঠশালায় পড়া মুখস্থ করিয়া যাহা অগভীরভাবে অল্পপরিমাণে ও ক্ষণস্থায়ীরূপেও পাই তাহাকেও আমরা বেশি না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। মাথার ভারকে আমরা ভারী বলিয়া জানি না, কিন্তু মাথার উপরকার পাগড়ীটাকে একটা কিছু বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়, তাই বলিয়া এ কথা বলা সাজে না যে, মাথা বলিয়া জিনিসটা নাই পাগড়ীটা আছে; সে পাগড়ি বহুশূন্য রত্নমাণিক্যজড়িত হইলেও এমন কথা বলা সাজে না। সেই অন্ধ আমরা বিদেশ হইতে যাহা পাইয়াছি দিনরাত্রি তাহাকে লইয়া ধ্যান করিলে এবং প্রচার



করিলেও, তাহাকে আমরা সকলের উচ্চে চড়াইয়া রাখিয়া দিলেও, আমার অগোচরে আমার প্রকৃতির গভীরতার মধ্যে নিঃশব্দে আমার চিরন্তন সামগ্রীগুলি আপন নিত্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। উর্দু ভাষায় যতই পারসি এবং আরবি শব্দ থাক না তবু ভাষাতত্ত্ববিদগণ জানেন তাহা ভারতবর্ষীয় গোড়ীয় ভাষারই এক শ্রেণী;—ভাষার প্রকৃতিগত যে কাঠামোটাই তাহার নিত্যসামগ্রী, যে কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির কাজ চলে সেটা বিদেশী সামগ্রীতে আছোপাক্ষ সমাচ্ছন্ন হইয়া তবুও গোড়ীয়। আমাদের দেশের ঘোরতর বিদেশীভাবাপন্নও যদি উপযুক্ত তত্ত্ববিদের হাতে পড়েন তবে তাহার চিরকালের স্বজাতীয় কাঠামোটা নিশ্চয়ই তাহার প্রচুর আবরণ আচ্ছাদনের ভিতর হইতে ধরা পড়িয়া যায়।

যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না; নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরূপ ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় এ কথা কখনোই প্রত্বেয় হইতে পারে না।

১৩১২

## হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে একথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে কিন্তু এখন মিলিবার বাধা সকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।

যুরোপে যে সকল রাজ্যে ধণ্ড ধণ্ড জাতিরা একপ্রকার মিলিয়া ছিল এখন তাহারা প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। নরোরে নুইডেনে ভাগ হইয়া গিয়াছে। আরলও, আপনার স্বতন্ত্র অধিকার লাভের জন্য বহু দিন হইতে অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, আপনার বিশেষ ভাষা, বিশেষ সাহিত্যকে

আইরিশরা জাগাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছে। ওয়েলসবাসীদের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বেলজিয়মে এতদিন একমাত্র ফরাসি ভাষার প্রাধান্ত প্রবল ছিল; আজ ফ্রেমিশরা নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জরী করিবার জন্ত উৎসাহিত হইয়াছে; অস্ট্রিয়া রাজ্যে বহুবিধ ছোটো ছোটো জাতি একসঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে— তাহাদিগকে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আজ স্পষ্টই দূরপর্যন্ত হইয়াছে। রুশিয়া আজ ফিনদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্ত বিপুল বল প্রয়োগ করিতেছে বটে কিন্তু দেখিতেছে গেলা যত সহজ পরিপাক করা তত সহজ নহে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।

ইংলণ্ডে হঠাৎ একটা ইম্পীরিয়ালিজমের ঢেউ উঠিয়াছিল। সমুদ্রপারের সমুদ্র উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলণ্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এবারে উপনিবেশগুলির কর্তৃপক্ষেরা মিলিয়া ইংলণ্ডে যে এক মহাসমিতি বসিয়াছিল তাহাতে যতগুলি বন্ধনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কোনোটাই টিকিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য হানি হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেইখানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে।

একান্ত মিলনেই যে সবলতা এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় একথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোনো-না-কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। বাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলন-রক্ষার সূচুপায়।

আপনার পার্থক্য যখন মাহুয স্বার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনই সে বড়ো হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি বাহার কোনো মমতা নাই সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দলের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিম্নিত মাহুযের মধ্যে প্রভেদ থাকে না—জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের জিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যের সমস্ত পাপড়ি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে—যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনই ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনই ফুল সার্থক হয়। আজ



পরম্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্হ নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্ধক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অস্ত্রের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড়ো হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড়ো হওয়া মনে করিতেই পারে না। যে ছোটো সেও যখনই আপনার সত্যকার স্বাভাব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনই সেটিকে বাচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে—ইহাই প্রাণের ধর্ম। বস্তুত সে ছোটো হইয়াও বাচিতে চায়, বড়ো হইয়া মরিতে চায় না।

কিনরা যদি কোনো ক্রমে ক্লম হইয়া যাইতে পারে তবে অনেক উৎপাত হইতে তাহার পরিজ্ঞান পায়—তবে একটি বড়ো জাতির শামিল হইয়া গিয়া ছোটোদের সমস্ত দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়। কোনো একটা নেশনের মধ্যে কোনো প্রকার বিধা থাকিলেই তাহাতে বলক্ষয় করে এই আশঙ্কায় কিনল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে বলপূর্বক অভিন্ন করিয়া দেওয়াই ক্লমের অভিপ্রায়। কিন্তু কিনল্যাণ্ডের ভিন্নতা যে একটা সত্য-পদার্থ; রাশিয়ার সুবিধার কাছে সে আপনাকে বলি দিতে চায় না। এই ভিন্নতাকে যথোচিত উপায়ে বশ করিতে চেষ্টা করা চলে, এক করিতে চেষ্টা করা হত্যা করার মতো অশ্রায়। আয়র্লণ্ডকে লইয়াও ইংলণ্ডের সেই সংকট। সেখানে সুবিধার সঙ্গে সত্যের লড়াই চলিতেছে। আজ পৃথিবীর নানা স্থানেই যে এই সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই একটা প্রাণের বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলা দেশের সমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে ছোটোখাটো একটি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহারও মূল কথাটি সেই একই। ইতিপূর্বে এ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই মোটা ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল উপরে, আর সকলেই ছিল তলায় পড়িয়া।

কিন্তু যখনই নানা কারণে আমাদের দেশের মধ্যে একটা উদ্বোধন উপস্থিত হইল তখনই অত্রাহ্মণ জাতিরা শূদ্র শ্রেণীর এক-সমতল হীনতার মধ্যে একাকার হইয়া থাকিতে রাজি হইল না। কায়স্থ আপনার যে একটি বিশেষত্ব অনুভব করিতেছে তাহাতে সে আপনাকে শূদ্রের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার হীনতা সত্য নহে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবদ্ধনের অতি প্রাচীন সুবিধাকে সে চিরকাল মানিবে কেমন করিয়া? ইহাতে দেশাচার যদি বিকল হয় তবে দেশাচারকে পরিত্যক্ত হইতেই হইবে। আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই বিপ্লব ব্যাপ্ত হইবে। কেননা, মুর্ছাবস্থা ঘুটিলেই মানুষ সত্যকে অনুভব করে; সত্যকে অনুভব করিবামাত্র সে কোনো কৃত্রিম সুবিধার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করিতে পারে না, বরঞ্চ সে অসুবিধা ও অশান্তিকেও বরণ করিয়া লইতে রাজি হয়।

ইহার কল কী ? ইহার কল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের গৌরববোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড়ো হইয়া উঠিলে তখনই পরস্পরের মিলন সত্যকার সামগ্রী হইবে। দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন, এবং দারে পড়িয়া মিলন গৌজামিলন মাত্র।

মনে আছে আমারই কোনো ব্যাকরণঘটিত প্রবন্ধ লইয়া একবার সাহিত্যপরিষৎ সভায় এমন একটি আলোচনা উঠিয়াছিল যে, বাংলা ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মতো করিয়া তোলা উচিত—কারণ, তাহা হইলে গুজরাটি মারাঠা সকলেরই পক্ষে বাংলা ভাষা সুগম হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজস্ব আছে অল্প দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটেই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষার বাহা কিছু শক্তি বাহা কিছু সৌন্দর্য সমস্তই তাহার ভিত্তিতেই নিজস্ব লইয়া। আজ ভারতের পশ্চিমতমপ্রান্তবাসী গুজরাটি বাংলা পড়িয়া বাংলা সাহিত্য নিজের ভাষার অনুবাদ করিতেছে। ইহার কারণ এ নয় যে বাংলা ভাষাটা সংস্কৃতের কৃত্রিম ছাঁচেটোলা সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জিত সহজ ভাষা। সাঁওতাল যদি বাঙালি পাঠকের কাছে তাহার লেখা চমিত হইবে আশা করিয়া নিজের ভাষা হইতে সমস্ত সাঁওতালি বর্জন করে তবেই কি তাহার সাহিত্য আমাদের কাছে আদর পাইবে? কেবল ওই বাধাটুকু দূর করার পথ চাহিয়াই কি আমাদের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে?

অতএব, বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দু-স্থানীদের সঙ্গে সম্ভাব্য ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, “বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি প্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।” সঁকল প্রকার ভেদকে টেকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পরার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া

যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ব লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলান্ডের চেষ্ঠা যখনই প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উত্তেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্ষ হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্ঠায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুযায়িক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুইপক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়,—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাঁটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভিন্ন ছিল বলিয়াই যে, তেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন



ছিল। তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেষ্টতায় আমাদেরকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দু লইয়া গৌরব করিতে উক্কেত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চূপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দু উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্তা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইবে—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অন্ত্রবিধা হউক, একদিন পরস্পরের স্বার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর; মাহুষ যখন আপনাকে বড়ো করে তখনই আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারও সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটো বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড়ো হইয়া আত্ম-বিসর্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পর-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।

বস্তুত বাহির হইতে যেটুকু পাওয়া যাইতে পারে, বাহা অন্তের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় তাহার একটা সীমা আছেই। সে সীমা হিন্দু ও মুসলমানের কাছে প্রায় সমান। সেই সীমায় যতদিন পর্যন্ত না পৌছানো যায় ততদিন মনে একটা আশা থাকে বৃদ্ধি সীমা নাই, বৃদ্ধি এই পথেই পরমার্থ লাভ করা যায়। তখনই সেই পথের পাথর

কান্ন একটু বেশি জুটিয়াছে কার একটু কম, তাই লইয়া পরস্পর ঘোঁড়তর ঈর্ষা বিরোধ ঘটিতে থাকে।

কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের গুণে ও শক্তিতেই আমরা নিজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারি। যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই। এই কথাটা বুঝিবার সময় যত অবিলম্বে ঘটে ততই শ্রেয়। অতএব অন্তের আত্মকুলালাভের যদি কোনো স্বতন্ত্র সিধা রাস্তা মুসলমান আবিষ্কার করিয়া থাকে তবে সে পথে তাহাদের গতি অব্যাহত হউক। সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশি হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদ-মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত—সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্নমনে কামনা করি।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার পরে আমি বেশি কৌক দিতে চাই না—ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাভাব্য। সে স্বাভাব্যকে বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিজ্ঞান স্বাপন প্রভৃতি উদ্যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজদের স্বাভাব্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাভাব্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাভাব্যের যে যে অংশে আজ বিকলতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সে রূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষেই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড়ো কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে একঘোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।



এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অস্তুত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে; বিজ্ঞা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্ববন্ধ হইয়া উঠিতেছে—সে সমস্ত মানুষের চিন্তা-সম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পুরাপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিজ্ঞার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহার পূর্বমহলের সন্তানেরা পশ্চিম মহলের দিকে জানালা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম মহলের সন্তানেরা পূবে হাওরাকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্য-কর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাষেই কান পর্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বত্রই প্রাচ্য বিজ্ঞার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিজ্ঞাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্বের মতোই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিজ্ঞার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দু-মুসলমান-শাস্ত্র অধ্যয়নে একজন অর্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্মবশত; আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখি হইয়া কেবল বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বানীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্যোগ আমাদেরই করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিজ্ঞাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভালো করিয়া সকলতা লাভ করিতে পারিতেছে না তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিক মতো পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছি না।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, একথা সম্পূর্ণ অপ্রকৃত করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আত্মকর্তৃপণ্যও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইহারা নিজেরা যে বিচালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড়ো আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসংগত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদেরিগকে দুর্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বারবার করিয়া কেবলই আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহারা কালের আবর্তনকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলোয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসঙ্গেও একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল বিজ্ঞানই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনোই চিরদিন কোনো একান্ত আভিয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরম্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি স্বার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামতো যিনি যতবড়ো খুশি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের স্বার্থ মূল্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে।

এ পর্বন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রশংসায় দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সে রূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে, কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই—এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্বেদ আশু সৃষ্টি করিয়াছেন কোনো দেবতার মুখ-হস্ত-পদ হইতে একে-বারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে সমস্তই ঋষি ও দেবতার মিলিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারও কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেই জন্তই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনার আমাদের লেখনীর সজ্জা বোধ হয় না—শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসংগত। কেননা কার্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এই জন্ত সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ, শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হাঁকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমহাশয় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া-ছুধ বা খেজুর রস বা শুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জ্ঞাত যায় না, অন্ন খাইলেই জ্ঞাত যায় এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসংগত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্যশাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা ইস্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্ত্র অন্ত্র অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এই জন্ত উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়—অন্যাসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে - অন্য জায়গায় বড়ো জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া বাইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজেই এই ভাবটা বাড়িয়া উঠিতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদ্ভিত হয়। শিক্ষা পাইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে বলিয়াই যে এমনটা ঘটে তাহা আমি মনে করি না। আমি পূর্বেই ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।



শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের স্বাভাব্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড়ো একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষত এতদিন আমরা আমাদের বাহা কিছু সমস্তকেই নির্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—আজ তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান করি, কিন্তু তাহা নির্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কখনোই চিরদিন টিকিতে পারে না—এই প্রতিক্রিয়ার ঘাত প্রতিঘাত শাস্ত হইয়া আসিবেই তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। সুতরাং হিন্দু কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্বল ও অস্পষ্ট। এখন আমরা যেটাকে চোখে দেখিতেছি সেইটেই আমাদের কাছে প্রবল। তাহা যে নানারূপে হিন্দুর ষথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেছে একথা মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পাজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন শ্রান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে ক্লান্ত হইয়া জগতে সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সম্ভাব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাধিয়াছে, দিগ্বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার খ্রীসমাজেও বীরত্ব, বিজ্ঞা ও তপস্শা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার হাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, আগ্রত চিন্তাবৃত্তির তাড়নার নব নব অধ্যবসারে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া শিক্ষিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল; বাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রঙ্কুতে বাঁধা কলের পুস্তলীর মতো একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না;—বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খ্রীষ্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত; যে সমাজের এক মহাপুরুষ একদা অনার্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক মহাপুরুষ কর্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়া

ছিলেন এবং ধর্মকে বাহ্য অমুষ্ঠানের বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রাপ্ত পথে সর্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন ; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না ;—যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি ;—প্রাণের ধর্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ বর্জনের ধর্ম ।

এই জন্তই মনে আশঙ্কা হয় যাহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী, তাহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত ? কিন্তু সেই আশঙ্কামাত্রই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না । কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে তো আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড়ো করিয়া তুলিতে চাই । তাহাকে চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড়ো হইবার দিকে যাইবেই—তাহাকে গর্তের মধ্যে বাধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য । বিশ্ববিদ্যালয় সেই চালনার ক্ষেত্র—কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিন্তাকে সচেতন করারই আয়োজন । সেই চেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সংকীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবেই । মানুষের মনের উপর আমি পুরা বিশ্বাস রাখি ; ভুল লইয়াও যদি আরম্ভ করিতে হয় সেও ভালো, কিন্তু আরম্ভ করিতেই হইবে, নতুবা ভুল কাটিবে না । ছাড়া পাইলে সে চলিবেই । এই জন্ত যে-সমাজে অচলতাকেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে সে-সমাজ অচেতনতাকেই আপনার সহায় জ্ঞানে এবং সর্বাগ্রে মানুষের মন জিনিসকেই অহিকেন ধাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া রাখে । সে এমন সকল ব্যবস্থা করে যাহাতে মন কোথাও বাহির হইতে পায় না, বাধা-নিয়মে একেবারে বদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিতে ভয় করে, চিন্তা করিতেই ভুলিয়া যায় । কিন্তু কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যেমনই হ'ক মনকে তো সে বাধিয়া কেলিতে পারিবে না, কারণ, মনকে চলিতে দেওয়াই তাহার কাজ । অতএব যদি হিন্দু সত্যই মনে করে শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা চিরকালের মতো দৃঢ়বদ্ধ জড়নিষ্ঠতাই হিন্দুর প্রকৃত বিশেষত্ব—তবে সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে দূরে পরিহার করাই তাহার পক্ষে কর্তব্য হইবে । বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে তাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে ।

কিন্তু যাহারা সত্যই বিশ্বাস করেন, হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো গতিবিধি নাই—তাহা স্থাবর পদার্থ—বর্তমানকালের প্রবল আঘাতে পাছে সে লেশমাত্র বিচলিত হয়, পাছে তাহার স্থাবরধর্মের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় এই জন্ত তাহাকে নিবিড় করিয়া বাধিয়া



রাখাই হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য—তাঁহারা মানুষের চিত্তকে প্রাচীর ঘেরিয়া বন্দী-  
শালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব না করিয়া বিশ্ববিজ্ঞান হাওয়া বহিবার জন্য তাহার  
চারিদিকে বড়ো বড়ো দরজা ফুটাইবার উদ্যোগ যে করিতেছেন ইহা ভ্রমক্রমে অবিবেচনা-  
বশতই করিতেছেন, তাহা সত্য নহে। আসল কথা, মানুষ মুখে যাহা বলে তাহাই  
যে তাহার সত্য বিশ্বাস তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। তাহার অন্তরতম সহজবোধের  
মধ্যে অনেক সময় এই বাহ্যবিশ্বাসের একটা প্রতিবাদ বাস করে। বিশেষত যে সময়ে  
দেশে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই ঋতুপরিবর্তনের  
সঙ্কিকালে আমরা মুখে যাহা বলি সেটাকেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া  
গ্রহণ করা চলে না। কাল্কুন মাসে মাঝে মাঝে বসন্তের চেহারা বদল হইয়া গিয়া হঠাৎ  
উত্তরে হাওয়া বহিতে থাকে, তখন পৌষ মাস কিরিয়া আসিল বলিয়া ভ্রম হয়, তবু  
একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে উত্তরে হাওয়া কাল্কুনের অন্তরের হাওয়া নহে।  
আমের যে বোল ধরিয়াছে, নব কিশলয়ে যে চিকণ তরুণতা দেখিতেছি, তাহাতেই  
ভিতরকার সত্য সংবাদটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদেরও দেশের মধ্যে প্রাণের  
হাওয়াই বহিয়াছে—এই হাওয়া বহিয়াছে বলিয়াই আমাদের জড়তা ভাঙিয়াছে এবং  
গলা ছাড়িয়া বলিতেছি যাহা আছে তাহাকে রাখিয়া দিব। একথা ভুলিতেছি যাহা  
যেখানে যেমন আছে তাহাকে সেখানে তেমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে যদি চাই তবে  
কোনো চেষ্টা না করাই তাহার পন্থা। খেতের মধ্যে আগাছাকে প্রবল করিয়া  
তুলিবার জন্য কেহ চাষ করিয়া মই চালাইবার কথা বলে না। চেষ্টা করিতে গেলেই  
সেই নাড়াচাড়াতেই ক্ষয়ের কার্য পরিবর্তনের কার্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই। নিজের  
মধ্যে যে সঞ্জীবনীশক্তি অনুভব করিতেছি, মনে করিতেছি সেই সঞ্জীবনীশক্তি প্রয়োগ  
করিয়াই মৃতকে রক্ষা করিব। কিন্তু জীবনীশক্তির ধর্মই এই, তাহা মৃতকে প্রবলবেগে  
মারিতে থাকে এবং যেখানে জীবনের কোনো আভাস আছে সেইখানেই আপনাকে  
প্রয়োগ করে। কোনো জিনিসকে স্থির করিয়া রাখা তাহার কাজ নহে—যে জিনিস  
বাড়িতে পারে তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিবে, আর যাহার বাড় ফুরাইয়াছে তাহাকে সে  
ধ্বংস করিয়া অপসারিত করিয়া দিবে। কিছুতেই সে স্থির রাখিবে না। তাই  
বলিতেছিলাম আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইয়া আমাদের নানা চেষ্টায়  
প্রবৃত্ত করিতেছে—এই কথাই এখনকার দিনের সকলের চেয়ে বড়ো সত্য—তাহা  
মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই বড়ো কথা নহে—ইহা তাহার  
একটা ক্ষণিক লীলা মাত্র।

শ্রীযুক্ত গোখলের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যপ্রবর্তনের বিল সম্বন্ধে কোনো কোনো

শিক্ষিত লোক এমন কথা বলিতেছেন যে, আধুনিক শিক্ষায় আমাদের তো মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে আবার দেশের জনসাধারণেরও কি বিপদ ঘটাইব? বাহারা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজের ছেলেকে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে কান্দ হইতেছেন না। এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি? ইহা যে কপটাচার তাহা নহে। ইহা আর কিছু নয়,—অস্তরে নব বিশ্বাসের বসন্ত আসিয়াছে, মুখে পুরাতন সংস্কারের হাওয়া মরে নাই। সেই জন্য আমরা বাহা করিবার তাহা করিতে বসিয়াছি অথচ বলিতেছি আর এক কালের কথা। আধুনিক শিক্ষায় যে চঞ্চলতা আনিয়াছে সেই চঞ্চলতা সম্বন্ধে তাহার মজলকে আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহাতে যে বিপদ আছে সেই বিপদকেও আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। নিরাপদ মৃত্যুকে আর আমরা বরণ করিতে রাজি নই: সেই জন্য জীবনের সমস্ত দায় সমস্ত পীড়াকেও মাথায় করিয়া লইবার জন্য আজ আমরা বীরের মতো প্রস্তুত হইতেছি। জানি উলটপালট হইবে, জানি বিস্তর ভুল করিব, জানি কোনো পুরাতন ব্যবস্থাকে নাড়া দিতে গেলেই প্রথমে দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলতার নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে—চিরসঞ্চিত ধুলার হাত হইতে ঘরকে মুক্ত করিবার জন্য কাঁট দিতে গেলে প্রথমটা সেই ধুলাই খুব প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে—এই সমস্ত অন্ত্রবিধা ও দুঃখ বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয় জানি তথাপি আমাদের অস্তরের ভিতরকার নূতন প্রাণের আবেগ আমাদেরিগকে তো স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমরা বাঁচিব, আমরা অচল হইয়া পড়িয়া থাকিব না,—এই ভিতরের কথাটাই আমাদের মুখের সমস্ত কথাকে বারংবার সবেগে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্তে আমরা আপনাকে অমুভব করি, পরক্ষণেই চারিদিকের সমস্তকে অমুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেকে পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই—সেই জাগরণই চারিদিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজেকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব।

আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাভাবিক রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনো মতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অমুভব করিতেছে। সেই অমুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেকে সেই সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জন দিতেছে—বাহা অসংগত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের—বাহা সমস্ত মাহুষের বুদ্ধিকে ক্রটিকে ধর্মকে আঘাত করে—বাহা কারাগারের প্রাচীরের মতো, বিশ্বের দিকে বাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনো প্রকার পথই

নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে খাচাই করিবার জন্ত আনিতেছে। তাহার নিজেকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড়ো করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই, তাহার নিজেকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক গিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই—তাহার নিজেকে সমস্ত জগতের অলংকার করিয়া তুলিবে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহংকার করিতে পারিব না। আমাদের যে-সকল আচার ব্যবহার সংস্কার আমাদেরকে ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়াছে, যে সকল ধাকাতো কেবলই আমাদের সকলদিকে বাধাই বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভ্রমণে বাধা, গ্রহণে বাধা, দানে বাধা, চিন্তায় বাধা, কর্মে বাধা—সেই সমস্ত কৃত্রিম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে দূর করিতেই হইবে—নহিলে মানবের রাজধানীতে আমাদের লাজনার সীমা থাকিবে না। একথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিসকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি যাহা বিশ্বের আদরের ধন যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার অভ্যুদ্যান নহে। সেইটেকে লাভ করিলেই আমরা যথার্থভাবে রক্ষা পাইব—কারণ, তখন সমস্ত জগৎ নিজের গরজে আমাদেরকে রক্ষা করিবে। এই ইচ্ছা আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা আর কোণে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমরা যে-সকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতেছি তাহার মধ্যে একই কালে আমাদের স্বাভাব্যবোধ এবং বিশ্ববোধ দুই প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দুবিদ্যালয়ের কল্পনাও আমাদের কাছে নিতান্ত অভূত বোধ হইত। এখনও একদল লোক আছেন যাহাদের কাছে ইহার অসংগতি পীড়াজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহারা এই মনে করিয়া গৌরব বোধ করেন যে হিন্দু এবং বিশ্বের মধ্যে বিরোধ আছে—তাই হিন্দু নানাপ্রকারে আটঘাট বাধিয়া অহোরাত্র বিশ্বের সংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতেই চায়; অতএব হিন্দু টোল হইতে পারে, হিন্দু চতুষ্পাঠী হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পারে না—তাহা সোনার পাথরবাটি। কিন্তু এই দল যে কেবল কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে, ইহাদেরও নিজদের ঘরের আচরণ দেখিলে বোঝা যায় ইহারা যে কথাকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, গভীরভাবে, এমন কি, নিজের অগোচরে তাহাকে বিশ্বাস করেন না।

যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের মর্যাদিষ্টাঙ্গী দেবতাকে আমরা চিরকাল মন্দিরের অঙ্ককার কোণে বসাইয়া রাখিতে পারিব না। আজ ব্রহ্মাঙ্গার দিন আসিয়াছে—বিশ্বের রাজপথে, মাজুঘের সূর্যদুঃখ ও আদান-প্রদানের পণ্যবীথিকায় তিনি বাহির



হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার রথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে যে যেমন করিয়াই তৈরি করি না—কেহ বা বেশি মূল্যের উপাদান দিয়া, কেহ বা অল্প মূল্যের—চলিতে চলিতে কাহারও বা রথ পথের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে, কাহারও বা বৎসরের পর বৎসর টিকিয়া থাকে—কিন্তু আসল কথাটা এই যে শুভলগ্নে রথের সময় আসিয়াছে। কোন্ রথ কোন্ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছবে তাহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলিতে পারি না—কিন্তু আমাদের বড়োদিন আসিয়াছে—আমাদের সকলের চেয়ে যাহা মূল্যবান পদার্থ তাহা আজ আর কেবলমাত্র পুরোহিতের বিধি-নিষেধের আড়ালে ধূপ-দীপের ঘনঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না। আজ বিশ্বের আলোকে আমাদের যিনি বরণ্য তিনি বিশ্বের বরণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন। তাহারই একটি রথ নির্মাণের কথা আজ আলোচনা করিয়াছি; ইহার পরিণাম কী তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এই রথ বিশ্বের পথে চলিয়াছে, প্রকাশের পথে বাহির হইয়াছে,—সেই আনন্দের আবেগেই আমরা সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া ইহার দড়ি ধরিতে ছুটিয়াছি।

কিন্তু আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যাহারা কাজের লোক তাঁহারা এই সমস্ত ভাবের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিসটা তৈরি হইয়া উঠিতেছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখো। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যার কোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনও আমাদের যতটা আছে তখনও তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এ পর্যন্ত তাহার তো কোনো প্রমাণ দেখি না; তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কুস্তকার মূর্তি গড়িবার আরম্ভে কাদা লইয়া যে তালটা পাকায় সেটাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলে চলিবে না। একেবারেই এক মুহূর্তেই আমাদের মনের মতো কিছুই হইবে না। এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, মনের মতো কিছু যে হয় না, তাহার প্রধান দোষ মনেরই, উপকরণের নহে। যে অক্ষম সে মনে করে সুযোগ পায় না বলিয়াই সে অক্ষম। কিন্তু বাহিরের সুযোগ যখন জোটে তখন সে দেখিতে পায় পূর্ণ শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না বলিয়াই সে অক্ষম। যাহার ইচ্ছার জোর আছে সে আর একটু শ্রম পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে। আমাদের হৃদয়গায়ে দেখেই আমরা প্রতিদিন এই কথা শুনিতে পাই, এই জায়গাটাতে আমার মতের সঙ্গে মিলিল না অতএব আমি



ইহাকে ত্যাগ করিব—এইখানটাতে আমার মনের মতো হয় নাই অতএব আমি ইহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। বিধাতার আদুরে ছেলে হইয়া আমরা একেবারেই ষোলো আনা সুবিধা এবং রেধায় রেধায় মনের মিল দাবি করিয়া থাকি—তাহার কিছু ব্যত্যয় হইলেই অভিমানের অস্ত্র থাকে না। ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্বল ও সংকল্প যাহার অপরিশ্ফুট তাহারই দুর্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া মনের মতো করিয়া তুলিব—একদিনে না হয় বহুদিনে, একলা না হয় দল বাধিয়া, জীবনে না হয় জীবনের অন্তে—এই কথা বলিবার জোর নাই বলিয়াই আমরা সকল উদ্যোগের আরম্ভেই কেবল খুঁতখুঁত করিতে বসিয়া যাই, নিজের অন্তরের দুর্বলতার পাপকে বাহিরের ঘাড়ে চাপাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারি একটা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করিয়া থাকি। যেটুকু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, বাকি সমস্তই আমার নিজের হাতে, ইহাই পুরুষের কথা। যদি ইহাই নিশ্চয় জানি যে আমার মতই সত্য মত—তবে সেই মত গোড়াতেই গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া তখনই গোসাঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিয়া বসিব না—সেই মতকে জয়ী করিয়া তুলিবই বলিয়া কোমর বাধিয়া লাগিতে হইবে। এ কথা নিশ্চয় সত্য, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিব না—কেননা কলে মানুষ তৈরি হয় না। আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোরথ সিদ্ধি হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে যদি আমরা স্পষ্ট করিয়া না বুঝি তবে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বুঝিব তাহা নহে—যদি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি তবে বাহিরে তাহার প্রতিকূলতা যত প্রবলই থাক সমস্ত ভেদ করিয়া আমাদের সেই উপলব্ধি আমাদের কাজের মধ্যে আকার ধারণ করিবেই। এই জন্যই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কী ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে মনে কোনো প্রকার সংশয় রাখিতে চাহি না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত কল লাভ করিব বলিয়াও আশা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিন্তাকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নিভুল যত্নের চেয়ে আমি তাহাকে প্রভা করি। আমাদের সেই জাগ্রৎ চিন্তা যে-কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের ষপার্থ কাজ—চিন্তার বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী—আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে—তাহাদের সংলোধন হইবে, তাহাদের বিস্তার হইবে;

বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সংকোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফুট হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

## ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্ঠাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্ত তাঁহাকে অস্বরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জ্বিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি স্বার্থ শিক্ষা মনে করি। বাধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অস্বরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অঙ্ককারে ঢেলা মারা হয়—তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহঁত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারি ভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রকৃত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ আপনার নিজের প্রণালীমতোই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার করমামল করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্ত তাঁহার মন অস্থূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগ-বাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন—সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনারির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার স্বেচ্ছাগত, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাঁহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক্ দিয়া তাঁহার পরিচয়-লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অগ্নের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অস্তিত্ত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অস্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাঁহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিন্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সত্ত্বেও তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব যুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্ত তিনি প্রাণ সমর্পণ



করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিররূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থল আবরণকে একে-বারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত ভেঙ্গে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধস্ত হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্ত দরদস্তর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন;—তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই;—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্ত মানুষ যত প্রকার কষ্টসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড়ো আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাণ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সেদিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অস্বরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড়ো করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই ধ্বংস করিতেছি।



বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ—আমরা হিন্দুমানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যে রূপ সংস্কারমুক্ত চিন্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে তাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুমানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত্র আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষু পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনই প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই—কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এই অশ্রু যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিপুল কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড়ো জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়ো হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আয়ত্ত ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম,

সেখানেই দেখিরাছি বাহিরের বড়ো আয়তনে সাঙ্খ্য লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশ্রাল দিতে হয় তাহা তিনি অস্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এই জগুই এই একটি আশ্চর্য দৃষ্ট দেখা গেল, যাহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নিচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনোদিন ইহার জন্য তিনি অর্থসাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্ভূত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরারের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অহুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

একথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীর নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিন্তাশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃকপাতও করেন নাই।

তাঁহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুপ্ত করে নাই। অতঃপর যুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহার নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহার নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার প্রজ্ঞাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অতুগ্রহ আছে। কিন্তু প্রজ্ঞা দেয়ন্, অপ্রজ্ঞা দেয়ন্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ প্রজ্ঞার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ

নিভাস্ত মূহুৰ্ত্তাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিভাস্ত দুৰ্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূৰ্বেই এ কথাই আভাস দিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটা দুৰ্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পান্চাত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিকৃত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসঙ্গেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভালো মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্ত তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজের লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে কচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল ;—তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্ত উমেদারি করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এসম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে পুষ্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই “পীপুল”কে এই জনসাধারণকে আবৃত্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এসম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও



কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ওইরূপ কোনো একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গওগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্ত মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম প্রকার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্ত লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার প্রকা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বস্তান্ত কেবল বুঝি দিয়া নয় আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভালো, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতই তিনি এই ভালোটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনো তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু প্রকার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তার কাছে তুচ্ছ। যাহারা ভালো শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কোতূহল, তাহাদের খেলাধুলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি



শিশুই আছে। এই জন্ত জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সাধনা দিবার নানা প্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমাহুবি যেমন নিরর্থক নহে—তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে—তাহা আপনাকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্ত জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা—তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয় নিবেদিতা জনসাধারণের এই সমস্ত আচার-ব্যবহারকে সেই দিক হইতে দেখিতেন। এই জন্ত সেই সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানব-প্রকৃতির চিরন্তন গুঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সঙ্কল্প ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না, অথবা যেখানে রাজার কোনো অঙ্গায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছে হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্ত সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যালোকের অসংগত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার “পীপুল”দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভালো তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনায়াসের অপ্রকাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিগত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন অপ্রকার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষী বাস করিতেছেন সেখানে তো এই সকল প্রকাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই এই জন্তই তিনি এই সকল বিদেশীয় দিগ্‌নাগদের “স্থূলহস্তাবলম্ব” হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যেসকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা আনাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশ্রয়রসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোধের স্বল্পশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন যুরোপীয়ের কথা শোনা যায় বাহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত

আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসঙ্ঘের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন ; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়াছেন । তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্ত ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই । তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না ।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে প্রকৃতি তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের দ্বার খুলিয়া না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত । এই জন্ত অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই । সমস্ত দৈন্তই তাঁহার স্নেহকে উদ্ভোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে । আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন যুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমতো বুঝিতেই পারি না, এই জন্ত আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণ অহেতুক বলিয়া মনে করি । কিন্তু ছোটো ছোটো ক্রটি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড়ো বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে । বেড়ার বাধার চেয়ে ছোটো ছোটো কাঁটার বাধা বড়ো কম নহে । অতএব এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালিপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল । একপ্রকার স্থলক্রটির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না—তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে । ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না । সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল ; ক্রটির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে ; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে ভীষণ পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই । সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন ।

শিবের প্রতি সত্যের সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাঙ্গনে অনঙ্গনে অগ্নিতাপ

সহ করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্তায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্তা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বাহুবদের সনির্বন্ধ অমুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রকল্পচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্তা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বী, তুমি যাহার জন্য তপস্তা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কষ্টসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিকল্প, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারই মধ্যে আমার সমস্ত মন “ভাবৈকরস” হইয়া স্থির রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনঘোষন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্তদূর্লভ স্নগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এই জন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাহার রূপের অভাব দেখিয়া কচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্তা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিকল্পতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দ্বিবা দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পূত্র হইতে



প্রিয় বিদ্য হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন।<sup>১</sup> তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে অগ্র করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃকপাতমাত্র করেন না।

১৩১৮

## শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিজ্ঞান মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিজ্ঞা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, শ্রীলোককে বিজ্ঞা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোকে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরও বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরও বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলা দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে যুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার ছুরারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বছর দূরে দূরে এবং কত মিটমিট করিয়া জলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিজ্ঞানশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞা-

<sup>১</sup> ভবেভ্যং প্রেমঃপূজ্যং প্রেমোবিশ্ভাৎ প্রেমোহন্তর্যাং সর্বত্রাৎ অনন্তরতর বদয়মাশ্রা।



বিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই কসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যারা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন, তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিজ্ঞার এই বর্ষণের বেলায় অন্ততঃ তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলায় অট্টহাস্তের বিদ্রোহ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুজলার বিজ্ঞা একটা অদ্ভুত জিনিস,—তার খোসার কাছে তলতল করে তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবুসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিজ্ঞাটাকে যে প্রণালীতে জাগ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিজ্ঞাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে-বিজ্ঞার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্যালোকের তা লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

অবাবে কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল পূর্বদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠিতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাচ কথা এবং ব্যাকরণ-সূত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিজ্ঞা। একথা মানি, কিন্তু বিজ্ঞার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পণ্ড এবং কুণো; পশ্চিমেও পেডাক্টি মরিতে চায় না। তবে কিনা যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিজ্ঞার বল কমিয়া গিয়া বিজ্ঞার কার্যদাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু একথা মানিতে হইবে তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচক্ষু ও জ্ঞানপঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বন্ধ ছিল বটে কিন্তু তখনকার কালের বিজ্ঞাটা সমাজের নাড়িতে নাড়িতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষি, কি অস্তঃপুরের স্ত্রীলোক সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিজ্ঞার সেচ পাইত। সুতরাং এ জিনিসের মধ্যে অল্প অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু আমাদের বিলাতি বিজ্ঞাটা কেমন ইন্দ্রুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কি চিন্তায়, কি কাজে কলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশে আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। একথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সূত্যর দীপ জালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো

তবে তা ভালোই নয় একথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সার্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গান্ধী এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। গুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলা দেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলা দেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলা দেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উলটো দিকে গজাইবে।

যে সার্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। একদিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্তরিক্কে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আব্রতনকে আরও সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম সেদিন বেহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুধ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞান লাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা,—ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারি নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালায়ও দরকার একথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিজ্ঞার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যিকদৃষ্টে যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার যত্নো হইবে।

আড়িনার মানুষ বিছাইয়া আমরা আসন্ন অমাইতে পারি, কলা পাতার আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্কৃত ধারা তাঁদের অধিকাংশই খড়ো

ঘরে মানুষ,—এদেশে লক্ষীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে একথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্তার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্ত্রভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকঘরের 'পরে' নয়, দেবতার 'পরে'। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে—শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলার মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো—অনাজাতঃ পুষ্পঃ কিসলয়মলুনঃ করুণহৈঃ—অবশ্য ইনস্পেক্টরের করুণহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান,—এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে—এবং এইখানটার আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়—উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। যেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈন্ত জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাস্থিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সত্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুশাখার বিস্তার কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে! সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান বাজনা, আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, শিক্ষা দীক্ষা, রাজ্যাশাসন, আইন আদালত সভা দেশে সমস্তই অতি অটল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রকৃত আয়ুগা জুড়িয়া বসে; এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক—এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। এইজন্য বর্তমান সত্যতাকে বৈ-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের মাতার দেওয়ার মতো, তার



হাত-পা ছোড়ার জল ঘুলাইয়া কেনাইয়া উঠিতেছে ;—সে জানেও না এত বেশি ইঁসফাস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত পা ছোড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সত্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে আপনি পাখা, চীন-বাসন, হরিণের শিং, বাঘের চামড়া,—তার এ কোণ ও কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা দুঃস্বপ্নের মতো ছুটিয়া যাইবে ; মেয়েদের মাথার টুপিগুলো হইতে মরা পাখি, পাখির পালক, নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে ; তাদের সাজ-সজ্জার অমিতাচার বর্ষরতার পুরাতন স্থান পাইবে, যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুবি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জার মাথা হেঁট করিবে ; শিক্ষা বল, কর্ম বল, ভোগ বল, সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে ; এবং মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, যেনাহং নায়তা শ্চাম্ কিমহং তেন কুধাম্।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন বাড় হেঁট করিয়া আমাদেরকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রকৃত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ওইটেই প্রাথমিক ; ইটের কোটা যত বড়ো হাঁ করিয়া হাঁই তুলিবে বিজ্ঞা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কালেক্স জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে ভূশাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে ? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কারদার সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। যতই বলি না কেন, শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্ছেই রাখিব, কারদাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও—সে কথার কেহ কান দেয় না। বলে কি না, ওই কারদাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্তেই ওই কারদাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব। কাজেই আমাদেরকে বলিতে হইল, অস্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অস্তঃকরণের অলুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা একথা জানি। কিন্তু সেই সামগ্র্যটাকে যুরোপ এখনও বাহির করিতে পারে নাই ; বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদেরকেও সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে ? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও :



সমস্তটাকেও সাদাসিধা করিয়া তুলিব সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি কিন্তু মেজাজটাকে স্তব্ধ লইতে সে যে বিষম জুলুম।

পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোস্তপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। যুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য পুস্তক শিক্ষার অনেক উপায় আছে। কেবল গরিব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিজ্ঞা টাকা লইয়া বেচা কেনা হইত না।

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ ইহা তো অন্তত দেখিয়াছি। এই জন্য যুরোপে আপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল—এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেশুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাতে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে এই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের, আর সংখ্যা যদি কমে তো বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলা দেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সে জন্যে শিক্ষাবিতাগে উদ্বেগ নাই। এই উপলক্ষ্যে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে,—এই তো দেখি লেখাপড়ার বাঙালির শখ আপনিই কমিয়াছে—যদি গোখলের অবশুশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছকের 'পরে জুলুম করাই হইত।

এ সব কথা নির্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলণ্ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার শখ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ বাঙালির 'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও যত্ন-প্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবুদ্ধির বর্তমান অবস্থার স্বজাতির জন্য

প্রতাপ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিস অল্পকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে কিন্তু এখনও এমন কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্ত কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্ত ডাক্তার খরচটা বাদ দিয়া অস্ত্রোপসংকারেরই আয়োজনটাকা করা উচিত।

তবে কি না, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্তঃস্থ বিজ্ঞাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিজ্ঞা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে এক রকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনা-বাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি; যে জিনিসের জন্ত নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম ইাকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্ত আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা দ্বারা বলে, নিরসাধারণের জন্ত যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে, তারা কতৃপক্ষদের কাছ হইতে একথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন কি, অনিষ্টকর।—জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না একথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্ততাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত বাচাই করিতে হইলে দুটো একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ মুটাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিত্যসঙ্গ সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলা ভাষার আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক

বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এই জন্তই দেশের পুরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে, দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না—তার কারণ এই যে, আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিজ্ঞাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার ছুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অনুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্ঠতাপ-হাস্ততাম্।

আমাদের এই ভীকতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে আপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ আপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া যুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন আপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্ভোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। আপান জোর করিয়া বলিল যুরোপের বিজ্ঞাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা ভেমনি করা, ভেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিজ্ঞার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে ইংলুল কালেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোক-শিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষা-বিস্তারের জন্ত দেশের লোকের চাঁদার বছকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞান সভা বাড়ি



দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদ দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্বরূপভূক্তের মতো স্থাপু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলা ভাষার বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীষণ ওজর। কঠিন বই কি, সেই অশ্রেয়ই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি ভাষাতে সারান্স, তার উপরে, দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা অগম্যবিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের কলাও জায়গা নাই এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের ভাষায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের অস্ত্র সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাকুক—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারী বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূত্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা বিজ্ঞ হই?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্ত নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি জার্মান লিখিলে আরও ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি লিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্ত বিজ্ঞার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্মুখে বলা যায়।

দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর ছাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুন্ড্য মশায় ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই,—বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিজ্ঞার যতই পাকা হুক বাংলা না লিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিজ্ঞাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার শিক্ষাবিজ্ঞান কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্ভরতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?



আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না—একটা প্র্যাকটিক্যাল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলোয় যাক, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উসখুস করিয়া ওঠে তাহলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন কি, লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তাহলেও বৃষ্টি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম কল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন পাশের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যান্ডটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁক ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন,—এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। তনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজো মশায়ের কল্যাণে ঘটয়াছে।

আমি এই বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আড়িনায় যেমন চলিতেছে চলুক,—কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আমদরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাড়ালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহুত যারা তারা ভিতর বাড়িতেই বসুক—আর রবাহুত যারা তারা বাহিরে পাত পড়িয়া বসিয়া যাক না। তাদের জন্ত বিলিতি টেবিল না হয় না রইল, দিলি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দরওয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? আভিলাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার দ্বারা যদি গজাধমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাড়ালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা এক সঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সি ডি ভাঙিবার বেলাতেই চিত্ত হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। এক তো যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের ধাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যাকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আন্তর্গম্যমাদন বহিতে হয়;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্বতিশক্তির ক্ষেত্রে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিঙ্কিত্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রকম ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যালয়ের হইতে যাবজ্জীবন আগুামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মূল্যটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌধুরিত্ব। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল? সত্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্বরণশক্তির মূল্যটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসত্যরকমে চুরি করে অথচ সত্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তাহাই?

যাই হ'ক ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে ছাবড়ার পুলটাই না হয় দু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারি খেদাও কি তাদের কপালে জুটিবে না? সীয়ার না হয় তো পানসি?

ভালোমতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না ?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পৰ্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না ? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি ; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজতাবার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ওই রাস্তাটাতেই। তাই হ'ক—বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্ডের ছেলে খাত্তৌস্তন্তে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃসন্ত হইতে বঞ্চিত করা কেন ?

অনেকদিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাগদোষে বেকাস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ার কথাটা আমি বেশ কোণলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়াছিলাম গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চোঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে শুরু করিয়াছিলাম আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারই এককোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল ; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার পুর আপনি চড়িতে থাকে ; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তার কল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও সেটা নুতন নয়। শুনিয়াছি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশ পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুড় ধরেই মরে। আর সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষার উচ্চতরের শিক্ষাগ্রন্থ কই ? নাই সে কথা জানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে ? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, জোঁধিন লোকে শখ



করিয়া তার কেয়ারি করিবে,—কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কটকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রহের জন্ত বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পাল্লা এবং কুলের পথ চাহিয়া নদীকে মাধার হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলার উচ্চশিক্ষার শিক্ষাগ্রহ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চশিক্ষার শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের তার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ চিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দুপাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হাঁচট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার-ষোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে,—ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অম্লসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের অগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেননাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরও অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাতসমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া ঘাইতে পারে কেবল বাংলা দেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদের নাই!

জার্মানিতে ক্রাঙ্গে আমেরিকায় আপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মাহুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মাহুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই অনকে মাহুষ করা কোনোমতেই পয়ের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে



সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার কল হইয়াছে, উচ্চঅঙ্কের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্কের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আগনার ঝোলানো থাকে,—তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপোরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজাউজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং ধবরের কাগজে অশ্লীল্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বাংলার সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে ধার প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বান্নে পোষণ সকার করিতেছে না। ধাত্তের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভরতি করে, দেহপূর্তি করে না।

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ওই বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়ো-গোছের সীলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষ চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যাল্যভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিজ্ঞা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মঙ্গাগত। সেইজন্ত ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাখার করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাত আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্কের দৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কি না, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া বারো গড়িয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ভিগ্রী লইতেই হয়—কিন্তু সে পথ বাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার অন্তর্গত শিক্ষিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ভিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমতো বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, ছুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যারা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সম্ভব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা-সাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্গুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল;—তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সম্ভব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজস্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিজ্ঞার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যাত্তম নহে। তার ছোটো কারণ আছে, এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ উপাসকদের ভক্তি এত সূক্ষ্ম যে, আমরা ক্রাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু যুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ওই ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে এই ছাঁচের পাশে একটা সম্ভব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে ভুর্ক না করিয়া

বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ঘোরা উড়াইয়া ঘরঘর শব্দে হাটের জন্ত মালেক্ত বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে কল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাবী বিহঙ্গমকে নিজের শাখার শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ওই কলটার সঙ্গে রক্ষা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আগিস আদালত, পুলিশের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, আহাজের জেট, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক না। আমাদের দেশ যেখানে কল চাহিতেছে ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি না কেন? গুরু চারিদিকে শিখ আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ব-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল ভপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা—ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল তেমনি করিয়াই বিশ্ববিজ্ঞানকে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা থাক না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—“আমরা চাই!” এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যারা আচার্য, যারা সজ্ঞান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিশুদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাপ যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষার গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তুষার জলে ও স্ফুদার অগ্নি পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথার কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনার।

১৩২২

## ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিভঙ্গে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।



জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয় সংঘম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাত করিয়া, আর সংঘমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রক্ষা করিয়া। রূপ একদিকে আপনাকে মানিতেছে, আর একদিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্র, দু্যলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য ও চন্দ্র দু্যলোক ভূলোক আপন-আপন সীমার খণ্ডিত ও বহু—কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি? যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে; যেখানে প্রত্যেকে সংঘমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎ সৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংঘম সেই সংঘমই মঙ্গল সেই সংঘমই সুন্দর। শিব যে বতী।

আমরা যখন সৈন্সদলকে চলিতে দেখি তখন একদিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র আর একদিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুখমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক বতী পরিশুট এই সৈন্সদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পারের তলায় দীলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না—অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কি জানে কি প্রেমে কি কর্মে মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে,—এই জন্ত মানুষ আপনার সমস্ত জানার চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে। নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্বী করিতেছে এককে পাইবার জন্ত।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্প-শাস্ত্র চিত্রকলা সম্বন্ধে কী বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক।

সেই ক্ষান্তে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাত্তল।



“রূপভেদাঃ”—ভেদ লইয়া শুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে—একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি সুসম্যাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা তো ভূতের কীর্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্ষে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে; আমাদের সৃষ্টিকার্ষে যদি তার সেটা অনুধা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন শুক তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত, তখনই একের সহিত অত্রের সুনিয়ত যোগ—তখনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একই সংগীত প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুসম্য যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে “রূপভেদ” আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে “প্রমাণানি” অর্থাৎ পরিমাণ জিনিসটাকে একেবারে সমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি ভেদ নইলে মিল হয় না এই জন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে; সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এই জন্যই সীমা, নহিলে আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেমনা আপনার সত্য মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারিদিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানে না যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলনাত্তে যার ওজনের গরমিল হইল সেই তো মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া এককে মাপা। তাই দেখি সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম। একদিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতার চারিদিক হইতে পৃথক ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-একদিকে তাহা প্রমাণের সুসম্য চারিদিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা তো হইল বহিরঙ্গ—একটা অস্তরঙ্গও তো আছে।

কেননা, মানুষ তো শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না—চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র “রূপভেদাঃ প্রমাণানি”তে বড়দের বহিঃস্থ সারিয়া অন্তরের কথায় বলিতেছেন—“ভাবলাবণ্য যোজনং”—চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে—চোখের কাজের উপরে মনের কাজ ফলাইতে হইবে; কেননা শুধু কাজ কাঁজটা সামান্য, চিত্র করা চাই—চিত্রের প্রধান কাজই চিত্রকে দিয়া।

ভাব বলিতে কী বুঝায় তাহা আমাদের এক রকম সহজে জানা আছে। এই জন্তই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। ফটিক যেমন অনেকগুলি কোণ লইয়া দানা বাধিয়া দাঁড়ায় তেমনি “ভাব” কথাটা অনেকগুলি অর্থকে মিলাইয়া দানা বাধিয়াছে। এ সকল কথার মুশকিল এই যে, ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাতাবে ব্যবহার করি না, দরকার মতো ইহাদের অর্থছটাকে ভিন্ন পর্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে ideas, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরও কত কী আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব তোমার একটা ভাব; সেইভাবে আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সত্ত্বে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সত্ত্বেও সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-রোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে অর্থাৎ আপনার চারিদিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সত্ত্বেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিংবা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল ভ্রমশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিসকেই মনের জিনিস করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কী?

অর্থাৎ ইহাতে তো হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্রের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে—ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে? দেখিলাম একটা গাছ—কিন্তু গাছ তো ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অস্তরের কথাটা কী, অথবা যে আঁকিল গাছের মধ্য দিয়া তার অস্তরের কথাটা কী সেটা যদি না পাইলাম তবে গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের? অবশ্য উদ্ভিদতত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেখানে সেটা চিত্র নয় সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। “আমাকে দেখো” “আমাকে জানো” তাহাদের দাবি এই পর্যন্ত। কিন্তু “আমাকে রাখো” এ দাবি করিতে হইলে আরও কিছু চাই। মনের আম-দয়বারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিস হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, “বসো,” কাহাকেও বলে “আচ্ছা যাও”।

যাহারা আর্টিস্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে, তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ মনের দয়বারে নিত্য আসন পাইবে। যে সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাভণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদি, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাভণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিজ্ঞায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তানে মারে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিস যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মতো একই বাধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অস্তরের জিনিস সে “নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি”র পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাধা রাস্তায় ঠিক এক লাইনে চলিয়া প’টো হইয়া কারিগর হইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এই জন্ম নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাধের মতো দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির বড়দের আমরা দুটি অঙ্ক দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্কে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক। সেটার নাম “সাদৃশ্য”। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য ঘেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে শাস্ত্রবাক্য তাহার



পক্ষে বৃথা হইল। ষোড়াগোন্ধকে ষোড়াগোন্ধ করিয়া আঁকিবার অস্ত্র রেখা প্রমাণ ভাব লাগণের এত বড়ো উদ্যোগপর্ব কেন? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোন্ধ-চুরি কাণ্ডের অস্ত্রই উদ্যোগ পর্ব, কুন্ধক্ষেত্রযুদ্ধের অস্ত্র নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে। একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য; আর-একটা ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনই রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব লাগণের কথা পাড়া হইয়াছে তখনই বোঝা গিয়াছে শুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অস্ত্রের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃষ্টমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অস্ত্রের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃষ্ট তবেই দৃষ্টে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অস্ত্র রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না; রেখাভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাগণের জোড় মিলিল না;—হয়তো রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়তো ভাবের দিকে—পরম্পর পরম্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল কেনও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টায়মিতরে জনাং, বাহিরের লোক হয়তো পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়ধ্বনি করিল কিন্তু অস্ত্রের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে! চোখ-ভোলানো চাতুরীতেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কিনা, সেই তো রসিক। বাতাস যেমন শূর্যের কিরণকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি শুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্যকে লোকালয়ের সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার এই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপুর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারে না,—সে জানে তন্নষ্টঃ যন্ন দীযতে। সর্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে! ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্তা—এরা নানাদিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায় - সে টাকা বন্ধ করিয়া রাখিবার অস্ত্র নহে;—সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই—এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের জেদ প্রমাণে বঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাগণো সংঘত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পুরাপুরি মিল হইয়া গেল—এই জো সব চুকিল। ইহার পর আর থাকি রহিল কী?



কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনও যে ফুরাইল না ! স্বয়ং শ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল । পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা বর্ণিকাভঙ্গ—  
রঙের ভঙ্গিমা ।

এইখানে বিবম খটকা লাগিল । আমার পাশে এক গুণী বসিয়া আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি । তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা বড়লের গোড়াতেই আছে আর এই রঙের ভঙ্গি যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনার কার কত ?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত ।

তাঁর পক্ষে শক্ত বই কি ? দুটির পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না । আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ ।

রং আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে । ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয় । এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিস । অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না ।

এই জন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না । বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক ।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া । আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম-দাগ । এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে । আলোর উলটা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার ।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না । স্বয়ং সে শুধু অঙ্ককার, দোয়াতের কালির মতো । সাদার উপর যেই সে দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয় । সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে । শুভ্র ও নিম্ন অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালীর পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমার সীমার রেখার রেখার ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে । কালীরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্রকলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি । নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ ।

আলো আর কালো অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব দুই একান্ত । রংগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে । ইহার যেন বীণার আলাপের মীড়—এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্দায়ে পর্দায়ে ইশারায় দেখাইয়া দেয়—ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে

পুর আপনাকে অভিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গি দিয়া রেখা আপনাকে অভিক্রম করে; রেখা যেন অরেখার দিকে আপন ইশারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট,—আর রং জিনিসটা নির্দিষ্ট অনির্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝধানকার নানা টানের ঘোড়। সীমার বাধনে বাধা কালো রেখার তারটাকে সাদা যেন খুব ভীত করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতিক্রমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রং জিনিসটা রেখা এবং অরেখার মাঝধানের সমস্ত ভঙ্গি। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালোর নৃত্য সেখানে এই রংগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাত কম নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ রং জিনিসটা মধ্যস্থ—দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থ ই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকান্ড।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্তদলের চালের মতো সেই বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে—তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিস নহে। তাহা কবিতার লক্ষ্য নহে উপলক্ষ্য মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে-কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাঁহাকে উচ্চরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

সৃষ্টিকর্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন তাঁর আর-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের সৃষ্টি মাত্ত্বের ভিতরের তারে বা দিয়া যখন একটা মানস পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের পুর বাজায় তখনই সে আর থাকিতে পারে না,

বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই স্রষ্টা মানুষের সৃষ্টিতে ভিতর বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত। এই স্রষ্টা মানুষের সৃষ্টিতে বাহিরের অগতির আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিস্টের কাজ হয় তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য একদিকে রসরসরূপে বাহ্য আকার, আর-এক দিকে শক্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্যরূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের সৃষ্টিকার্য। মনের সৃষ্টিকার্যও এমনিতরো। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস পদার্থটা একদিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্যদিকে সৌন্দর্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের সৃষ্টি—যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো সৃষ্টি নহে।

তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভাষা কবিতায় তেমনি ব্যঙ্গনা (suggestiveness)। এই ব্যঙ্গনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঙ্গনা ব্যক্ত ও অব্যক্তের মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঙ্গনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই—অর্থাৎ একটা রূপ, আর একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংঘমের দ্বারা বাধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাধন প্রমাণ, ভিতরের বাধন লাভন্য। তার পরে সেই ভিতর বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের স্রষ্টা? সাদৃশ্যের স্রষ্টা। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য? না, ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাভন্য কেবল যে অনাবশ্যক হয় তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঙ্গনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনার সোহাগা—কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড়ো হইয়া ওঠে,—তখন তাহা কতটা যে বলিতেছে তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না—তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।



## সোনার কাঠি

রূপকথার আছে, রান্ধসের জাহুতে রাজকন্ডা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনার পুরী, যে পালকে শুয়েছেন সে সোনার পালক; সোনা মানিকের অলংকারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াবড় পাহারা, পাছে কোনো স্বেপনে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কী? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়ো। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাকবে, তার এক পা বাইরে যাবে না, তাহলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে তাতে দেহের প্রাণটা টিকে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এই রকম। সে মোহ-রান্ধসের হাতে পড়ে বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালকটুকুর মধ্যে এই স্তব্ধতার স্থিতি তার ঐশ্বর্ষের সীমা নেই; চারিদিকে কারুকার্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র! সেই চেড়ির দল, বাদ্যের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই; তারা শত শত বছর ধরে সমস্ত আসা যাওয়ার পথ আগলে বসে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে কল হয়েছে এই যে, যে কালটা চলছে রাজকন্ডা তার গলায় মালা দিতে পারেনি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্ষের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্ষ যত সৌন্দর্যই থাক তার গতিশক্তি যদি না থাকে তাহলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালকের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায়—তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে গান জিনিসটা চলছে না। ওস্তাদরা বলছেন, গান জিনিসটা তো চলবার জন্তে হয় নি, সে বৈঠকে বসে থাকবে তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে; কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিজ্ঞান করতে পাই সে মুসাফিরখানার। যা কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাকতে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চলছি সে নদী চলছে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামি নৌকো হলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।



সংসারে স্বাবর অস্বাবর দুই জাতের মানুষ আছে অতএব বর্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কী? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামি চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা শহরে আসত। ধনীদের ঘরে মজলিস বসত, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুনতিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের শহরে বক্তৃতাসভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানসের সমেত বৈঠকি গান পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারে এত বড়ো মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চা নেই বলে জবাব দিলে আমি শুনব না। মন নেই বলেই চর্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভালো রাজত্ব, কিন্তু কী করা যাবে—সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাকবে একথা বললে অশ্রায় হবে। আমি বলছিনে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিকতে হবে—সে যে বর্তমান কালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অস্তহীন করে তুলবে তা হতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কী হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত তাহলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছি। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে বসে, তাহলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্ডার পালকের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লরলামজলুর হাতির দাঁতে বাধানো পালকের উপর রাজকন্ডা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর খালা বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ ঠেকিয়ে রাখে কে?

যারা মজলিসের চেয়ে কৌলীককে বড়ো করে মানে তারা বলবে ওই রাজপুত্রটা

যে বিদেশী। তারা এখন বলে, এ সমস্তই কুরো ; বস্তুতঃ যদি কিছু থাকে তো সে ওই কবিকল্প চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তাহলে এ কথা বলতেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুত্বকে মানুষ পছন্দ করে না ; মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তব গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার কল হয়েছে এই যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাहर করে দেখি তবে দেখতে পাব গড়ে পড়ে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তারা তাকে আভিচ্যুত বলে নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেনি। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট ও এশিয়া থেকে ধাক্কা খেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড় মনের সঙ্গে আর্য সংঘাত ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস রোম পারস্ত তাকে কেবলই নাড়া দিয়েছে। যুরোপীয় সভ্যতায় যে সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীব বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকার বিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম—তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয় - কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁওয়ার প্রথম অবস্থায় ঘূমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করিনে, তখন অধুকেরগটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতে চলতে পারি। পথ নানা ; অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার।

যদি পথের বৈচিত্র্য রক্ষা করি, যদি একই বাধা পথ থাকে, তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না—তাহলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর অগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সংগীতে পৌঁছায়নি। সেই অগ্নেই আজও সংগীত জাগতে দেয়ি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেই অগ্নে সংগীতের বেড়া টলমল করছে। এ কথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জন করেছে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করছে, যে গানে আনন্দ পাচ্ছে সে গান জাদু-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই। কীর্তনে বাড়লে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিস আজ তৈরি হয়ে উঠছে সে আচার-ব্রহ্ম। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করছে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড়ো গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মতো অনেক বিষ হজম করে ফেলে। লোকের ভালো লাগছে, সবাই শুনতে চাচ্ছে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না,—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্খতা ঘুচল, চলতে শুরু করল। প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্লী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চলতে শুরু করেছে—সে বাধন মানছে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখনকার এই গানের গোলমালে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিস্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিন্দুসংগীত বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসংগীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে—সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীষণ করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীব কাঁধা আড়াল করে ঘিরে রাখলে তবেই সত্য টিকে থাকবে, আজকের দিনে সে যত আশ্ফালনই করুক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চল যেতে হবে। কারণ, সত্য হিন্দুর সত্য নয়, পলুভের করে ফোঁটা ফোঁটা পুণির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না! চারদিক থেকে মাদুঘের নাড়া খেলেই সে আপনার স্বস্তিকে প্রকাশ করতে পারে।



## কুপণতা

দেশের কাজে ধারা টাকা সংগ্রহ করিয়া ক্রিয়তেছেন তাঁদের কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, টাকা কেহ সহজে দিতে চাহেন না। এমন কি, ধারের আছে এবং ধারা দেশান্তরাগের আড়ম্বর করিতে ছাড়েন না, তাঁরাও।

ঘটনা তো এই কিন্তু কারণটা কী খুঁজিয়া বাহির করা চাই। রেলগাড়ির পয়লা দোসরা শ্রেণীর কামরার দরজা বাহিরের দিকে টানিয়া খুলিতে গিয়া যে ব্যক্তি হয়রান হইয়াছে তাকে এটা দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, দরজা হয় বাহিরের দিকে খোলে, নয় ভিতরের দিকে। দুই দিকেই সমান খোলে এমন দরজা বিরল।

আমাদের দেশে ধনের দরজাটা বহুকাল হইতে এমন করিয়া বানানো যে, সে ভিতরের দিকের খাড়াতেই খোলে। আজ তাকে বাহিরের দিকে টান দিবার দরকার হইয়াছে কিন্তু দরকারের খাতিরে কলকজা তো একেবারে একদিনেই বদল করা যায় না। সামাজিক মিস্ত্রিটা বুড়ো, কানে কম শোনে, তাকে তাগিদ দিতে গেলেই গরম হইয়া ওঠে।

মানুষের শক্তির মধ্যে একটা বাড়তির ভাগ আছে। সেই শক্তি মানুষের নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। জন্তুর শক্তি পরিমিত বলিয়াই তারা কিছু সৃষ্টি করে না, মানুষের শক্তি পরিমিতের বেশি বলিয়াই তারা সেই বাড়তির ভাগ লইয়া আপনার সম্ভাব্য সৃষ্টি করিতে থাকে।

কোনো একটি দেশের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, সেখানে মানুষ আপন বাড়তি অংশ দিয়া কী সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ জাতির ঐশ্বর্য আপন বসতির জন্য কোন্ ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে?

ইংলণ্ডে দেখিতে পাই সেখানকার মানুষ নিজের প্রয়োজনটুকু সারিয়া বহু যুগ হইতে ব্যয় করিয়া আসিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাভাব্য গড়িয়া তুলিতে এবং তাকে আগাইয়া রাখিতে।

আমাদের দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা খরচ করিয়া আসিতেছি রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য নয়, পরিবারতন্ত্রের জন্য। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্ম এই পরিবারতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছে।

আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়। উমেদারির দুঃখে ও অপমানে আমাদের



তরুণ যুবকদের চোখের গোড়ায় কালি পড়িল, মুখ ক্যাকাশে হইয়া গেল, কিসের জন্ত ? নিজের প্রয়োজনটুকুর জন্ত তো নয়। বাপ মা বৃদ্ধ, ভাইকটিকে পড়াইতে হইবে, ছুটি বোনের বিবাহ বাকি, বিধবা বোন তার মেয়ে লইয়া তাদের বাড়িতেই থাকে, আর আর যত অনাথ অপোগণ্ডের দল আছে অন্য কোথাও তাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করেই না।

এদিকে জীবনযাত্রার চাল বাড়িয়া গেছে, জিনিসপত্রের দাম বেশি, চাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, ব্যবসাবুদ্ধির কোনো চর্চাই হয় নাই। কাঁধের জোর কমিল, বোঝার ভার বাড়িল, এই বোঝা দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। চাপ এত বেশি যে, নিজের ঘাড়ের কথাটা ছাড়া আর কোনো কথায় পুরা মন দিতে পারা যায় না। উল্লবৃষ্টি করি, লাধিকাঁটা খাই, কন্টার পিতার গলায় ছুরি দিই, নিজেকে সকল রকমে হীন করিয়া সংসারের দাবি মেটাই।

রেল ইন্টিমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ ছিল আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙিয়াছে, বিধি ভাঙে নাই।

সমাজের দাবি তখন ফলাও ছিল। সে দাবি যে কেবল পরিবারের বৃহৎ পরিধির দ্বারা প্রকাশ পাইত তাহা নহে—পরিবারের ক্রিয়াকর্মেও তার দাবি কম ছিল না। সেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পালপার্বণ আত্মীয় প্রতিবেশী অনাহুত রবাহুত সকলকে লইয়া। তখন জিনিসপত্র সস্তা, চালচলন সাদা, এই জন্ত ওজন যেখানে কম আয়তন সেখানে বেশি হইলে অসহ্য হইত না।

এদিকে সময় বদলাইয়াছে কিন্তু সমাজের দাবি আজও খাটো হয় নাই। তাই জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রভৃতি সকল রকম পারিবারিক ঘটনাই সমাজের লোকের পক্ষে বিষম দুর্ভাবনার কারণ হইল। এর উপর নিত্যনৈমিত্তিকের নানাপ্রকার বোঝা চাপানোই রহিয়াছে।

এমন উপদেশ দিয়া থাকি পূর্বের মতো সাদাচালে চলিতেই বা দোষ কী ? কিন্তু মানবচরিত্র শুধু উপদেশে চলে না,—এ তো ব্যোমযান নয় যে উপদেশের গ্যাসে তার পেট ভরিয়া দিলেই সে উধাও হইয়া চলিবে। দেশকালের টান বিষম টান। যখন দেশে কালে অসন্তোষের উপাদান অল্প ছিল, তখন সন্তোষ মানুষের সহজ ছিল। আজকাল আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত অনেক বেশি বড়ো হইয়াছে। ঠিক যেন এমন একটা জমিতে আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আমাদের পায়ের জোরের

চেয়ে জমির ঢাল অনেক বেশি,— সেখানে স্থির দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত, অথচ চলিতে গেলে সুস্থভাবে চলার চেয়ে পড়িয়া মরার সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য ছাড়া জুতা থেকে আরম্ভ করিয়া গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত নানা জিনিষে নানা মূর্তিতে আমাদের চোখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, - দেশের ছেলেবুড়ো সকলের মনে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিমূর্তিতে বাড়াইয়া তুলিতেছে। সকলেই আপন সাধ্যমতো সেই আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী আয়োজন করিতেছে। ক্রিয়াকর্ম বা কিছু করি না কেন সেই সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখিয়া করিতে হইবে। লোক ডাকিয়া ধাওয়াইব কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেকার রসনাটা এখন নাই একথা ভুলিবার জো কী!

বিলাতে প্রত্যেক মানুষের উপর এই চাপ নাই। যতক্ষণ বিবাহ না করে ততক্ষণ সে স্বাধীন, বিবাহ করিলেও তার তার আমাদের চেয়ে অনেক কম। কাজেই তার শক্তির উদ্ভূত অংশ অনেকখানি নিজের হাতে থাকে। সেটা অনেকে নিজের ভোগে লাগায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যে-হেতুক মানুষ এই জন্ত সে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিঃশেষ করিতে পারে না। পরের জন্ত খরচ করা তার ধর্ম। নিজের বাড়তি শক্তি যে অন্যকে না দেয়, সেই শক্তি দিয়া সে নিজেকে নষ্ট করে, সে পেটুকের মতো আহা-র দ্বারাই আপনাকে সংহার করে। এমনতরো আত্মঘাতকগুলো পরমাল হইয়া বাকি ধরা থাকে তাদের লইয়াই সমাজ। বিলাতে সেই সমাজে সাধারণের দায় বহন করে, আমাদের দেশে পরিবারের দায়।

এদিকে নূতন শিক্ষার আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিতেছে যেটা একালের জিনিস। লোকহিতের ক্ষেত্রে আমাদের মনের কাছে আজ দূরব্যাপী—দেশবোধ বলিয়া একটা বড়ো রকমের বোধ আমাদের মনে জাগিয়াছে। কাজেই বন্ধা কিংবা দুর্ভিক্ষে লোকসাধারণ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন খালিহাতে তাকে বিদায় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কুল রাখাই আমাদের বরাবরের অভ্যাস, জাম রাখিতে গেলে বাধে। নিজের সংসারের জন্ত টাকা আনা, টাকা জমানো, টাকা খরচ করা আমাদের মজাগত; সেটাকে বজায় রাখিয়া বাহিরের বড়ো দাবিকে মানা দুঃসাধ্য। মোমবাতির দুই মুখেই লিখা জালানো চলে না। বাছুর যে গাভীর দুধ পেট ভরিয়া থাইয়া বসে সে গাভী গোয়ালার ভাঁড় ভরতি করিতে পারে না;—বিশেষত তার চরিয়া খাবার মাঠ যদি প্রায় লোপ পাইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে আমাদের ঐশ্ব্যের দৃষ্টান্ত বড়ো হইয়াছে। তার কল হইয়াছে জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সম্বলে ভদ্রতারক্ষা করিবার শক্তি অল্পলোকের আছে, অনেকে

ভিক্ষা করে, অনেকে ধার করে, হাতে কিছু জমাইতে পারে এমন হাত তো প্রায় দেখি না। এই জম্ম এখনকার কালের ভোগের আদর্শ আমাদের পক্ষে দুঃখভোগের আদর্শ।

ঠিক এই কারণেই নূতনকালের ত্যাগের আদর্শটা আমাদের শক্তিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেছে। কেননা, আমাদের ব্যবস্থাটা পারিবারিক, আমাদের আদর্শটা সার্বজনীন। ক্রমাগতই ধার করিয়া ভিক্ষা করিয়া এই আদর্শটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যেটাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছি সেটাকে ভালো করিয়া পালন করিতে অক্ষম হওয়াই চারিত্রনৈতিক হিসাবে দেউলে হওয়া। তাই, ভোগের দিক দিয়া যেমন আমাদের দেউলে অবস্থা ত্যাগের দিক দিয়াও তাই। এই জম্মই চাঁদা তুলিতে, বড়োলোকের শ্রুতি রক্ষা করিতে, বড়ো ব্যবসা খুলিতে, লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে গিয়া নিজেকে দিক্কার দিতেছি ও বাহিরের লোকের কাছে নিন্দা সহিতেছি।

আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে কষ্ট নাই। এই জম্মই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবারবৃত্তিকে লোকবলবৃত্তি বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু এমনজরো বৃহৎ পরিবারকে একত্র করিতে হইলে তাহার বিধিবিধানের বাধন পাকা হওয়া চাই, এবং কর্তাকে নির্বিচারে না মানিয়া চলিলে চলে না। এই কারণে এমন সমাজে জন্মিবামাত্র বাধা নিয়মে জড়িত হইতে হয়। দানধ্যান পুণ্যকর্ম প্রভৃতি সমস্তই নিয়মে বদ্ধ; যারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিবে তাদের মধ্যে যাতে কর্তব্যের আদর্শের বিরোধ না ঘটে, অর্থাৎ নিজে চিন্তা না করিয়া যাতে একজন ঠিক অম্মজনের মতোই চোখ বুজিয়া চলিতে পারে সেই ভাবের যত বিধিবিধান।

প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম, যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃত্তি করে না, ভারবৃত্তিই করে। চাষের উপলক্ষ্যে মানুষকে যেখানে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে হয় সেইখানেই মানুষের ঘনিষ্ঠতার সখ্য চারিদিকে অনেক ভালপালা ছড়াইবার জায়গা এবং সময় পায়। যারা লুণ্ঠপাট করে, পণ্ড চরাইয়া বেড়ায়, দূর-দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাধা-নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে না; তারা নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত করে। এই চিরকালের অভ্যাস ইহাদের রক্তমজ্জার মধ্যে আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যত কম খর্ব হয় ইহারা কেবলই তার চেষ্টা করিতে থাকে। রাজা থাক কিন্তু কিসে রাজার ভার না থাকে এই ইহাদের সাধনা, ধন আছে



কিন্তু কিসে তাহা দরিদ্রের বুকের উপর চাপিয়া না বসে এই উপস্থায় তারা আজও নিবৃত্ত হয় নাই।

এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আরও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। সেখানে যদি কোনো জাতি দেশহিত বা লোকহিত ব্রত গ্রহণ করে তবে তার বাধা নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ আপনাদের ইতিহাসকে আপনাদের শক্তিতেই গড়িয়া তুলিতেছে, বাহিরের ঠেলা বা বিধাতার মারকে তারা শিরোধার্য করিয়া লইতেছে না। পুঁথি তাহাদের বুদ্ধিকে চাপা দিবার যত চেষ্টা করে তারা ততই তাহা কাটিয়া বাহির হইতে চায়। জ্ঞান ধর্ম ও শক্তিকে কেবলই স্বাধীন অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী করিবার প্রয়াসই তাদের ইতিহাস।

আর পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাধনের পর বাধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যতবারই মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় ততবারই নূতন শৃঙ্খলকে সৃষ্টি করা বা পুরাতন শৃঙ্খলকে আঁটিয়া দেওয়াই তার জাতীয় সাধনা। আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। নীতিধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কৃত্রিম ও সংকীর্ণ বাধন কাটিবার জন্ত যেই একবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠি অমনি আমাদের অভিভাবক আমাদের বাপ-দাদার আকিমের কোঁটা হইতে আকিমের বড়ি বাহির করিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দেয়, তার পরে আবার সনাতন স্বপ্নের পালা।

যাই হ'ক, ঘরের মধ্যে বাধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র বাধন-দেবতার পূজা যথাসর্বস্ব দিয়া জোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলই নয়বলি দিয়া আসিতেছি। এমন অবস্থায় দেশহিত সম্বন্ধে আমাদের কুপণতাকে পশ্চিম দেশের আদর্শ অঙ্গুসারে বিচার করিবার সময় আসে নাই। সর্বদেশের সঙ্গে অবাধ যোগবশত দেশে একটা আর্থিক পরিবর্তন ঘটতেছে এবং সেই যোগবশতই আমাদের আইডিয়ালেরও পরিবর্তন ঘটতেছে। যতদিন পর্যন্ত এই পরিবর্তন পরিণতি লাভ করিয়া সমস্ত সমাজকে আপন মাপে গড়িয়া না লয় ততদিন দোটারায় পড়িয়া পদে পদে আমাদের নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে হইবে। ততদিন এমন কথা প্রায়ই শুনিতে হইবে, আমরা মুখে বলি এক, কাজে করি আর, আমাদের যতকিছু ত্যাগ সে কেবল বক্তৃতায় বচনত্যাগ। কিন্তু আমরা যে স্বভাবতই ত্যাগে কুপণ এত বড়ো কলঙ্ক আমাদের প্রতি আরোপ করিবার বেলায় এই কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এই বৃহৎ দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রায় প্রত্যাহ যে ছঃসহ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে জগতে কোথাও তার তুলনা নাই।

নূতন আদর্শ লইয়া আমরা যে কী পর্যন্ত টানাটানিতে পড়িয়াছি তার একটা প্রমাণ



এই যে, আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সম্যাসী হইতে বলিতেছেন। গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে, হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্তমান কালের আদর্শ আমাদের যে-সব যুবকদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে তারা দেখিতে পাই সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দারিদ্র্যবন্ধন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

এমন করিয়া যারা মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে চলিয়াছে কোন্ পথে? তারা দুঃখের সমুদ্রকে ক্রটিং কাগজ দিয়া শুবিয়া লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল “সেবা” কথাটাকে খুব বড়ো অঙ্করে লিখিতেছি ও সেবকের তকমাটাকে খুব উজ্জ্বল করিয়া গিলটি করিলাম।

কিন্তু ফুটা কলস ক্রমাগতই কত ভরতি করিব? কেবলমাত্র সেবা করিয়া টাকা দিয়া দেশের দুঃখ দূর হইবে কেমন করিয়া? দেশে বর্তমান দারিদ্র্যের মূল কোথায়, কোথায় এমন ছিদ্র যেখান দিয়া সমস্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায় সেই নিরুত্তমের বিষ যাতে আমরা কোনোমতেই আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিতে উৎসাহ পাই না সেটা ভাবিয়া দেখা এবং সেইখানে প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।

অনেকে মনে করেন দারিদ্র্য জিনিসটা কোনো একটা ব্যবস্থার দোষে বা অভাবে ঘটে। কেহ বলেন ঘোঁষ কারবার চলিলে দেশে টাকা আপনিই গড়াইয়া আসিবে, কেহ বলেন ব্যবসায়ে সমবায়-প্রণালীই দেশে দুঃখ-নিবারণের একমাত্র উপায়। যেন এই রকমের কোনো-না-কোনো একটা প্যাচা আছে যা লক্ষীকে আপনিই উড়াইয়া আনে।

যুরোপে আমাদের নজির আছে। সেখানে ধনী কেমন করিয়া ধনী হইল, নির্ধন কেমন করিয়া নির্ধনতার সঙ্গে দল বাঁধিয়া লড়াই করিতেছে সে আমরা জানি। সেই উপায়গুলিই যে আমাদেরও উপায় এই কথাটা সহজেই মনে আসে।

কিন্তু আসল কথাটাই আমরা ভুলি। ঐশ্বর্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে। হাতটা যদি তৈরি হয় তবে হাতিয়ারটা জোগানো শক্ত হয় না। যারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া মিলিতে পারে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যেও মেলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনের কাজেও মেলে। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে ভাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে, যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না, কতকগুলো নিয়মকে চোখ বুজিয়া মানিয়া বাইতে হয় তারা কোনোদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনার মিলিতে পারে না। যেখানে

তাদের বাপদাদার শাসন নাই সেখানে তারা কেবলই কুল করে, অঙ্কার করে, বিবাদ করে,—সেখানে তাদের ঈর্ষা, তাদের লোভ, তাদের অবিবেচনা। তাদের নিষ্ঠা পিতামহের প্রতি ; উদ্দেশ্যের প্রতি নয়। কেননা চিরদিন যারা মুক্ত তারা উদ্দেশ্যকে মানে, যারা মুক্ত নয় তারা অজ্ঞাসকে মানে।

এই কারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড়ো রকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া উঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব। আমরা নদীতে গ্রামের ঘাটে ঘাটে যে নৌকা বাহিয়া এতদিন আরামে কাটাইয়া দিলাম, এখন সেই নৌকা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আজ এই নৌকাটাই আমাদের পরম বিপদ।

নৌকাটা যেখানে ঢেউয়ের ঘায়ে সর্বদাই টলমল করিতেছে সেখানে আমাদের স্বভাবের ভীকতা ঘুচিবে কেমন করিয়া? প্রতি কথায় প্রতি হাওয়ার যে আমাদের বুক ছুরছুর করিয়া ওঠে। আমরা নূতন নূতন পথে নূতন নূতন পরীক্ষায় চলিব কোন্ ভরসায়?

সকলের চেয়ে সর্বনাশ এই যে, এই বহুযুগসঞ্চিত ভীকতা আমাদের মুক্তভাবে চিন্তা করিতে দিতেছে না। এই কথাই বলিতেছে তোমাদের বাপদাদা চিন্তা করেন নাই, মানিয়া চলিয়াছেন, দোহাই তোমাদের, তোমরাও চিন্তা করিয়ো না, মানিয়া চলো।

তারপরে সেই মানিয়া চলিতে চলিতে দুঃখে দারিদ্র্যে অজ্ঞানে অস্বাস্থ্যে যখন ঘর বোঝাই হইয়া উঠিল তখন সেবানীতি প্রচার কর আর চাঁদার খাতাই বাহির কর মরণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।

১৩২২

## আঘাত

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসংকর দেখা দেয়—জ্যেষ্ঠের পিঙ্গল অটা শ্রাবণের মেঘলুপে নীল হইয়া উঠে, কাঙ্ক্ষনের শ্রামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় ঢালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্মরাজ্যে এ সমস্ত বিপর্যয় টেকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জজ্ঞাল য়ারিয়া উপশ্রায় আশ্রয় জালিয়া সে নিষ্কৃতিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী মন্ত্র জপ করিতে

করিতে কখনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন স্তম্ভে গাছের পাতা নড়ে না ; আবার যখন সে ক্ষণ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে । ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত কলাহার ।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না । তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয় । অল্পে তাহার সন্তোষ নাই । দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ । লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্চক্রবর্তী হইয়া বসে । তমালতালী-বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তুণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না । এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংবাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্রামল চম্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্ধু পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যানগিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে ।

আর শীতটা বৈশ্ব । তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই ঘব ছোলার প্রচুর আখ্যাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ । প্রান্তণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোকর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে ; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত ।

এই তিনটেই প্রধান বর্গ । আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত । একজন শীতের, আর একজন গ্রীষ্মের তলপি বহিয়া আনে । মাহুঘের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাত । প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেখানেই সৌন্দর্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব । তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই । তাই তো শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কলকা বসন্তের স্নগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা । ইহারা যে-পাছুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রং-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটদার ; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই ।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল । লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে । ওটা নেহাত জোড় মিলাইবার অস্ত । তাহারা জানে না বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার । ৩৬৫ দিনকে দুই দিয়া ভাগ করো—৩৬ পৰ্বন্ত বেশ মেলে কিন্তু



সব-শেষের ওই ছোটো পাঁচ-টি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল ধামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যত রকম সংগীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে,—সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না ;—সেই তো নৃত্যপরা উর্বশীর নুপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয় সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্বকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ওই বৈশ্ব। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সংবৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ওইখানে। কসলের গোপন আরোহণ সকল-ঋতুতেই কিন্তু কসলের প্রকাশ হয় ওই সময়েই। এই জন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্ধক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সকলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভার পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সজ্জিত হয়।

শরৎ হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে ধাকে-ধাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহনীর জিনিস একটা হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই সুখ। একখানা নোট কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দি তোড়ায় ষথার্থ মনের তৃপ্তি। এই জন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের কসলের ভাগুর, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল ; ওইখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল,—বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ওইখানে তাহার কলের ভাগুর, বনভোজনের ব্যবস্থা। ঋতুনে বোল ধরিল, জ্যেষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে জ্ঞান গ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদ গ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না ;—গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারই সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে ঋতু করিয়া দেখে নাই ; কেননা বর্ষা-ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার



সঙ্গে কোনোদিক দিয়া ছাড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দক্ষিণের উপর সমস্ত বছরের কল-কসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে ঘাটে পড়ে পড়ে সে আপনার বদান্ততা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মাহুষ কলাকাজ্ঞা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান কল তাহা গ্রীষ্মেরই কলাহার ভাণ্ডারের উদ্ভূত।

এই জন্ম বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার নাই; কলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে;—কর্ম হইতে ছুটি, কল হইতে ছুটি।

বর্ষা ঋতুটাতে কলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূল। এই জন্ম বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্ম কাজ-কর্মের আপিসে বা লাভ লোকসানের বাজারে সে আপনার পালকির বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দা-নশিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না। বাদলার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আঘাতে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্য হইতে কৈলাস পর্যন্ত অন্বেষণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী বিরহিণীর পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবি লইয়া সম্মুখে আসে। এদিক ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চূপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে ধামাইয়া রাখে কে?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পার্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবি। সরকারি হিসাবপরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামখা এত বড়ো আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না—এই শব্দহীন ঋতুটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণো প্রাস্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোটা হইতে পাতার ডগা

পর্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের অস্ত্র কাহারও কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য এই যে, এই নিপ্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই অস্ত্র কলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু কলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর ভিড় জমায়; বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবি করে; সেই অস্ত্র ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভায়ে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাধা ঘাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিপ্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সংগীতে তাহার সমারোহে, তাহার অঙ্ককারে তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাকল্যে তাহার গাঙ্গার্ষে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় টাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষার ছিল ছুটি—কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া কিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভিযর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই অস্ত্র কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব—কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তের অস্ত্র আছে বসন্ত আর বাহার—আর বর্ষার অস্ত্র মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরও বিশ্বর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে হেমন্তে ভরা-মাঠ ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অস্ত্র নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন? তাহার প্রধান কারণ, ওই ঋতুতে বাস্তব বাস্তব হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সংগীত মুজুরা দিতে আসে না—যেখানে অধঃ অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিস নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তু-পিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত জীবন্য ওই বায়ু-মণ্ডলে। ওইখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারি, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞ লোকের অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধুলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ওই শূন্যে,—যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল আকাশের বায়ু-মণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাধি বাধিতে আসে; সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্নততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাধিতে চায় - তাহারা মাটিকে যান্ত্র করে বটে কিন্তু বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সংখ্যাত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না—কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ওই ভাষাতে মানুষের প্রকাশ; সেই জন্যে উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত,—স্বর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ু-মণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় শুদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই সমস্ত অবকাশওয়াল কথ্য লইয়া অবকাশ-বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ু-মণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রং ফলাইবার সুযোগ—এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গিতে হিলোলিত হয়।

এই সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার; এই জন্য অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার



গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারিদিকে অবকাশ চাই। এই ক্ষুদ্র হৃদয় অবকাশ দাবি করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে আবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেকদিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তুঅংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ—পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরেজিতে যতিকে বলে pause—কিন্তু pause শব্দে অভাব সূচনা করে, যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ওই যতির মধ্যে—কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে ধামে সেইখানেই তাহার ইশারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনার কেবলই যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। গুনিয়াছি অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখা, বস্তুগুলিই গোণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রাস্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির, পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ-সাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদমহাসমুদ্রের মধ্যে মাহুঘ ভাসিতেছে বলিয়াই মাহুঘের শক্তি, মাহুঘের জ্ঞান, মাহুঘের প্রেম, মাহুঘের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা যত্ন।

যত্ন! আর কিছু নহে বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই যত্ন। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তু-বাদীরা মনে করে অবকাশটা নিষ্ফল কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিষ্ফল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ



নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যাহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রক্তবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মনাক্রান্তাচ্ছন্দের অগ্নান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-সোকেরা “আষাঢ়ে” বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে যে মেঘাবগুষ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর মাসটি সকল কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে কথার পণ্য। অন্যান্য মনে করে না। সকল কাজের-বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবধনশ্রাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এস এস জগতের যত অকর্মণ্য, এস এস ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ওই বাজিল, এস সমস্ত খাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহবেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এস গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্রুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্প-সুগন্ধি বনাস্থ হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা!

১৩২১

## শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রোট। তার ঘোবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ওদিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে; এখনও সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, “তোমার ওই শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলিকে কেমন যেন আজ কুতের মতো দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ওই কুজবনের ডাঙা হাট, তোমার ওই ভিজা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির

হওয়া ! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষয় বাসবশত্যা তুমি রচিয়াছ । যা-কিছু মিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গন্তব্য শোচনা তুমি তারই অধিদেবতা ।”

কিন্তু এ শব্দ আমাদের শব্দ একেবারেই নয়, আমাদের শব্দের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া ঘোঁষনের চোখের অলে ভিজিয়া ওঠে নাই । আমার কাছে আমাদের শব্দ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে । সে একেবারে নবীন । বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে ।

তার কাঁচা দেহখানি ; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচিগায়ের গন্ধের মতো । আকাশে আলোকে গাছেপালার যা-কিছু রং দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রং, একেবারে তাজা ।

প্রাণের একটি রং আছে । তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হলদে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রং নয় ; তা কোমলতার রং । সেই রং দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে । জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রং ভালো করিয়া ছুটিয়া ওঠে নাই সেই লজ্জার প্রকৃতি তাকে রং-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে । মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চূষন করিতেছে ।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল । প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা । সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরও-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রংই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রং থাকে না ।

শব্দের রংটি প্রাণের রং । অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম । রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা । এইজন্য শব্দে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষার নাড়া দেয় আমাদের ভিতরমহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের ঘোঁষনকে ।

বলিতেছিলাম শব্দের মধ্যে শিশুর ভাব । তার, এই-হাসি, এই-কান্না । সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পারের দাগটুকু পড়ে না, জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই ছুরঙ্গপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না ।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে । প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই ; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসি-কান্নার ভার কম । হৃদয় জিনিসটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,—

তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে বরাইরা ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই বলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্বাস নাই। কিন্তু এই বরাইরা উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলার ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে কিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই-গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে, বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে তখন সভায় আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্তই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ কসলখেতের ঋতু। এই কসলের খেত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জন্ত আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই ছুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়।। সূর্যের আলো ইহাদের জন্ত যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডুষ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়—বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্ন-পানের বাধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই সব ছোটোদের এই সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রাঙ্গণটা শূন্য আকাশের নিচে হা হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবি দাওয়ার বলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ তুমি শিশিরাঙ্ক ফেলিতে ফেলিতে গন্ত এবং



আগন্তের কণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছে। যে বর্তমানটুকুর অল্প অতীতের চতুর্দোলা ঘরের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখচুষন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্ডার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীতৃপ্তী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এস বলিয়া,—তাকে তো কিরাইয়া দিবার জো নাই;—হাসির চক্ষকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ওই পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, “বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইন্ধিতে পাতার পর পাতা ধসিতে ধসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!”—তিনি বলিতেছেন, “কান্তনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রস-বাকুলতা তাহা শাস্ত হইয়াছে, জ্যেষ্ঠের মধ্যে তপ্ত-নিখাস-বিস্কৃক যে হৃৎস্পন্দন তাহা শুক হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লগুভগু অরণ্যের গায়েন সভায় তোমার ঝড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেঙ্কলোকের রক্তবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারই মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে স্মৃতি হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিক্রপ!”

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাষ্পের ঘোমটার মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধূয়া। সেই ধূয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া কিরিয়া কিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনার আগমনী-গানের আর অঙ্ক নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার কিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া কিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, “তোমার আবির্ভাবই তোমার বিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধূয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।”



କର୍ତ୍ତାର ଇଚ୍ଛାୟ କର୍ମ

# কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

একটু বাদলার ছাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বজা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাঝোড়াটা ছাতার মতোই নিরোধার হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উত্তর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রার যোগ্যতর নয় শিক্তকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীর যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে; তখন পরমাণুতর পৌছিয়াছিল অদূরে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ওদিকে মরিবার কালের নিপড়ার মতো মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগবতরা লুইয়া শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে অ্যাটর্নি তার দিন গনিতেছেন; চীনের মানুষ একরায়ে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাক করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন এক বিপর্যয় লক্ষ্য মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচশ বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সবচেয়ে আমাদের রাস্তার আভিধেরতা যেমন ছিল তেমনই আছে। এখন কন্গ্রেসের ক অক্সেরও পত্তন হয় নাই তখনও এই পথের পথিকবৃন্দের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পদচারি করে

দুধসাগর সীতরি পার হবে ?

আর আজ এখন হোমরুলের পাকা কলটা প্রায় আমাদের গৌকের কাছে ঝুলিয়া পড়িল আজও সেই একই গান—মেঘমলার-রাগেণ, যতিতালভ্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি স্মৃতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আশ্রয়ও ভাবনা করি নাই, সজ্জাই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নিচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাধরতার নিচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও, কণে কণে চমক লাগিল; বর্ষাও নামিয়াছে ট্রামলাইনের মেয়ামতও শুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে স্মৃশাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্রাম-ওরালাদের অন্তর শাস্ত্রে মেয়ামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন কাটার

সহযোগে যখন চিংপুর রোডে জনস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের ধ্বংস দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেকদিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন ?

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গি অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই শহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাতটা এই, আমাদের সময় ওদের সময় না। যদি চৌরঙ্গি রাস্তার পনেরো আনার হিসসা ট্রামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত আজ তবে ট্রাম কোম্পানির দিনে আহা রাস্তাে নিজা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, “সে কী কথা ! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্রামের রাস্তা মেরামত হইবে না ?”

“হইবে বই কি ! কিন্তু এমন আশ্চর্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।”

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, “সে কি সম্ভব ?”

যা হইতেছে তার চেয়ে আরও ভালো হইতে পারে এই ভরসা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সর্বাজে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাতরার মতো সেটাকে দেশের চারদিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোনো কর্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে ; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাঁচ নয় ; তাই সে একটুখানি আরগাতেই ঘুরিতে লাগিল। ওই মাথা ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমত্যা মায়ের গর্তেই বাহ্যে প্রবেশ করিবার বিজ্ঞা শিখিল, বাহির হইবার বিজ্ঞা শিখিল না, তাই সে সর্বাজে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বীধা-পড়িবার বিজ্ঞাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিজ্ঞাটা নয় ; তার পর জন্ম-মাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাকেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যাস যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মানুষের অধিকার। নানা মন্ত্বে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আটপেঁপেটে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিণীত অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গান্ধীর্ষের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, “তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।”

আর যাই হ'ক, মনু-পরামর্শের এই আওরাজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেশুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ শ্রবের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নিভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরও কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ-কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-ধাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খালখন্ডের মধ্য দিয়া ঢাকা দুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই স্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্তেরা যখন অরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেন্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়ারলণ্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ভার্দানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত গলদের লড়া কর্দ দেওয়া যায়; ভারতবিভাগের কর্দটাও নেহাত ছোটো নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবেয় দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ডেবুসের নির্ধাতন উপলক্ষ্যে ক্রান্তের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্তের যে অস্ত্র প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপূর অক্ষশক্তিই তো হাত দেখা যায়।



এ-সকল সম্বন্ধে আজকের দিনে এ-কথার কারও মনে সন্দেহ মেশানো নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ তুলের মধ্য দিরাই তুলকে কাটার, অজ্ঞানের গর্ভে ঝাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে লিছমোড়া ঝাডিয়া তার মুখে পারসার তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড়ো কথা আমাদের বলিবার আছে,—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দারিদ্রবোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পরীক্ষামাণ্ডে বা ছোটোছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বন্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাতরঙ্গ সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। “ভূমৈব সুখং নায়ে সুখমন্তি।” অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোছাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চঙ্গার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি নাছোড়বান্দা হইয়া কেনো একপুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সেদিক হইতে সে ইন্টার্নড্ হইতে পারে কিন্তু এদিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি, “তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের তুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে বিরোধার্থ করিবার জন্তই আমাদের নতশিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড়ো অপমানের কথা আমরা মানিব না,” তবে চণ্ডী-মণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্তা তখনই সামাজিক ইন্টার্নমেন্ট এর ইকুম জারি করেন। যারা পোলিটিকাল আকানে উড়িবার জন্য পাখা ঝটপট করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-ছটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বায়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আরম্ভ করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিন্তাপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গির তফাৎ। চিন্তাপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই

উপরওয়ালার হাতে । তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিত হইয়া রছিল । চৌরঙ্গি বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ-যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত ছটোই থাকিত না । উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গি এই কথা মানে বলিয়াই অগত্যা হাত করিয়াছে, আর চিতপুর তাহা মানে না বলিয়াই অগত্যা হাতছাড়া করিয়া ছুই চক্ষুর তারা উলটাইয়া শিবনেত্র হইয়া রছিল ।

আমাদের ধরপড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয় । চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে । নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিসাধ সম্বন্ধিসাধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত । ব্যক্তিবিশেষের সকলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে যুরোপের এতবড়ো শক্তি ।

আমরা কিন্তু ছুই হাত উলটাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্তার ইচ্ছা কর্ম । সেই কর্তাটিকে—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিশের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্বতন্ত্র, বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণয়ার, শনি মঙ্গল রাহু কেতু—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই ।

কালেন্দি পাঠক বলিবেন—আমরা তো এ-সব মানি না । আমরা তো বসন্তের টিকা লই ; ওলাউঠা হইলে ঘুনের জলের পিচকিরি লইবার আয়োজন করি ; এমন কি, যশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজও আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্ত কীট বলিয়াই গণ্য করি ; - এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি ।

মুখে কোন্টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ওই মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত । এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর । অথও বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অথও বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনার বৃদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া যসি । ভয় কেবলই বলে, কী জানি, কাজ কী । ভয় জিনিসটাই এই রকম । আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যাশাসনের কোনো একটা ছিন্ন দিয়া ভয় চুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্মকেই তুলিয়া ধায়—যে কেবল আইন তাহের শক্তির দ্বারা নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে । তখন স্তায় স্বাকার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেক্ষিত স্বাকাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে—এবং বিধাতার উপর

টেঁকা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গানের জোরে আঙামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেই তো বিশ্ব-বিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিংবা ছোটো লোভ, কিংবা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোটো চাতুরী। আমরাও অল্পভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্মটাকে বিসর্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাস করি, “কর্তার ইচ্ছা কর্ম” এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দেশের কাজের পস্তুন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দেশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলই ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে দেশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হাঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক-হাত ঘেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কী গুণ কুটিরই বা কী, স্নেহের তৈরি মদেরই বা কী আর স্নেহের ছোয়া জলেরই বা কী, কর্তার ইচ্ছার উপর বরাত দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মতো সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানি-পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বালতিতে লইয়া কিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি মিঞা ফিলটার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা তো তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা তো কর্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিধিসংকার নয়, অস্ত্যেষ্টিসংকার পর্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর অবরদণ্ডি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়াছোওয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সংকোচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রাহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে। চাঁদ সন্ধ্যার মনের আদর্শ মহৎ তাই যে-দেবতাকে নিকট বলিয়া কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদূরে তারই শক্তির কাছে তাকে হার মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ক্রিয়ধর্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র বড়ই



যথেষ্টাচারী ততই সে ভয়ংকর, ততই তার কাছে নতিস্বত্তি। বিশ্বকর্তৃত্বের এই ধারণার সঙ্গে ভখনকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যোগ ছিল। কবিকল্পণের ভূমিকাতেই তার ধবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, জোর ধার মূলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুঘাঘ এবং অবশেষে পলায়ন। দেবচরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যথাতথ্যাতোইর্ধান ব্যদধ্যৎ শাস্তীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ্য, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে-বিধান শাস্ত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জ্ঞান বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেলায় নয়। সুতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ্য বিধানকে যথাতথ্যরূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে যুরোপের মনে এতবড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে, ম্যালেরিয়াকে বিদার করিবই, কোনো রোগকেই টিকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিজ্ঞাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিজ্ঞান। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এতবড়ো সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কী পরমার্শ্ব ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে যুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিজ্ঞাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতার লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ ক্ষমতিকে বিশ্বক্ষমতার সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়।



তার ফলে এদেশে বিস্তার সঙ্গে অবিচার একটা আপস হইয়া গেছে ; বিষয়বিশিষ্টগণের মতো উভয়ের মঙ্গল-বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই পর্বে কর্ণে আচারে বিচারে যত সংকীর্ণতা যত স্থূলতা যত যুটতাই থাক উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, “যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে,” অমনি সংসারী ভক্তিতে গুলিয়া তার ভিক্ষার কুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, “যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তকাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবানাপিত বন্ধ,” আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথার পায়ের ধুলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, “বাবা কাচিয়া থাকো।” এইজন্যই এদেশে কর্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার।

যুরোপে ঠিক ইহার উলটা। যুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে কোনো খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয় -- তাহার বিকাশ তত্ত্বমন্ত্রের কুরাশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম যেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে বাধা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে-যুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি যে, ভারতের শাসনভঙ্গের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন হ'ক - উপর হইতে যেমন-খুলি নিয়ম হানিদে আর আমরা বিনা খুলিতে সে-নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোকা হইয়া ওঠে, ওটাকে এমন একটা চাকাওয়াল ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হ'ক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনার আমরা যে

যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্মে—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্তাভাষা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্তত একটা কাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে, এটাও শুভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে-আত্মাভিমান আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে-আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের বলির পাঠার মতো বাধিতে চায় তাকে বলি ধিক! এই আত্মাভিमानে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ইঁাকিয়া বলিতেছি, “ধবরদার, ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে এমন কি ব্যক্তি-গত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না”—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ আগিবে আর এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়কড় করিয়া বলিয়া উঠিল, “ওপড়াও ওই বেতবনটাকে।” ভুলিয়া গেছে বেতবনটা গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই বাঁশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই। অপরাধটা এই যে সভ্যের জায়গায় আমরা কর্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরভ্রান্ত্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো খোপে-ঝাড়ে বেতবন আমাদের জন্ত অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন এক সময়ে যুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেধানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লড়াই করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের স্বৈরাচারত্ব ইংরেজের পক্ষে একটা বড়ো সুযোগ ছিল। কেননা যুরোপীয় ধর্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলণ্ডে আজও তার কোনো চিহ্ন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু বড়োঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। একসময়ে যাদের কাছে সে নখ-নাড়া দিয়াছে, জায়ে অন্তায়ে আজ তাদেরই মন জোঁগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোশের জন্ত সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্বদিকের মতো বুড়িকে হস্তায় হস্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্ত করে না। এই গৃহিণীর দায়বোধ যদি পূর্বের মতো থাকিত তবে ছেলেমেয়েদের কারও আজ টুংগ করিবার জো থাকিত না।

ইংলণ্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে কিন্তু স্পেন এখনও সম্পূর্ণ কাটার নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে আঘাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বুড়ি বসিয়া ছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দম্বেই সে এতটা দৌড় দিল তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কী। তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেকদিন আগেই সেদিন স্পেনের ইম্পের লক্ষণ দেখা যায় যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সে-দিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাধা তার নৌযুদ্ধ-বিজ্ঞাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জলহাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বাধি নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি, তার কৌলীন্দ্ৰ যেমনি থাক, সে ইংরেজ-যুদ্ধজাহাজের সর্দার হইতে পারিত কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারও অধিকার ছিল না।

আজ যুরোপের ছোটোবড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অঙ্ক কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা নাই—যেমন রাশিয়ার—সেখানকার সমাজ বেওয়ারিস ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার কাঁটাগাছে জঙ্কল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালের পুঁথি পর্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অশ্রায় খাজনা আদায় করে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক কোলার তখন গণ্ডস্তোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হ'ক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ ভিত্তিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অহুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের



পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতত্ত্ব বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খুঁত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ স্বার্থ মানুষ সে যে-ধরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতত্ত্ব বলে, যে মানুষ ভ্রান্ত্রণ সে যতবড়ো অভাজনই হ'ক মাথার পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতত্ত্ব।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতার আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি ধার তিনি কালেজে পাস-করা স্নাতক। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি ধার তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন, “আপনার মুখে পান!” গাড়ি ধার তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান। এ-কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই “সারথি যেই হ'ক মুখের পান ফেলা যায় কেন?” ধর্মবুদ্ধিতে বা কর্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে দেশের মানুষ অন্যায়সে বর্জন করিতে প্রস্তুত সে-দেশের লোক স্বাধীনতার অস্ত্যোষ্টি সংকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ার কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্ত ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেইভাবেই দেখেন একজন আর্টিস্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে, তার বাসযোগ্যতার ধরন নয় না। স্বানধাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশির ভাগ স্ত্রীলোক। স্টীমারের ঘাটে ঘাটে, রেলওয়ের স্টেশনে স্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অস্বর্ধামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানত-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছারার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অস্ত্রায়কে আকাশপরিমাণ উচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্ত মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই স্মরণ। কানা-বুদ্ধি কিংবা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সহ্য ভয়ে সেটা কুদৃষ্ট। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড়ো যে-সম্পদ দিয়াছেন—



ভাগ-স্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবি বাজে খরচ। আজ তারই নিকাশ আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের কর্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়েপুরুষ পুণ্যের সজ্জানে যে-পথ দিয়া গানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই তো ঋণদারে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্য-কামীদের নিষ্ঠা দেখিতে স্তম্ভর কিন্তু ইহার লোকসান সর্বনেশে। যে-অঙ্কতা মানুষকে পুণ্যের জন্ত জলে স্বান করিতে ছোটায় সেই অঙ্কতাই তাকে অজানা মূর্খের সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অঙ্ক নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্কাকল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মৃত নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিত্তা, না আছে চরিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিস্ময়তা ভাবকের চোখে স্তম্ভর কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্ধতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, তবু তো সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিম্বা নিজের জন্ত করিত। সে-কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে কিম্বা নিজের জন্ত খরচ-করাটাকে সে ধর্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অল্পগত দাসের মতো যে কেবল মনিবের জন্তই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বচ্ছায় জায়ধর্মের জন্ত প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এই জন্তই আমাদের পাড়ারগারে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ তাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ার জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ার আশুন লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া ‘হায় হায়’ করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, “নিজের মজুরি দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া নাও আমি তার বাধাইবার খরচা দিব।” তারা ভাবিল, পুণ্য হইবে ওই সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরি জোগাইব

আমরা, এটা ফাঁকি। সে কুরো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাধা নিমজ্ঞ।

এই যে অটল হৃদয়া, এর কারণ,—গ্রামের যা-কিছু পূর্তকার্য তা এ-পৰ্বন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাত হয় বিধাতার 'পরে, নয় কোনো আগন্তকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনও সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-বুড়ি এদের জাতিকূল ধর্মকর্ম ভালোমনা শোওয়াবসা সমস্তই বাহির হইতে বাধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা বুড়ি এদের মনটাকেই আকিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কালেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতত্ত্বের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইহাদের ভারি গর্ব; বলেন, ওটা বড়ো উচ্চ জাতিগা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না; বলেন, ওই কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ; যমলোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাক দিয়া যখন ষাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্ধকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচারবুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, “ওই অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সাম্রাজ্য শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।” অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যাক্তি হয় কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তাই উপর যোলো আনা কৌক। ব্যবহারের গতি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক হইলেই এত দুর্ভয় কানমলা, সমস্ত গুরুপুত্রোচিত তাগাতাবিজ সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতেই চরে অনভ্যাসের বন্ধুটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হ'ক, পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হ'ক বলিয়াই যখন আলীবাদ করা হইল তখন দয়ালু লোক এ-কথাও বলিতে বাধ্য যে, মানুষদের কাঁখে করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও। যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া-মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ

করাই আমাদের গৌরবের কথা হয় তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্ত দল বাধে। কিন্তু দুই বিপরীত কূলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃত্বার্ভের বড়াবটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সঙ্কল্প হয় না।

অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত দুঃখদারিত্ব, তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বৃকে শেল হানিয়াছে, এ-কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারি বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগজামিন পাস করি। এ-কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কংগ্রেস বল, লীগ বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন যুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ-রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশজন ইংরেজ বলিতে পারে, ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভালো, কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশ ইংরেজের কর্তৃকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, “এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হ’ক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ করো।” তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজারজন ইংরেজ রাজসভার মধ্যে বা ধবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে যে, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, “এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হ’ক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ করো।”

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না, এমন একটা কথা জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধর্ম কর্ম শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পছন্দ করিবে তার মমকেও পছন্দ করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা



আপনি শুকাইয়া যায়। শূন্যের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই ঘুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রছিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই, অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্ত বোধ করি মনে মনে আপসোস করেন এবং আশ্বে আশ্বে বিদ্যালয়ের ছোটো-একটা আনন্দরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি,—কিন্তু তবু একথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে কলে সেটা আত্মহত্যার মতোই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের শ্রাঘ্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত—এই আশায় কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহ্য, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্র আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া, আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিম্বা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভার সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মলি সাহেব ভারতসচিব হইলে হয়তো আমাদের সুদিন হইবে, নয়তো আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্র, হয় আমাদের মাটির তলার সুরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে; হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না; এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড়ো সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহংকার সমস্তরই লীলা চলিতেছে; কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্র গোভে লুপ্ত, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা রিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়ো, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়; সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভিত্তি হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ-গবর্ণমেন্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুই পক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্বলতার যোগে চরম দুর্বলতা। অত্যাচার যখনই জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল,



আক্ষণের অধঃপতনের গতিটা তখনই গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্বলের পক্ষে যতবড়ো শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড়ো শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা প্রায়ই বল, পুলিশ তোমাদের 'পরে' অত্যাচার করে, আমিও তা অবিস্থাপন করি না, কিন্তু তোমরা তো তার প্রমাণ দাও না।” বলা বাহুল্য, পুলিশের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি করো, একথা তিনি বলেন না। কিন্তু অগ্নায়ের সঙ্গে লড়াই তো গায়ের জোরে নয়, সে তো তেজের লড়াই, সে তেজ কর্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরস্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য একদল লোকের তো বুকের পাটা খাকা চাই, অগ্নায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিশের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিশের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্নমেন্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালত-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারি স্টীমার, আর গরিব করিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, “বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশঙ্কে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর।” এর পরে আর হাত পা চলে না। প্রেস্টিজ! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ওই তো কর্তা, ওই তো আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ওই তো বেহলাকাব্যের মনসা, গায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে! অতএব—

যা দেবী রাজ্যশাসনে

প্রেস্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্তে নমস্তস্তে

নমস্তস্তৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই তো অবিজ্ঞা, ইহাই তো মায়্যা। যেটা স্থূলচোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য, আমাকে লইয়াই গবর্নমেন্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়ো। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী—সেই বল আমারও বল। ইংরেজ-গবর্নমেন্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীক হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতন্ত্রে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিশ অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেস্টিজ দেবতা নরবলি দাবি করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ-কথার উত্তরে শুনিব “রাষ্ট্রভাষ্যে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিক ভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম-পছা—নয়তো প্রেস অ্যাক্টের মুখ-খাবার নিচে পরম-নিঃশব্দ নরম-পছা।”

“হাঁ, বিপদ আছে বই কি, তবু জানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।”

“কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে কিংবা লোভে জ্বারের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না বিকল্পেই দিবে।”

“এ-কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।”

“কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই প্রশংসা কিংবা পুরস্কারের লোভে ঘোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।”

“একথাও ঠিক। তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।”

“এতটা কি আশা করা যায়?”

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়। গবর্নমেন্টের কাছ হইতেও আমরা বড়ো দাবিই করিব কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরও বড়ো দাবি করিতে হইবে, নহিলে অল্প দাবি টিকিবে না। এ-কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্বল; কিন্তু সকল বড়ো দেশেই প্রত্যেকদিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যারা সকল মানুষের প্রতিনিধি—যারা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যারা সমস্ত বিকল্পতার মধ্যেও মানুষকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্ব প্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় আগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিখ্যাতের সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জ্বারের সঙ্গে বলেন—

“ধর্মমপাস্ত্র ধর্মস্ত জ্বারতে মহতো ভয়াৎ”

অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রভাষ্যে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার—ভীতিকে নয়। ধর্ম আছে, অতএব মরা পর্বস্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে করো ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড়ো কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মজ পড়িয়া মারিয়া-ধরিয়া ভূতের ওয়ার মতো বিষম ঝাড়ঝুড়ি শুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ জাহি জাহি করিতে লাগিল তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব, “দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।” তিনি চোখ ঝাড়াইয়া বলিতে পারেন, “তুমি কে হে। আমি

ডাক্তার যাই করি না তাই ডাক্তারি।” ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাঁকে আমার একথা বলিবার অধিকার আছে “যে ডাক্তারি-তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য।”

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড়ো জোর ওই ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারি-শাস্ত্রে এবং ধর্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আশ্চর্যজনক করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে—কিন্তু তবু আশ্বে আশ্বে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়িতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়ো। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে নিজেকে তার চেয়ে বেশি মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা নয় কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সাব না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়-শ বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্নেন্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলা দেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এত দিন এই জানিতাম, ইংরেজের অধঃ শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্ব-পারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? এ-কথা কি নিশ্চয় জানি না যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অজ্ঞানের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যো বন্ধ; ইংরেজ যুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি-বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো দলিল করিয়া গিলিব,—এ-কথা তাকে কখনোই বলিতে দিব না যে, ভারতবর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া মাছকাটা করিবার জন্তই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্তই পাইয়াছে। যদি সে কপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। যুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিধিদ্ভ



রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্তাদের শ্রবণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুই পক্ষের যোগ না হইলে বিশ্বস্তি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—“জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মন্তু জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।” এ-কথা যামি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালির ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আঙুনে কাংলি চড়ানো হইতে শুরু করিয়া স্টীম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। যুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল জাপানে তাহা লিকড় পুঙ্ক পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম ক্ষততা আর কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে ছু-পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড়ো আশা টিকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দোমাক করিতেছ! কিন্তু যুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে—সে-সব কুংসার কথা খাঁটিতে ইচ্ছা করে না। যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে বীভৎসতা তো থাকিতই, আবার সেই পাপে স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।



তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাভাব্য ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জলিতেছে বলিয়া যে আর-এককোণের বাতি জ্বলাইবার দাবি নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের যে সলতে দিয়াই হ'ক আলো জ্বলাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জ্বলাইয়া উঠিতে পারে নাই—তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গেছে—তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বলাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদের ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিবেদন করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী যজমানকেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়ার নামে যে স্টেশন পর্যন্ত ছুটিয়া যায়—আর গরিবের বেলায় তার ব্যবহার উলটা—এটা তো সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্ধামী যদি লজ্জারূপে অস্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধ রূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উহাদের মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালিকে আমি প্রভা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম কখনোই চিরদিন ধারকরা বার্ষিকের মুখোশ পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আমরা আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যারা স্বজাতির কাছে লাজনা সহিয়াও ইংরেজ ইতিহাসবৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মতো মানুষ চাই যারা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্কার সহিতে প্রস্তুত। যারা বিকলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমের, যে আত্মা অপরাধিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলার মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে কৃত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির বধে চড়িয়া

তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ময় ভিসকে তাঁর উচ্চলগাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জ্ঞান আগমনীর প্রভাত রাগিনী বাজিতেছে। সেই কৃপা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন ধুঁজিতেছেন। ওরে অকাল-জরা-অর্জরিত, আত্ম অবিদ্যাসী ভীক, অসত্যভাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জ্ঞান কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহংকার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহংকার কেবল আপন গৃহ-কোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্ধকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অন্ধের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে স্নান করিল, নবনব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরুক চিরসজ্জানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরা-লোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অন্তর্চিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমায়ি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মৃত্যুতা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এস প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও। আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু—তাকে। আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে। দীন লজ্জিত হউক, দাস লাজ্জিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নিবাসন গ্রহণ করুক।

## গ্রন্থপরিচয়

[ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থ-সংক্রান্ত অগাধ জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মুদ্রিত হইল। পূর্বতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে। ]

### শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তক ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শেষ সপ্তকের ১৫ সংখ্যক কবিতাবলীর সহিত পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীমতী রানী মহলানবিশকে লিখিত ২৬ ও ২৭ সংখ্যক পত্র তুলনীয়; এই কবিতাগুলিকে ঐ চিঠি দুটিরই কাব্যরূপ বলা যাইতে পারে।

পথে ও পথের প্রান্তে, ২৬। তুলনীয় শেষ সপ্তক ১৫।১

আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সে কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোটো ঘর। এই রকম ছোটো ঘর আমি ভালোবাসি, তার কারণ তোমাকে বলি। ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড় বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোটো ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে টেবিল আছে চৌকি আছে; সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত করে রেখে আকাশের লব্ধ ঘরেই মেটাতে চাইনে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে; পূর্ণভাবে বিগতভাবে। দেয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানলার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া; সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে—বেশ লাগছে। চেয়ে দেখি যতদূর দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই আমার ভেতরের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতে দেরি হয় না। জানলার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি, দূর ব'লে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার সুল হস্ত



নিরে তাকে যেন নাগাল পায় না। স্মরণ আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দূর পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তাহলে আমাদের ছুটি নেই, তাহলে সমস্ত অনন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট, তাদের জীবনে নিকট আছে দূর নেই। কেননা স্বার্থ জিনিসটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিস, তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালোবাসে, কেননা, দেয়াল আমারই, আর কারো নয়। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে, যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালোবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায়। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাসি, তাতে এমন মগ্ন হতে পারি। সেই সঙ্গে আজকাল আমার বিশ্বদলের কাজ যোগ দিয়েছে—এরকম কাজে মনের মুক্তি। এ কাজের ক্ষেত্র নিকটের ক্ষেত্র নয়। দেশকালে বহুদূর বিস্তীর্ণ; অব্যবহিত নিজের কাছে থেকে কতদূরে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই; তাই এর জন্ত ত্যাগ করা সহজ, এর জন্তে কাজ করতে ক্লান্তি নেই। সেইজন্ত আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকিনে। আমার চোখের সামনে যেমন এই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এই রকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্তে; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা ইন্টার্নড। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাইনে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাইনে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই—“আমি স্মৃতির পিয়াসী।” বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে কোনো ফল পাব একথা যখনি ভুলি তখনি দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে মুক্তি পাইনে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

পথে ও পথের প্রান্তে ২৭। তুলনার শেষ সপ্তক ১৪।২।৩

অল্প কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখিনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার



ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা বা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে  
 কেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ছোটো বড়ো যে-সব ধরনের জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো  
 যোগ নেই। আমার ছবিও ঐ রকম। বা হয় কোনো একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ  
 দেখতে পাই, চারদিকের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাকে বা না থাকে।  
 আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জোড়াতাড়া চলছেই; কিছু  
 বা ভাব, কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে— তারই সঙ্গে আমার কলমের  
 কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর  
 আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার  
 ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝতে  
 পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের  
 লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে  
 গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত  
 ছাড়াতে পারছিনে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে।  
 তার রহস্যের অস্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা  
 জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা  
 করছেন— আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অস্তহীন। আর কিছু নয়,  
 সূনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সূমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ  
 হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংঘর্ষে সূনির্দিষ্টকে  
 স্পষ্ট করে দেখি— মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম— তা সে যাকেই দেখি না  
 কেন, একটুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটাগাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক।  
 নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি।  
 তাই বলে এ কথা ভুললে চলবে না যে তোমার চা খুব ভালো লেগেছে। ইতি  
 ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

শেষ সপ্তকের অনেকগুলি কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ, বা রূপান্তর বিভিন্ন সাময়িক  
 পত্রে বা পাতুলিপিতে পাওয়া যায়। ত্রিকানাই সামন্ত এই রূপান্তরগুলি সংকলন  
 করিয়া দিয়াছেন। সংযোজন অংশে সেগুলি মুদ্রিত হইল।

এই প্রসঙ্গে শেষ সপ্তকের তেইশ ও চৌত্রিশ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে প্রান্তিক (১৩৪৪)  
 গ্রন্থের পনেরো ও ষোলো সংখ্যক কবিতা ভুলনীয়। কবিতা দুইটি নিচে মুদ্রিত হইল।

প্রান্তিক ১০ ৪ ভুলনীয় শেষ সপ্তক ২৩

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার  
 ছায়ার গ্রহরীবাছে ঘিরে ছিল সূর্যের ছয়ায় ;

অভিভূত আলোকের মুছাভূর স্নান অসম্মানে  
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল । যেন চেয়ে ভূমিপানে  
অবসাদে অবনত ক্ষীণশ্বাস চির প্রাচীনতা  
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,  
ক্লাস্তিভারে আধিপাতা বন্ধপ্রায় ।

শূন্যে হেনকালে  
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া । চন্দনতিলক ভালে  
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন-প্রাক্ষণে ;  
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিকিণী কঙ্কণে  
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা । আজি হেরি চোখে  
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে ।  
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে  
মজ্জবলে এসেছি ভাসিয়া । উজ্জান স্বপ্নের শ্রোতে  
অকস্মাৎ উত্তরিষু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে  
যেন এই মুহূর্তেই । চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে ।  
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি  
অপর যুগের কোনো অজানিত, সত্য গেছে নামি  
সত্তা হতে প্রত্যাহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিশ্বয়  
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়  
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো । এই তো ছুটির কাল,  
সর্ব দেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,  
নগ্ন চিন্তা মগ্ন হল সমস্তের মাঝে । মনে ভাবি,  
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,  
নূতন বাহিরি' এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়  
ঘুচাল সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়  
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রক্তনীর মৌন সুবিপুল  
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল  
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বন-নীলিমায়  
বিস্তারিল রহস্য নিবিড় ।

আজি মুক্তিযজ্ঞ গায়

আমার বন্ধের মাঝে দূরের পথিকচিহ্ন ময়,  
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধুসম ॥

প্রান্তিক ১৬ ॥ তুঙ্গানীর শেষ সপ্তক ৩৪

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ  
কীর্তি-নিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ  
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অস্তহিত বিজয়-নিশান  
বজ্রাঘাতে শুদ্ধ যেন অট্টহাসি ; বিরাট সম্মান  
সাপ্তোজ্ঞে সে ধুলার প্রণত, যে ধুলার পরে মেলে  
সন্ধ্যাবেলা ভিন্দু জীর্ণ কাঁথা, যে ধুলার চিহ্ন কেলে  
প্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে  
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে । দেখিলাম বালুস্তরে  
প্রচ্ছন্ন স্মদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে  
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঙ্কারবর্তবলে  
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,  
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনা-প্রদীপ্ত ভালোবাসা ।  
তবু করি অন্ততব বসি' এই অনিত্যের বুকে  
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরজিছে মোর হৃৎখে স্রুখে ॥

শেষ সপ্তকের সাতাশ-সংখ্যক কবিতার অন্ত একটি রূপ সংযোজন অংশে  
(ষট ভরা, পৃ ১১৫) মুদ্রিত হইয়াছে । পাণ্ডুলিপি হইতে অন্ত একটি পাঠ নিচে মুদ্রিত  
হইল :

আমার এই ছোটো কলস পেতে রাধি  
ঝরনাধারার নিচে ।

সকালবেলার বসে থাকি  
শেওলা-ঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে  
পা ঝুলিয়ে ।

ষট ভরে যায় এক নিমেষে,  
কেনিয়ে ওঠে ছলছলিয়ে,  
ছাপিয়ে পড়ে বারে বারে,

সেই খেলা ওর আমার মনের খেলা ।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা

পাহাড়তলির নীল আকাশে

ঝরঝরানি উছলে ওঠে দিনেরাতে ।

ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার

গাঁয়ের মেয়েরা ।

জলের ধ্বনি যায় পেরিয়ে

বেগুনি রঙের বনের সীমানা

যেখানে ঐ বুনো পাড়ার হাটের মানুষ

ভরাই গ্রামের বাস্তা ছেড়ে

ধীরে ধীরে উঠছে চড়াই পথে,

বলদের পিঠে বোঝাই

শুকনো কাঠের আঁঠি ;

ঝুঝুঝু ঘণ্টা গলায় বাধা ।

প্রথম প্রহর গেল কেটে ।

রাঙা ছিল সকালবেলার

নতুন রোদের রঙ,

উঠল সাদা হয়ে ।

বক উড়ে যায় পেরিয়ে পাহাড়

জলার দিকে ।

বেলা হল, ডাক পড়েছে ঘরে ।

ওরা আমার রাগ করে কয়,

“দেরি করলি কেন ।”

চুপ করে সব শুনি ।

ঘট ভরতে হয় না দেরি,

সবাই জানে,—

উপচে-পড়া জলের কথা

বুঝবে না তো ওরা ।



### শেষ বর্ষণ

শেষ বর্ষণ ১৩৩২ সালে রচিত হয়। ঐ সালের ভাদ্র মাসে ইহা মঞ্চস্থ হওয়া উপলক্ষ্যে ঐ নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে শুধু নাট্যে ব্যবহৃত গান-গুলিই মুদ্রিত হইয়াছিল, কথাবস্তু প্রকাশিত হয় নাই; পরে ঋতু-উৎসব (১৩৩৩) গ্রন্থে কথার ও গানসহ শেষ বর্ষণের সম্পূর্ণ নাট্যরূপটি প্রকাশিত হয়।

### নটীর পূজা

নটীর পূজা ১৩৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

একই আখ্যানবস্তু অবলম্বনে কথার ও কাহিনীর পুজারিনী কবিতাও লিখিত হইয়াছিল।

১৩৩৩ সালে ২৫ বৈশাখ সাংকালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নটীর পূজার প্রথম অভিনয়ের সময় এই নাটকে উপালি-চরিত্র ছিল না, উপালি-চরিত্র সংবলিত সূচনা অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে ছিল না। ১৩৩৩ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ঐ অংশ যোজিত হয়; উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুদ্রিত অভিনয়পত্রীতে সূচনা ও নিম্নোক্ত ভূমিকা প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রীতে নাট্যবিষয়সারও মুদ্রিত আছে। সূচনা অংশ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

### ভূমিকা

অজ্ঞাতশত্রু পিতৃসিংহাসনে লোভ প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া মহারাজ বিধিসার স্বৈচ্ছায় রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নগরী হইতে দূরে বাস করিতেছেন।

একদা রাজ্যেখানে ভগবান বুদ্ধ অশোকতরুচ্ছায়ায় আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন সেইখানে বুদ্ধভক্ত বিধিসার চৈত্য স্থাপন করিয়া রাজকন্ডাদিগকে বেদীমূলে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অর্ঘ্য আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।

রাজমহিষী লোকেশ্বরী তাঁহার স্বামীর রাজ্যত্যাগে ও তাঁহার পুত্র চিত্রের সন্ন্যাসগ্রহণে ক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধ-অঙ্ঘ্র্যাসিত ধর্মের প্রতি বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

### নটরাজ

নটরাজ ঋতুরত্নমালা ১৩৩৩ সালে রচিত ও শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয় এবং ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে

কলিকাতায় ঋতুরঙ্গ নামে ইহা অভিনীত হয়; অভিনয়পত্রী হইতে দেখা যায়, ইহার কবিতাংশ সম্পূর্ণ নূতন। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে ঋতুরঙ্গ মুদ্রিত হয়।

১৩৩৮ সালে প্রকাশিত বনবাণী গ্রন্থে, বিচিত্রায় মুদ্রিত নটরাজ ও মাসিক বসুমতীতে মুদ্রিত ঋতুরঙ্গ একত্রীভূত ও পুনঃসজ্জিত হইয়া নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা নামে সংকলিত হয়। বনবাণীর এই অংশটিই বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। বিচিত্রায় প্রকাশিত নটরাজের শেষ কবিতা “শেষ মধু” এই নূতন পাঠের অন্তর্গত হয় নাই; উক্ত কবিতাটি তৎপূর্বেই মহারার অন্তর্গত হয়।

“কেন পাশ্ব এ চঞ্চলতা” ( পৃ. ২১৫ ) গানটির নিম্নমুদ্রিত পাঠান্তর বিচিত্রায় পাওয়া যায়; গান হিসাবে এই পাঠান্তর সুপ্রচলিত নহে ( গীতবিতান ২য় সং., ২য় খণ্ড পৃ. ১২৩ )।

কেন পাশ্ব এ চঞ্চলতা।

শূন্য গগনে পাও কার বারতা ?

নয়ন অতঙ্গ প্রতীক্ষারত

কেন উদ্ভ্রাস্ত অশাস্ত-মতো,

কুস্তলপুঞ্জ অযত্নে নত

ক্লাস্ত তড়িৎ-বধু তদ্ভাগতা।

ধৈর্য ধরো, সখা, ধৈর্য ধরো,

দুঃখে মাধুরী হোক মধুরতর ;

হেরো গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর

মল্লিকা চরণতলে প্রণতা।

“চরণরেখা তব” ( পৃ. ২২২ ) গানটির বিচিত্রায় মুদ্রিত পূর্বপাঠ প্রকাশিত নিয়ে মুদ্রিত হইল :

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি

চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ?

অশোকরেণুগুলি

রাঙাল যার ধূলি

তারে যে ভূগতলে আজিকে লীন দেখি ?

ফুরায় ফুল কোটা পাখিও গান ভোলে

দধিন বায়ু সেও উদাসী যার চলে।

ভবুও কি ভরি তারে

অমৃত ছিল না রে ?

স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ?

মূলতঃ গানটি বসন্ত-বিদায়ের “বিলাপ”রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল— অভিনয়োপলক্ষ্যে একবার গানটি শরৎ-বিদায়ের “বিলাপ” রূপে পরিবর্তিত হয়। উপরে উদ্ধৃত পাঠটিই গান হিসাবে সুপ্রচলিত ( গীতবিতান ২য় সং, ২য় খণ্ড পৃ. ২৪৭ )।

শেষ বর্ষণের অন্তর্গত “শ্রামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া” ( পৃ ১৩৬ ) গানটিকে, নটরাজের “শ্রাবণ-বিদায়” ( পৃ ২১৪ ) গানটির পাঠান্তর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

“দোল” ( পৃ ২৪৬ ) কবিতাটির গীত-রূপ “ওগো কিশোর আজি” গীতবিতানে ( ২য় সং, ২য় খণ্ড, পৃ ৮২ ) দ্রষ্টব্য।

### গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত আটটি গল্পের প্রথম সাতটি ১৩০০ সালের সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; নিম্নে বিস্তারিত সূচী মুদ্রিত হইল।

সম্পাদক	বৈশাখ ১৩০০
মধ্যবর্তিনী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
অসম্ভব কথা	আষাঢ় ১৩০০
শান্তি	শ্রাবণ ১৩০০
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	ভাদ্র ১৩০০
সমাপ্তি	আশ্বিন কাতিক ১৩০০
সমস্তাপূরণ	অগ্রহায়ণ ১৩০০

খাতা গল্পটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না এখনো জানা যায় নাই। শনিবারের চিঠিতে ( চৈত্র ১৩৪৬ ) প্রকাশিত “রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী”তে লিখিত হইয়াছে, এ গল্পটি সম্ভবত হিতবাদীতে ( ১২৯৮ ) মুদ্রিত হইয়াছিল। হিতবাদী বর্তমানে হুপ্রাপ্য। এই গল্পটি সাময়িকে প্রকাশ অহুসারে সাজানো যায় নাই, গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ অবলম্বনে ( ‘ছোট গল্প’, কাঙ্ক্ষন ১৩০০ ) বর্তমান খণ্ডে উহা মুদ্রিত হইল।

সম্পাদক ও সমস্তাপূরণ ‘ছোট গল্প’ ( কাঙ্ক্ষন ১৩০০ ) পুস্তকে ; অসম্ভব কথা ‘বিচিত্র গল্প’ প্রথম ভাগে ( ১৩০১ ) ; একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প ‘বিচিত্র গল্প’ দ্বিতীয়

ভাগে ( ১৩০১ ) ; এবং, মধ্যবর্তিনী, শান্তি ও সমাপ্তি 'কথা-চতুষ্টয়' ( ১৩০১ ) পুস্তকে প্রথম গ্রন্থাস্তবৃত্ত হয়।

### সঞ্চয়

সঞ্চয় ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিয়ে মুদ্রিত হইল :

রোগীর নববর্ষ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩১২
রূপ ও অরূপ	প্রবাসী পৌষ ১৩১৮
নামকরণ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৩১৮
ধর্মের নবযুগ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; ভারতী কান্তন ১৩১৮
ধর্মের অর্থ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আশ্বিন কার্তিক ১৩১৮
ধর্মশিক্ষা	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাঘ ১৩১৮
ধর্মের অধিকার	প্রবাসী কান্তন ১৩১৮
আমার জগৎ	সংজ্ঞা পত্র আশ্বিন ১৩২১

ধর্মের নবযুগ মাঘোৎসব উপলক্ষে ১১ মাঘ ১৩১৮ মহর্ষি-ভবনে পঠিত হয়।

ধর্মের অর্থ ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে ৪ ভাদ্র ১৩১৮ সাংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হয়।

ধর্মশিক্ষা কলিকাতা সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলনে ২৭ ডিসেম্বর ১৯১১ সাংকালে পঠিত হয়।

ধর্মের অধিকার মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১২ মাঘ ১৩১৮ সাংকালে পঠিত হয়।

নামকরণ রচনার উপলক্ষ্যাদি প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

### পরিচয়

পরিচয় ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিয়ে মুদ্রিত হইল :

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	প্রবাসী বৈশাখ ১৩১২
আত্মপরিচয়	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ ১৩১২
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮



ভগিনী নিবেদিতা	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮
শিক্ষার বাহন	সবুজ পত্র পৌষ ১৩২২
ছবির অঙ্ক	সবুজ পত্র আষাঢ় ১৩২২
সোনার কাঠি	সবুজ পত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
কৃপণতা	সবুজ পত্র ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২
আষাঢ়	সবুজ পত্র আষাঢ় ১৩২১
শরৎ	সবুজ পত্র ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ৪ চৈত্র ১৩১৮ তারিখে ওভারটুন হলে পঠিত হয়। এই প্রবন্ধ পঠিত ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইলে সাময়িক পত্রে নানারূপ আলোচনা হয়; রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :

“ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা”

বিগত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচিত “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্যপূর্ণ ইতিহাসের নানারঙের বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি যাহা এতদিন সহস্র চেষ্টা করিয়াও আলোকাতাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না, এইবার তাহার সে চেষ্টা বাস্তবরূপে সাফল্য লাভ করিবে তাহার অকণোদয় দেখা দিয়াছে; তবে যে, চতুর্দিকে কর্কশ কা কা ধনি হইতেছে—রজনী-প্রভাতের সমসমকালে তাহা হইবারই কথা। এতদিনের ধস্তাধস্তির পরে ভারতে প্রকৃত ইতিহাসের এই যে একটা সম্ভবমতো পাকা রকমের গোড়াপত্তন হইল, ইহা বঙ্গ-সরস্বতীর শুভ সন্তানদিগের কত না আনন্দের বিষয়। গোড়াপত্তন হইয়াছে বেক্সপ স্কুলের, তাহার উপরে তদনুরূপ ভিত গাঁথিয়া তুলিতে হইলে আরো নানাপ্রকার ইষ্টক প্রস্তুত এবং মালমশলার জোগাড় করা আবশ্যিক, তা ছাড়া পুরাতন ইতিহাস-ভারতীয় নূতন দেবালয়ের নির্মাণকার্যে বাছা-বাছা কারিকরদিগের সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যিক। রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রবন্ধটির সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন আপাতত যাহা আমার মনে উদ্ভিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে এই :

মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে কি উত্তর অঞ্চলে ?

রবীন্দ্রনাথের লেখার আভাসে আমার এইরূপ মনে হয় যে, তাঁহার মতে মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে। তিনি যাহা আঁচিয়াছেন তাহা একেবারেই অমূলক

বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, যেহেতু বাস্তবিকই রাক্ষসাদি কুর জাতিদিগের মধ্যে বিষ্ণুর স্তম্ভমূর্তি উপাস্ত দেবতার আদর্শ পদবীতে স্থান পাইবার অমুপযুক্ত। দুর্দান্ত রাক্ষস জাতিদিগের মনোরাজ্যের সিংহাসন শিবের রক্তমূর্তিরই উপযুক্ত অধিষ্ঠান-মঞ্চ। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমরা দেখিতে পাই যে, একদিক যেমন রক্ষঃ আর একদিকে তেমনি যক্ষ। প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল যেমন রক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান ( headquarters ) ছিল— উত্তর অঞ্চল তেমনি যক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আৰ্যদিগের চক্ষে দক্ষিণের দ্রাবিড়াদি জাতিরা যেমন রাক্ষস-বানরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল, উত্তরের মোগলাদি জাতিরা তেমনি যক্ষকিন্নরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল—ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিকটাকার বিষয়ে দক্ষিণের রক্ষ এবং উত্তরের যক্ষের মধ্যে যেমন মিল আছে, কিভূতকিমাকার বিষয়ে তেমনি দক্ষিণের বানর এবং উত্তরের কিন্নরের সঙ্গে মিল আছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যক্ষদিগের রাজধানীতে কুবেরপুরীতে মহাদেবের অধিষ্ঠানের কথা কাব্যপুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাছাড়া কৈলাস-শিখর মহাদেবের প্রধান পীঠস্থান।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পার্শ্বে একটি বিষয়ে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে ; সে-বিষয়টি এই যে, জনক রাজা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে তিনি ভারতে কৃষিকার্য প্রবর্তনের প্রধান নেতা ছিলেন ; আর তাহার গুরু ছিলেন বিশ্বামিত্র। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, হিমালয় প্রদেশের কিরাত জাতিরা ব্যাধবৃন্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত—তাহারা কৃষিকার্যের ধারই ধারিত না। কিরাত জাতি মোগল এবং তাতারদিগের সহোদর জাতি ইহা বলা বাহুল্য। এটাও দেখিতেছি যে, হিমালয়ের উপত্যকায় মহাদেব অর্জুনকে কিরাতবেশে দেখা দিয়াছিলেন। মহাদেব কিরাতদিগের দলে মিশিয়া কিরাত হইয়াছিলেন। মহাদেব পশুহস্তাও বটেন, পশুপতিও বটেন। মহাদেব যে অংশে কিরাতদিগের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুহস্তা ; আর, যে অংশে তিনি বাস মোগলদিগের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুপতি। পুরাকালের মোগল এবং তাতার জাতিরা জীবিকালভের একমাত্র উপায় জানিত পশুপালন, তা বই, কৃষিকার্যের ক অক্ষরও তাহারা জানিত না—ইহা সকলেরই জানা কথা। তবেই হইতেছে যে, মোগল এবং তাতার জাতিরা— সংক্ষেপে যক্ষেরা— একপ্রকার পশুপতির দল ছিল ; সুতরাং পশুপতি মহাদেব বিশিষ্টরূপে তাহাদেরই দেবতা হওয়া উচিত ; আর, পুরাণাদিকে যদি শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হয়, তবে ছিলেনও তিনি তাই। যক্ষরাজ কুবেরের রূপ ছিল অনাৰ্যোচিত ; আর, তিনি

ধনপতি নামে বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতে ধন-শব্দে বিশিষ্টরূপে গোমেষাদি পশুধনই বুঝাইত। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পশুজীবী যোগল তাতার প্রভৃতি জাতিরাই প্রাচীন ভারতের আৰ্যদিগের ইতিহাসে যক্ষনাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি পশুহস্তা কিরাত জাতি, কি পশুপালক যোগল জাতি, উভয়েই কৃষিকার্য বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞ ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ধনুর্ভঙ্গের ব্যাপারটিকে কোন্ প্রকার বিঘ্নভঙ্গ বলিব? কিরাতদিগের পশুঘাতী ধনুর্ভঙ্গ বলিব? না যাক্ষসদিগের বিষদাত ভঙ্গ বলিব? আমার বোধ হয়, প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক যোগ-সেতু বর্তমান ছিল; কেননা লঙ্কাপুরী প্রথমে কুবেরের ছিল, পরে তাহা রাবণ বলপূর্বক হস্তগত করিয়াছিল। রাবণ এবং কুবের যে একই পিতার পুত্রদ্বয় ইহা কাহারো অবিদিত নাই।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আমার বলিবার আছে—সেটাও বিবেচ্য। কথাটি এই :

নেপাল প্রদেশে বুদ্ধমন্দির এবং শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থিতি করে। গুর্খারাও শৈবধর্মাবলম্বী। খুব সম্ভব যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধসাধকেরা হিমালয় প্রদেশে নির্জনে যোগসাধন এবং তপস্কা করিতেন। উমা যেমন উপনিষদের স্ননির্মলা ব্রহ্মবিজ্ঞা, পার্বতী তেমনি তন্ত্রশাস্ত্রের বিভীষিকাময়ী দশমহাবিজ্ঞা। ভক্তের দেবতা যেমন বিষ্ণু, যোগীতপস্বীদিগের দেবতা তেমনি মহাদেব। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধ সাধকেরা বিশিষ্টরূপে যোগীতপস্বী ছিলেন। মহাদেব সেই সকল পর্বতবাসী বৌদ্ধ যোগীতপস্বীদিগের আদর্শ-প্রতিমা—এরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বৌদ্ধধর্ম এবং আৰ্যধর্মের ষাতপ্রতিষাত' নামক পুস্তিকায় এই বিষয়টির সম্বন্ধে আমি যাহা সবিস্তরে লিখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :

পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা আশ্চর্য নূতন প্রণালীতে বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রতিবিধানচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ যোগীতপস্বীদিগকে আৰ্য যোগীতপস্বীদিগের দলে টানিয়া লইলেন, আর, মহাদেবকে সেই সকল অবৈদিক যোগীতপস্বীদিগের ইষ্টদেবতার পদবীতে আসন গ্রহণ করাইলেন। পাছে লোকে মনে করে, যোগীশ্বর মহাদেব বুদ্ধেরই আর এক অবতার—এই আশঙ্কায় পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা তাঁহার গলায় পৈতা দিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের মোট কথাটির সহিত আমার মতের একটুও অনৈক্য নাই। যে দু-একটি কথা আমি উপরে ইঙ্গিত করিলাম তাহার সহিত ভারতের ইতিহাস-ধারার কথাগুলির সমন্বয় মতে প্রবন্ধটির অঙ্গপূরণ করা হইলে ভালো হয়—ইহাই আমার



মনোগত অভিপ্রায়। আমার বিশ্বাস এই যে, এই সমস্তকাৰ্য্যটি রবীন্দ্রনাথ মনে করিলেই ঈশ্বরপ্রসাদে সৰ্বাঙ্গসুন্দররূপে সুনিষ্পন্ন করিতে পারেন।’

আত্মপরিচয় প্রবন্ধ ছাত্রসমাজের অধিবেশনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা তত্ত্বকৌমুদী এই প্রবন্ধে বিবৃত মতের প্রতিবাদ করেন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ব্রাহ্ম প্রবন্ধে তাহার প্রত্যুত্তর দেন।

### হিন্দু ব্রাহ্ম

“আত্মপরিচয়” নামক প্রবন্ধে আমরা এই কথাটি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু, ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু। ইহাতে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন যে, যেহেতু আদি ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক বিষয়ে “উন্নতিশীল” ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছেন “তখন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু কি না, এ কথা বিচার করিবার অধিকার আদি ব্রাহ্মসমাজের কাহারও নাই। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গুণ্ডী অনেককাল অতিক্রম করিয়াছেন।”

পরস্পরের উন্নতির তারতম্যসম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই কহিব না, কারণ ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের পক্ষে যাহা অন্যায় তাহা যে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও অন্যায় অস্তুত এ কথাটা আমাদেরকে কর্তব্যের অনুরোধে বলিতে হইবে।

নিশ্চয়ই আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে। যেমন যেমন তাহা বৃদ্ধিতে পারিব তেমনি তাহার বন্ধন কাটাইয়া উঠিব এইরূপ আশা করি— কিন্তু আমাদের এরূপ সংস্কার আদৌ নাই যে, বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার অধিকার কেবল কোনো বিশেষ উপাধি দ্বারা চিহ্নিত সমাজের লোকেই আছে অন্য সমাজের লোকে নাই। যদিচ আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য তথাপি ঈশ্বর আমার চিন্তা করিবার শক্তি সম্পূর্ণ অপহরণ করেন নাই; এবং কে হিন্দু ও কে হিন্দু নয় ইহা আমার পক্ষে বিচার করিবার অধিকার যদিচ “উন্নতিশীল” সম্পাদক মহাশয় কাড়িয়া লইতে চান তথাপি মনুষ্যত্বের সকল মহৎ অধিকারই আমরা যাহার কাছ হইতে পাইয়াছি তিনি এ সম্বন্ধে আমাদের কাহাকেও কোনো বাধা দিয়াছেন বলিয়া আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশ্বাস করি না।

১. প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১২

২. “আদি সমাজ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ”, তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ বৈশাখ ১৩১২



উপবীতচিহ্নের দ্বারা সমাজে অধিকারভেদ নির্দিষ্ট হয় বলিয়া দ্বাহারা উপবীত-ধারণকে নিন্দা করেন তাঁহারা কি এ কথা চিন্তা করিবেন না যে, অদৃষ্ট উপবীত দৃষ্ট উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ় ? “উন্নতিশীল ব্রাহ্ম” নামের পৈতাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তৎকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় যে জাত্যাভিমান, যে কৌলীন্যগর্ব প্রকাশ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত ?

উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ কেবলমাত্র উন্নতিশীলতার বেগে হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গত্তী অনেক কাল হইল কাটাইয়াছেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে গত্তী আমাদের স্বরচিত ও কৃত্রিম নহে তাহা আমরা কাটাইতে পারি না। যেমন আমার একটা দেহের গত্তী আছে। এই গত্তীকে আশ্রয় করিয়া আমি একটি বিশেষ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি; এই স্বাস্থ্য যদি আমার উন্নতির প্রতিকূল ও আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তবে বিশ্বের সহিত একাকার হইবার চেষ্টায় পঞ্চস্থলাভ ছাড়া আমার অন্য কোনো গতি থাকে না।

গত্তীর পরে গত্তী, চক্রের পরে চক্র কাটিয়া বিধাতা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর গত্তী পৃথিবীর, সূর্যের গত্তী সূর্যের, তুণের গত্তী তুণের, মানুষের গত্তী মানুষের। স্বাভাবিক গত্তীর বিরুদ্ধে লড়াই করাই যে উন্নতিশীলতার লক্ষণ এ কথা মনে করি না।

আবার আমাদের স্বরচিত গত্তীও আছে। কেননা, বিধাতার সৃষ্টিকার্যেও যেমন মানুষের সৃষ্টিকার্যেও তেমনি—গত্তী দিয়া দিয়াই গড়িয়া তুলিতে হয়। মানুষের ঘরবাড়ি একটা গত্তী, তাহার পরিবার একটা গত্তী, তাহার ব্যবসায় একটা গত্তী। প্রত্যেক গত্তীর মধ্যে বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতার দ্বারা মানুষ আপন ঘরে আপন পরিবারে আপন ব্যবসায়ে স্বতন্ত্র। এমন কি সামান্ত ছাতাজুতা ঘটিবাটিও সরকারী নহে, এবং কেহ তাহাকে সরকারী করিবার চেষ্টা করিলেই ধানায় ধবর দিতে হয়।

তাই যদি হইল তবে সর্বজনীনতা বলিয়া একটা পদার্থ কি একেবারেই আকাশ-কুসুম ? যদি সকলপ্রকার গত্তীকে, সকলপ্রকার বিশিষ্টতাকে একেবারে অস্বীকার করাকেই সর্বজনীনতা বলে তবে সর্বজনীনতা বস্তুতই আকাশকুসুম সন্দেহ নাই। তাইকে মানি না কিন্তু ভ্রাতৃত্বকে মানি, এ কথাটাও যেমন তেমনি সর্বজনকে বিশেষ বলিয়া মানি না একটা নির্বিশেষ সর্বজনীনতাকে মানি ইহাও সেইরূপ মাথা-নেই-তার-মাথা-ব্যথা। প্রত্যেকের বিশিষ্টতা আছে বলিয়াই সেই অগণ্য বিশিষ্টতার মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করার সাধনা সর্বজনীনতা—নতুবা তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। বিশিষ্টতাকে স্বীকার করা যে কুসংস্কার এইরূপ সৃষ্টিছাড়া কথাই অন্ধ সংস্কার। অতএব হিন্দুত্বের

সংকীর্ণ গণ্ডী কাটাইয়া যাওয়ারকে উন্নতিশীলতা বা কোনো শীলতাই বলে না, তাহা একটা ব্যর্থব্যাক্য উচ্চারণ মাত্র।

ভূতের বিশ্বাস পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে ;—যখন বলা যায় আমি এই ভূতের বিশ্বাসের কুসংস্কার কাটাইয়াছি তখন এমন কথা বলা হয় না যে আমি মনুষ্যত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছি।

তেমনি হিন্দুসমাজে যে কুসংস্কার প্রচলিত আছে যদি কোনো হিন্দু সে সংস্কার কাটাইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কুসংস্কারহীন হিন্দু বলিব, অহিন্দু বলিব না। কুসংস্কারই হিন্দুর স্থায়ী পরিচয় এমন অদ্বুত কথা কোনোমতেই বলা চলে না। এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে, অন্ধসংস্কার মানুষের সকল জাতির মধ্যেই আছে কিন্তু বিধাতার রাজ্যে অন্ধসংস্কারের স্বভাবই এই যে তাহা নিত্য নহে ; বস্তুত এই জন্মই উন্নতিশীল ইওয়া সম্ভব, এবং এই জন্মই আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ যতই মৃত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হই না তৎসঙ্গেও আমরা উন্নতিশীল, কারণ, আমরাও মানুষ। তাই যদি না হইবে তবে পৃথিবীতে ধর্মসংস্কারকের মতো উন্নত পাগল আর তো কেহই নাই। সত্যমেব জয়তে, এই বাণী বিশ্বচরাচরে কেবল হিন্দুসমাজেই অসত্য, বিশ্ববিধাতা কেবল এই হিন্দুসমাজেই পরাস্ত হইয়া হাল ছাড়িয়াছেন—অসাধারণ উন্নতিলাভ করিলেও এমন কথা বলিতে পারিব না। অতএব হিন্দুসমাজের প্রচলিত ভ্রম ও অন্ধসংস্কার বর্জন করার দ্বারাই যদি আমরা অহিন্দু হই তবে শিশু রাম কথা কহিতে শিখিলেই শ্রাম হইয়া যায় এ কথাটা বলা চলে। তাহাকে বালক রাম বা যুবক রাম বা সুবুদ্ধি রাম বল তাহাতে কোনো বাধা নাই কিন্তু তাহাকে রামই বলিব না এমন পণ করিলে মানুষের নিত্যই নূতন নামকরণ করিয়া চলিতে হয়।

যাঁহারা আমার প্রবন্ধ ভালো করিয়া না পড়িয়াই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের ভাবখানা এই যে, “তুমি আমাকে হিন্দু বলিতেছ তবেই তো বলা হইতেছে আমি পৌত্তলিক, আমি জাতিভেদ মানি আমি ইত্যাদি ইত্যাদি ; তুমি নিজের সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পার, কেননা, তুমি কুসংস্কারাপন্ন, তুমি সাধারণ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নও, তোমার পিতা এমন কাজ করিয়াছেন, তিনি এমন কথা বলিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।”

বস্তুত আমার পিতা যদি অত্যন্ত সংকীর্ণ সংস্কারের অমুদার প্রকৃতির লোক ছিলেন ইহাই প্রকৃত সত্য হয় তবে আমার পিতাকে আমি তো পিতারূপে ত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও বা আমার কোনো একটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহা আমার ইচ্ছার মধ্যেও

উদয় হয় তথাপি তাহা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। আমারই পিতার সন্ধান যে আমি, এ গণ্ডী বিধাতার গণ্ডী। স্মৃতির বিষয় এই যে, এই গণ্ডী স্বীকার করিয়াও আমি সর্বজনীন হইতে পারি, এমন কি, কোনো একদিন হঠাৎ কায়ক্লেশে উন্নতিশীল হইয়া উঠাও আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে। হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যেও বিধাতার সেই বিধান আছে বলিয়াই তাহা নানা পরিণতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনও হইবে,—হিন্দুসমাজের মধ্যেও সেই সত্যস্বরূপ বিধাতার বিধান কাজ করে বলিয়াই এই সমাজেই আজ আমরা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় দেখিলাম। ইহাতেও কি বিধাতার উপরে বিশ্বাস জন্মে না, সত্য বিধানের প্রতি নির্ভর বাড়ে না? হিন্দুসমাজে ভ্রম আছে, অন্ধসংস্কার আছে, সবই আছে মানি কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি করিয়া মানি হিন্দুসমাজেও সত্য আছেন, মঙ্গল আছেন, ব্রহ্ম আছেন। হিন্দুসমাজের মধ্যে আমি সেই সত্যের দিকে মঙ্গলের দিকে ব্রহ্মের দিকে দাঁড়াইব ইহাই যেন আমার সংকল্প হয়। সাধক তাঁহারা তাঁহারা সকল সমাজেই সত্যের দিকেই নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই অভিমুখে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। যেখানে অসত্যের অজ্ঞানের প্রভাব বেশি সেইখানেই সত্যকে তাঁহারা দেখেন ও সত্যকে তাঁহারা দেখান, ইহাই তাঁহাদের ব্রত। দুর্গতির মধ্যে যে সমাজ উপনীত হইয়াছে তাহাকে তাঁহারা ত্যাগ করেন না, কারণ তাঁহাদের এই বিশ্বাস অটল যে দুর্গতি কখনোই নিত্য হইতে পারে না এবং যিনি পরমাগতি তিনি দুর্গতির মধ্যেই আপনাকে একদা পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করেন। বস্তুত যথার্থ প্রেমের সাধনা, শক্তির সাধনা, সেইখানেই সেই দুর্ধোগে সেই দুর্দিনে। আমাদের আত্মাভিমান সেখান হইতে দূরে যাইতে চায়, আমাদের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঘৃণাই বিশ্বজনীনতার লক্ষণ নহে—কিন্তু যে দুর্গতিগ্রস্ত তাহাকেই আপন বলিয়া স্বীকার করার মধ্যেই যথার্থ সর্বজনীনতা আছে। কারণ, সর্বজনীনতা কেবল একটা বস্তুবিহীন বাক্য মাত্র নহে, তাহা অহংকৃত আত্মপরিচয়ের একটা স্বরচিত উপাধি মাত্র নহে; তাহা প্রেমের জিনিস, এই জগৎই তাহা সত্য। সেই প্রেম সকলের চেয়ে নীচের মধ্যে আপনাকে বন্ধ করিয়াও সকলের চেয়ে উচ্চে আপনার স্থান লাভ করিয়া থাকে; সীমার মধ্যে বাস করিয়াও প্রতিমুহূর্তে সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে।

ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু-ইতিহাসের একটি বিকাশ, এই কথা আমরা বলিয়াছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম যতবড়োই সর্বজনীন ধর্ম হউক না, বিধাতার সৃষ্টির নিয়ম তাহাকেও মানিতে হয়, নতুবা তাহা সত্যই হইতে পারে না। অতএব বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে তাহার উদয় হইয়াছে ব্রাহ্মধর্মের এই ঐতিহাসিক বন্ধনটুকু স্বীকার করিতে



লক্ষ্য বা ক্ষোভের কোনো কারণ থাকিতে পারে না। যদি ইতিহাসকে মানি, যদি হিন্দু-ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশরূপ ঘটনাকেই একেবারে অস্বীকার করিয়া না বসি তবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটার স্ফুট অর্থই এই যে, হিন্দুর প্রকৃতির মধ্যে ও অবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি সমাবেশ আছে যাহাতে এই ধর্ম এইপ্রকার রূপ লইয়া এইধানেই ব্যক্ত হইতে পারিয়াছে।

হিন্দু-ইতিহাসের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশ, ইহার কারণরূপে নানা শক্তির খেলা থাকিতে পারে। হয়ত বিদেশের আঘাত তাহার মধ্যে একটা কারণ। অর্ধরাত্রে ভূমিকম্পে আমাকে জাগাইয়াছিল, তাই বলিয়া জাগরণটা ভূমিকম্পের নহে সেটা আমারই জাগরণ। যদি ইহাই প্রকৃত সত্য হয় যে, কোরাণ পুরাণ বাইবেল বৌদ্ধশাস্ত্র এবং দেশদেশান্তরের যত কিছু ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মসমাজ আছে সকলে একত্রে মিলিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টির গায় এই ব্রাহ্মধর্মকে সৃষ্টি করিয়া থাকে তথাপি এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টি যদি হিন্দুর ইতিহাসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে তবে তাহা হিন্দুরই। সূর্যের আলোক সূর্যেই সম্ভবপর হইয়াছে,—কেহ কেহ বলেন সূর্য অসংখ্য উদ্ভাপিণ্ডকে নিরন্তর আত্মসাৎ করিয়া সেই আলোকের সঞ্চয় রক্ষা করিতেছে; তাহা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে, তথাপি এই আলোক সূর্যেরই। আমি শাক খাইয়া কল খাইয়া দুধ মাছ ভাত খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি বটে তাই বলিয়া আমার প্রাণকে আমারই প্রাণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া ঐ শাকভাতকেই স্বীকার করিলে কি অত্যন্ত ঐদার্য প্রকাশ করা হয়? প্রত্যেক ধর্মেরই উৎপত্তি সম্বন্ধে তর্ক আছে। কেহ বলেন, খ্রীষ্টানধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে চুরি, কেহ বলেন বৈষ্ণবধর্ম খ্রীষ্টানধর্ম হইতে চুরি, এমনতর আরো অনেক বাদবিবাদ আছে—ভেমনি হয়তো কালক্রমে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ করিয়া দেখাইবেন ব্রাহ্মধর্ম জগতের সকল ধর্মের চোরাইমালের ভাণ্ডার। কিন্তু উৎপত্তিঘটিত সমস্ত বাদবিবাদ সত্ত্বেও খ্রীষ্টানধর্ম খ্রীষ্টানধর্মই, বৈষ্ণবধর্ম বৈষ্ণবধর্মই। খ্রীষ্টানধর্ম যদি বৌদ্ধধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, বৈষ্ণবধর্ম যদি খ্রীষ্টানধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, তাহার গৌরব খর্ব হয় নাই। অনাত্মকে গ্রহণ করিয়া আত্মায় পরিণত করিবার শক্তিই জীবনের শক্তি—অনাত্মের মধ্যে আত্মবিশেষত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়াই মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব যেমন করিয়াই বিচার করি, হিন্দুর ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ স্বদেশীয় বিদেশীয় যত কিছু কারণপরম্পরা অবলম্বন করিয়াই দেখা দিক্ না তথাপি তাহা হিন্দুরই সামগ্রী। এই ইতিহাস আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না—ইহা আমার প্রিয় হইলেও, সত্য অপ্রিয় হইলেও সত্য। কিন্তু সকলের চেয়ে



আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় আমার উক্তি স্বীকার করিয়াও আমার প্রবন্ধের প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছেন। তিনি একজায়গায় লিখিয়াছেন যে, “ব্রাহ্মধর্ম কেবল যে হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, ব্রাহ্মগণ কেবল যে হিন্দুবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যেই অবস্থিত থাকিবেন তাহা নহে, সর্বদেশের লোক এই উদার ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।”<sup>১</sup> আমি তো সর্বদেশের লোককে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের দরজায় কুলুপ লাগাইতে চেষ্টা করি নাই। হিন্দুও যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন এই কথাই আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু “ব্রাহ্মধর্ম কেবল হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে” এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনোদিন বলি নাই।

তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্রাহ্মদী মুসলমান-যুরোপীয় আশ্রয় লইতেছেন তাঁহারা কি নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন? পরিচয় নানা প্রকারের আছে—কোনোটা সংকীর্ণ কোনোটা ব্যাপক। আমি ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেই যে আমাকে হিন্দু পরিচয়ও গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। একজন ইংরেজ যে-অংশে ব্রাহ্ম কেবল সেই অংশেই হিন্দুর সহিত তাঁহার দেনাপাওনার একটা যোগ থাকিয়া গেল; তাহাতে তাঁহার লজ্জার কারণ কিছুই নাই। আমরা হিন্দু হইয়াও ইংরেজি সাহিত্যে আনন্দ পাই, যুরোপীয় চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচাই, রেলগাড়িতে অসংকোচে চড়ি, টেলিগ্রাফে খবর পাঠাইয়া দিই—চিন্তামাত্র করি না তাহা আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্ভাবিত সামগ্রী কি না। এইরূপে প্রতিদিনই দেখিতেছি বিশেষ মানবজাতির কীর্তিকে সর্বসাধারণ মানবজাতির সম্পদ।

বেদান্তদর্শনকে ভারতবর্ষীয় দর্শন বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাতে জর্মান পণ্ডিত ডয়সনের যদি জর্মনত্বে কোনো বাধা না ঘটাইয়া থাকে তবে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু-ইতিহাসের সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মুসলমানের বা ইংরেজের বা ব্রাহ্মদিগের লেশমাত্র বাধা কেন থাকিবে? সত্যকে কি মানুষ এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতেছে না? প্লেটোর রচনা কি খ্রীস্টের সীমার বাহিরে অম্পৃক্ত? আরিস্টটলের দর্শন কি মুসলমান জানী কোনোদিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং সেই গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দ্বারা কি তাঁহার গৌরবহানি হইয়াছিল? বস্তুত ব্রাহ্মধর্ম বিশেষভাবে হিন্দুর চিন্তের সমস্ত রস লইয়া বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই অহিন্দুর পক্ষে তাহার উপাদেয়তা বাড়িয়াছে নতুবা

১ “ব্রাহ্মধর্মের মূল মত ও অবাস্তব বিষয়”, তত্ত্বকৌমুদী ১ বৈশাখ ১৩২২

২ “হিন্দু কি?” তত্ত্বকৌমুদী ১৬ চৈত্র ১৩১৮

জগৎসংসারে তাহা নিভাস্তই বাহুল্য হইয়া থাকিত, তাহা একটা পুনরাবুত্তিমাাত্র হইত, তাহার মধ্যে বিধাতার কোনো বিশেষ বিধান প্রকাশ হইতে পারিত না।

তৎকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বারংবার বলিয়াছেন, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, খিওডোর পার্কার, মার্টিন লুথর, ম্যাটিনো সকলেই আমাদের গুরু।<sup>১</sup> তিনি ভালিকা আরো অনেক বাড়াইয়া দিতে পারেন। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য এই যে, মানবসমাজের মধ্যে যে-দেশে যে-জাতির মধ্যে যে কেহ যে-কোনো সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন তিনি সেই বিষয়েই নিখিলমানবের গুরু। ইহাই সম্ভবপর বলিয়া আমরা সত্যকে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু এই কথা কেবল পরের বেলাই খাটিবে নিজের বেলা খাটিবে না? খ্রীষ্টানের সত্য মুসলমানের সত্য আমি গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু আমার সত্য আমার বলিয়াই পাছে খ্রীষ্টান ও মুসলমান গ্রহণ না করে এই কারণেই তাহা আমার সত্য নয় এমন কথা বলিতে হইবে? বাম হাতের দিকে সত্যকে মানিব আর ডান হাতের দিকে তাহাকে মানিব না? লইবার বেলা এক কথা আর দিবার বেলা তাহার বিপরীত?

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, সব ধর্মই যদি হিন্দুধর্ম হইতে পারে, যদি হিন্দুর বিশেষ ধর্ম কী তাহা আমরা না জানি তবে তো নিজেকে হিন্দু বলাও যা আর সাদা চেকে স্বাক্ষর করাও তা।<sup>২</sup> সকল জাতির মধ্যেই তো সাদা চেকে ফাঁকা জায়গা আছে। কোনো ইংরেজ যদি একরূপ মত প্রকাশ করে যে জাতিভেদ ভালো অথবা জেনেনা প্রথা স্ত্রীপ্রকৃতির পক্ষে যথার্থ অনুকূল তথাপি যে ইংরেজ ইংরেজ তাহার সকল বিষয়ে সকল মতই একেবারে অবিচলিতরূপে পাকা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক ইংরেজ আপনাকে ইংরেজ বলিবার অধিকার পাইয়াছে ইহাই কি সত্য? প্রত্যেক ইংরেজের হাতেই সাদা চেকে খাতা আছে তাহাতে তাহার আপনাকে ইংরেজ বলিবার কোনো বাধা ঘটে নাই। সেইরূপ আমরা দেখাইয়াছি হিন্দু কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট ধর্মের বা মতের পরিচায়ক নহে কিন্তু সেইজন্যই যদি হিন্দু বলিয়া কিছুই না থাকে তবে মানুষ বলিয়াও কিছু থাকে না, তবে কেহ বলিয়াও কেহ নাই। আমি যে একজন বিশেষনামধারী ব্যক্তি, আমার ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া অসংখ্য পরিবর্তন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে,—ছেলেবেলা হইতে আজ পর্যন্ত আমি কত ভুল বুঝিয়াছি<sup>৩</sup> ও সে ভুল ছাড়িয়াছি, কত মত লইয়াছি ও বিসর্জন দিয়াছি, শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারা কাটাকুটি-করা আমার রানি রানি এক্সেসাইজ বহির সঙ্গে আর আমার অঙ্ককার

১ "ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম", তৎকৌমুদী : বৈশাখ ১৩১২

২ "সাদা কাগজে স্বাক্ষর", তৎকৌমুদী ১ বৈশাখ ১৩১২

শিক্ষার একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আশৈশবকাল হইতে আজ পর্যন্ত নিজের সমস্ত খুঁটিনাটি যদি বিচার করিয়া দেখি তো দেখিব, মতে ভাবে কর্মে আত্মবিরোধের আর অন্ত নাই কিন্তু তৎসঙ্গেও সেই সমস্ত বিরোধ ও অনৈক্যগুলিও একটি গভীরতম ঐক্যপুত্রে গ্রথিত হইয়াছে ; সেই পুত্রেটি আচ্ছন্ন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নির্দেশ করা কঠিন ;—অনৈক্যের পরস্পরাটাই বাহিরে প্রকাশমান—তবু যে লোক দেখিতেছে সে এই অনৈক্যের মালাকেও মালা বলিয়া দেখিতেছে—সে প্রতিদিনের ভূরি ভূরি বিচ্ছেদের মধ্যেও আমাকে বিচ্ছিন্ন পদার্থ বলিয়া ভ্রম করিতেছে না। অতএব, যেমন সকল জাতিরই, যেমন সকল মানুষেরই, তেমনই হিন্দুরও ইতিহাসে মতের ধর্মের আচারের পরিবর্তনহীন অবিচলিত ঐক্য নাই, সেরূপ ঐক্য থাকিতে পারে না, এবং না থাকাই সম্ভব। সেইরূপ নিশ্চল ঐক্য আছে বলিয়া যাহারা গৌরব বোধ করেন তাঁহাদের সেই গৌরববোধ কাল্পনিক—সেরূপ ঐক্য নাই বলিয়া যদি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তবে তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাও একেবারে অর্থোক্তিক।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির সহস্র বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে যে এক প্রবল শক্তি গভীর ভাবে কাজ করিতেছে সেই শক্তি আর্থের সঙ্গে অনার্থকে রক্তে রক্তে মিলাইয়া দিয়াছে, সেই শক্তি শক হুন এবং গ্রীক উপনিবেশগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, সেই শক্তি শত শত ধর্মমত ও আচারকে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছে এবং সেই শক্তিই সকল ধর্মের অনৈক্যের ভিতর দিয়া অনন্ত সত্যের একটি স্মৃহৎ ঐক্যকে উপলব্ধি করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার কার্যক্ষেত্র অতি বৃহৎ তাহার উপকরণ অতি বিপুল বলিয়াই তাহার বাধাও পর্বতপ্রমাণ—কিন্তু এই বাধাই তাহার নিত্য নহে ; সে মহত্তম সত্যকে চায় বলিয়াই গুরুতর ভ্রান্তির সহিত পদে পদে তাহাকে লড়াই করিতে হইতেছে ; সে যে সামঞ্জস্যকে ঘটাইয়া তুলিবার দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে লইয়াছে তাহা সংকীর্ণ নহে বলিয়াই তাহার অনৈক্যভারে সুদীর্ঘ পথ সে এমন পীড়িত হইয়া চলিয়াছে কিন্তু তৎসঙ্গেও এই অনৈক্যরাশিই তাহার চরম সঞ্চয় নহে। আজ যদি এই হিন্দুর ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া আমরা কোনো একটি ঐক্যের উপলব্ধিকে পাইয়া থাকি তবে অকৃতজ্ঞের মতো কি আমরা এমন কথা বলিতে পারি যে, সাধনা যাহার সিদ্ধি তাহার নহে ; এতদিনের দায়-বহনটা রহিল হিন্দুর, আর সেই দায়-শোধের অঙ্কটা কেবলমাত্র আমাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র ধাতায় জমা করিয়া লইব এবং তাহাকেই নাম দিব অসাম্প্রদায়িকতা ? যেখানেই হিন্দু-ইতিহাসের সকলতা সেইখানেই আমি তাড়াতাড়ি সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া সকল হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হইয়া নিজের আসনটা চোঁকা করিয়া পাতিয়া লইয়া চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া তুলিয়া দিব এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিব, এস



খ্রীষ্টান, এস মুসলমান, এস সিঁহদী, আমরা ব্রহ্মনামের সদাশ্রিত খুলিয়াছি, কিন্তু এই সদাশ্রিতের আয়োজনটি হিন্দুর নহে, ইহা কেবল আমাদেরই এই কল্পজনের ; ইহার মধ্যে অতীতের কোনো সাধনা নাই, চিরন্তনকালের ঐতিহাসিক পরীক্ষাশালার কোনো ছাপ নাই, মানবসমাজে সত্যমাত্রই বিধাতার স্বহস্তস্বাক্ষরিত যে একটি বিশেষ দেশ-কালের পরিচয় লইয়া আসে ইহার মধ্যে সেই স্বাক্ষর নাই, সেই পরিচয় নাই—এই যে আমাদের ভাবাবেগ, এই যে আমাদের আইডিয়াল, কবছের মতো ইহার মুণ্ড নাই কেবল দেহ আছে, ইহার বিশেষত্ব নাই কেবল বিশ্বত্ব আছে ; ইহা নিজের পায়ের তলার আশ্রয়কে মাটি বলিয়া অবজ্ঞা করে এবং শূণ্যের উপর দাঁড়াইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তাহাও নিজের হাত দিয়া নহে পাছে সেই নিজত্বের দ্বারা বিশ্বজনীনতার খর্বতা ঘটে ।’

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষ্যে রিপন কলেজে ২৯ অক্টোবর ১৯১১ তারিখে পঠিত হয় ।

শিক্ষার বাহন ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২২ তারিখে রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত হয় ।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের এই নূতন নহে, ১২৯৯ সালে “শিক্ষার হেরকের”<sup>১</sup> রচনার সময় হইতে তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ; এবং ১৩৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত “বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ”<sup>২</sup> ও “শিক্ষার বিকিরণ”<sup>৩</sup> প্রবন্ধে ও ১৩৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পদবী-সম্মান বিতরণ-সভায় পঠিত “ছাত্র-সম্ভাষণ”<sup>৪</sup> প্রবন্ধেও, প্রসঙ্গক্রমে এ-বিষয়ে মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন ; ১৩৪৩ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সপ্তাহে পঠিত “শিক্ষার স্বাকীকরণ”<sup>৫</sup> প্রবন্ধেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কতৃপক্ষের নিকট একই আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন । শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন “বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আড়িনায় ঘেঁষন চলিতেছে চলুক,— কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে...

<sup>১</sup> আলোচ্য বিষয়টি লইয়া ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালের তত্ত্ব-কৌমুদীতে আরও কয়েকটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে বিশ্বেশ্বরনাথ ঠাকুর “ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু” প্রবন্ধে, ব্রাহ্মগণ হিন্দু, এই মত সমর্থন করেন । ১৩২১ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি পুনরুত্থাপিত করেন, তাহার আলোচনার রবীন্দ্রনাথের মত সমর্থিত হয় ; তাহার অনুবৃত্তিরূপে ঐ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ব-কৌমুদীতে এ-বিষয়ে অনেক ধারণাতিথার প্রকাশিত হয় ; গুরুচরণ মহলানবিশ, স্বকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি অজিতকুমারের প্রতিবাদ করেন ।

<sup>২</sup> রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড ; এ খণ্ডে ‘শিক্ষা’র গ্রন্থপরিচয়ও হইবে ।

<sup>৩</sup> ‘শিক্ষা,’ ১৩৪১ সংস্করণ দ্রষ্টব্য ।



বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাহে বাধাটা কী?... প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না?” শিক্ষার স্বাক্ষর প্রবন্ধেও তদন্তরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব আজিজুল হক মহাশয়কে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন নিচে তাহা অংশত মুদ্রিত হইল।

আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষা-বিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানাকারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিধিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তা ছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রার কর্ণধার।

“বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেও” ইতিপূর্বে শিক্ষার বিকিরণ প্রবন্ধে তিনি অনুরূপ “আবেদন উপস্থিত” করিয়াছিলেন :

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অন্তপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রথম এই কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে একটা পরীক্ষার বেড়া জাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইন্সুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র

স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষ্যে সে-রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় বা গবর্নমেন্ট হইতে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় বিশ্বভারতী লোকশিক্ষাসংসদ যথাসক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতে থাকেন, এই কাজ এখনো চলিতেছে।

পরিচয় গ্রন্থের বর্তমানে প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পূর্বতন প্রবন্ধ বর্জিত ও নূতন প্রবন্ধ সম্মিলিত হইয়াছে; রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণের প্রবন্ধসূচী অক্ষুণ্ণ হইল।

### কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কর্তার ইচ্ছায় ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরেই ( ২২ আগস্ট ১৯১৭ ) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে উহা কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরিতে ( ৪ আগস্ট ১৯১৭ ) ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে আলফ্রেড থিয়েটার গৃহে পঠিত হয়।

এই বৎসর আষাঢ় মাসে, ভারতবর্ষে আত্মশাসন-প্রবর্তনচেষ্টার কালে, “নির্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায় শ্রীমতী অ্যানী বেসান্ট ও তাহার দুই জন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত” হয়। “কথা হয় যে, টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে, এবং তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্নমেন্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই সভায় কয়েকজন উচ্চোক্তাকে ডাকিয়া এই জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা গবর্নমেন্ট টাউন-হলে এই সভা হইতে দিবেন না; কেবল মাদ্রাজ গবর্নমেন্টের একটি কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্নমেন্ট সভা হইতে দিতে পারেন না; অন্য প্রদেশে বাহা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলা গবর্নমেন্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না<sup>১</sup>। কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদাদি করিলে

১ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, “প্রতিবাদের অধিকার”।

২ দ্রষ্টব্য পৃ. ৫৬২ :

“দেড়শ বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল মাদ্রাজ গবর্নমেন্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলাদেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি কেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এতদিন এই জানিতাম ইংরেজের অথও শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিমপারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্বপারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখদুঃখে বাঙালির কোনো অধাব্যথা নাই? এমন হকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব?”

গবর্নমেন্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন।”<sup>১</sup> এইরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন; জনশ্রুতি, এইজন্য তাঁহার গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছিল।

“যখন বঙ্কের গবর্নর টাউনহলে ইমতি বেসান্টের স্বাধীনতালোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারি করেন, তখন বাক্যশ্রুতি “রাজনীতি-ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ” ( “novice in politics” ) রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরিতে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম পড়িয়া বঙ্কের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্কের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।”<sup>২</sup>

“দেশ দেশ নন্দিত করি মস্তিত তব ভেরী” গানটি এই সময় রচিত ও রামমোহন লাইব্রেরির সভায় সর্বপ্রথম সাধারণে গীত হয়; গানটি প্রবাসীতে “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তিরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সম্ভবত এই প্রবন্ধে বিবৃত সমাজ-সংক্রান্ত মতামত-প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রব্যবহার করেন; তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল:

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। কিছুদিন হইতে বাংলাদেশের যুবকদের ভাবগতিক দেখিয়া বড়োই হতাশ হইতেছিলাম। স্বদেশভক্তির নাম লইয়া বিচারবুদ্ধির অন্ধতা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন কি আমার এই বিজ্ঞালয়ে অল্পবয়সের যে-সব ছাত্র আসে তারাও এমন একটা বিরুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া আসে যে হার মানিতে হয়। যে মূঢ়তা স্বাভাবিক তার প্রতিকার আছে। কিন্তু যে মূঢ়তা কৃত্রিম—যাহা জোর করিয়া কোমর বাধিয়া সর্বত্র তাল ঠুকিয়া বেড়ায়, তার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। আমি একরকম হাল ছাড়িবার চেষ্টাতেই ছিলাম, এমন সময় এই বন্ধুতার তাগিদ আসিল। আর যাই হোক একটা দেখিলাম, রাক্ষসটাকে যত প্রকাণ্ড প্রবল বলিয়া মনে হইত উহার জোর ততটা নয়। উহার আয়তন বড়ো, কিন্তু ভিতরটা ভূয়ো। একটু ধাক্কা মারিলেই দেখি টলমল করিয়া উঠে। সুতরাং যে পর্যন্ত না কাত হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা মারিবার সংকল্প রহিল। দূর হইতে আপনাদের উৎসাহবাণী কাজে লাগিবে। ইতি ৬ ভাদ্র : ১৩০৪

১ প্রবাসী, ভাদ্র : ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, “অতিবাদের অধিকার”।

২ প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, “রবীন্দ্রনাথের মহত্ব”।

### সংশোধন : অষ্টাদশ খণ্ড

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৯	২৫	মৃত্যুদিনের	মৃত্যুদিনের
১৩৫	১০	করো নবগীত	নবগীত করো
৫০৬	২০	রইল	রহিল
৩৩	১০ ও ১১	ছত্রের মধ্যে '২' সংখ্যা বসিবে।	
১১৭	১২ ও ১৩	মুদ্রণকালে অক্ষর ভাঙিয়াছে। ছত্র দুইটি যথাক্রমে হইবে : রাতের আঁধার দিনের জ্যোতিতে। প্রতি তুচ্ছ মুহুর্তেরই আবর্তন। করি আমি জুড়ো,	



## বর্ণানুক্রমিক সূচী

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া	...	৭৩
অনেককালের একটিমাত্র দিন	...	৫৮
অনেক হাজার বছরের	...	১৩
অন্য কথা পরে হবে	...	৩০
অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে	...	১৩২
অসম্ভব কথা	...	২৭০
অসীম আকাশে কালের তরী	...	৩১
অহৈতুক	...	২৪২
আকাশে চেয়ে দেখি	..	৫২
আজ শরতের আলোয়	...	৪৬
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে	...	১৩০
আত্মপরিচয়	...	৪৫২
আবাহন	...	২৩৭
আমরা কি সত্যই চাই	...	৩৬
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো	...	১৮৭
আমার এই ছোটো কলসখানি	...	১১৫
আমার এই ছোটো কলসিটা	...	৫৪
আমার কাছে শুনতে চেয়েছ	...	৩৪
আমার জগৎ	...	৪১১
আমার ফুলবাগানের	...	৪৮
আমার রাত পোহাল	...	১৪২
আমার শেষবেলাকার ঘরখানি	..	৩৭
আমি	...	১১৭
আমি কানন হতে	...	১৮৮
আমি বলল কয়েছি	...	২৮
আর রেখো না আধারে	...	১৭৩
আলোকরসে মাতাল রাতে	...	২৪৬

আলোর অমল কমলখানি	...	২২০
আষাঢ়	...	১২০, ২০৩, ৫৩১
আসন্ন শীত	...	২২২
উৎসব	...	২৪৪
উদ্বোধন	...	১৩৭
ঋষি কবি বলেছেন	...	৭৩
এই যে সবার সামান্য পথ	...	১১৭
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	...	২৮৩
একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের	...	১০৭
একদিন তুচ্ছ আলাপের	...	৪
একদিন শাস্ত হলো	...	১০৮
একলা বসে বাদলশেষে	...	১৩৬
এ কী পরম ব্যথায়	...	১৮৭
এবার অবগুষ্ঠন খোলো	...	১৪০
এস, এস, এস, হে বৈশাখ	...	২০২
এস নীপবনে	...	১২৩
এস শরভের অমল মহিমা	...	১৩৩
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব	...	১৩৪
ওগো শীত, ওগো শুভ্র	...	২২৩
ওগো শেকালিবনের মনের কাষনা	...	১৩৩
ওগো সন্ন্যাসী, কী গান	...	২১২
ওরা এসে আমাকে বলে	...	৭৮
ওরে প্রজাপতি, মায়ী দিয়ে	...	২৪৪
ওলো শেকালি	...	১৩৮
কত-না দিনের দেখা	...	২৪২
কর্তার ইচ্ছায় কৰ্ম	...	৫৪৩
কার বাঁধি নিশিভোরে	...	১৪১
কালবৈশাখী	...	২০৪
কালো অঙ্ককারের তলার	...	২৬
কুপণতা	...	৫২৫

কেউ চেনা নয়	...	২৪
কেন গো যাবার বেলা	...	২২১
কেন পার এ চঞ্চলতা	...	২১৫
কোথা যে উধাও হল	...	১৩০
কোনু ব্যক্তির করিল প্রচার	...	২০২
ধাতা	...	৩১৭
গগনে গগনে আপনার মনে	...	২১১
গান আমার যায়	...	১৪৩
ঘট ভরা	...	১১৫
চঞ্চল	...	২৪৪
চরণরেখা তব	...	২২২
ছবির অঙ্গ	...	৫১২
জানি তুমি কিরে আসিবে	...	২৪১
ঝরে ঝর ঝর	..	১৩০
ডাকো বৈশাখ কালবৈশাখী	...	২০৪
ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি	...	২২৭
তখন আমার আয়ুর তরুণী	...	৯৯
তখন আমার বয়স ছিল	...	১০১
তখন বয়স ছিল কাঁচা	...	৩৮
ভপের তাপের বীধন	...	২০৮
ভূক ভোমার ধবল-শৃঙ্গলি	...	২৩৪
তুমি কি এসেছ মোর	...	১৬২
তুমি গল্প জমাতে পার	...	৮৫
তুমি প্রভাতের শুকতার	...	৫৬
তোমার আসন পাতল কোথায়	...	২৩৭
তোমার নাম জানিনে	...	১৪১
দিনের প্রান্তে এসেছি	...	১০
দীপালি	...	২২৬
হৃৎ যেন আল পেতেছে চারদিকে	...	১২৩
দেখো শুকতার	...	১৩৭

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের	...	১১৬
দোল	...	২৪৬
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে	...	১৩৩
ধর্মশিক্ষা	...	৩৭২
ধর্মের অধিকার	...	৩৯৩
ধর্মের অর্থ	...	৩৫৬
ধর্মের নবযুগ	...	৫৪৭
ধূসরবসন, হে বৈশাখ	...	২০৩
ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন	...	২০১
ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর	...	২১৬
নব বরষার দিন	...	১২০
নম, নম, নম । তুমি ক্ষুধার্ত	...	২২২
নম নম নম নম তুমি সুন্দরতম	...	২৩৫
নম, নম, নম, নম । নির্দয় অতি	...	২৩১
নমো, নমো কক্কাগাধন	...	২০৮
নমো, নমো, হে বৈরাগী	...	২০২
নামকরণ	...	৩৪৩
নির্মল কাস্ত নমো হে নমঃ	...	২১৮
নিশীথে কী কয়ে গেল	...	১৫৮
নূতন কল্পে সৃষ্টির আরম্ভে	...	৪১
নৃত্য	...	১২২, ২৩০
নৃত্যের তালে তালে	...	১২২
পাঁচিশে বৈশাখ চলেছে	...	৮২
পড়েছি আজ রেখার মায়ায়	...	৩২
পথিক আমি	...	৭২
পথিক মেঘের দল জোটে	...	১৩৩
পথে যেতে ডেকেছিল	...	১৭৮
পরানে কার ধ্যান আছে	...	২০৬
পাগল আজি আগল খোলে	...	২১৮
পাঁচিলের এধারে	...	৫৭



বর্ণানুক্রমিক সূচী

৫৯৭

পাড়ায় আছে ক্লাব	...	৬২
পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ	...	৬৬
পূব হাওয়াতে দেয় দোলা	...	১৩২
পুরবাসী বলে উমার মা	...	৩২২
পূর্বগগনভাগে	...	১৪৯
প্রত্যাশা	...	২০৮
প্রশ্ন	...	১১৬
প্রার্থনা	...	২৪১
ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন	...	৫
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁধা	...	১৩১
বন্ধু, রহো রহো সাথে	...	১৩৪
বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে	...	৮
বর্ষা-মঙ্গল	...	২১২
বসন্ত	...	২৩৭
বসন্তের বিদায়	...	২৪০
বাতাবির চারা	...	১০৮
বাদশাহের হুকুম	...	৬৩
বাঁধন কেন ভূষণবেশে	...	১৫৫
বাঁধন-ছেড়ার সাধন হবে	...	১৭০
বিলাপ	...	২২২
বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি একদিন	...	৭৫
বৈশাখ	...	২০১
বৈশাখ-আবাহন	...	২০২
ব্যঙ্গনা	...	২০৭
ভগিনী নিবেদিতা	...	৪৮৭
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	...	৪২৩
ভালোবেসে মন বললে	...	১৭
ভোরের আলো-আঁধারে	...	২১
মধ্যাহ্নে যবে গান	...	২০৫
মধ্যবর্তিনী	...	২৫৭

মনে মনে দেখলুম	...	১৪
মনে হবে কি না হবে	...	২৪২
মনের মাছ	...	২৪২
মনে হয়েছিল আজ	...	২০
মন্দিরার মস্ত্র তব	...	১২৭
মর্মবাণী	...	১১২
মুক্তিতত্ত্ব	...	১৩৫
মুক্তিতত্ত্ব স্তনভে কিরিস	...	১৩৫
মাধুরীর ধ্যান	...	২০৫
মুখখানি কর মলিন বিধুর	...	২৪০
যক্ষ	...	১২১
যখন দেখা হল	...	৬০
যার রে প্রাণ কবি	...	২১৪
যে ছায়াতে ধরব বলে	...	১৩৮
যেথা দূর ঘোবনের	...	১০২
ঘোবনের প্রান্তসীমায়	...	৬
রঙ লাগালে বনে বনে	...	২৪০
রাগরঙ্গ	...	২৪০
রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো	...	২৪৬
রাস্তায় চলতে চলতে	...	২৫
রূপ ও অরূপ	...	৩৩৫
রোগীর নববর্ষ	...	৩৩১
লীলা	...	২১১
লুকানো রহে না বিপুল মহিমা	...	২৬৫
শরৎ	...	২১৬, ৫৩৮
শরৎ ডাকে শর-ছাড়ানো ডাকা	...	২১২
শরতের ধ্যান	...	২২০
শরতের বিদায়	...	২২১
শান্তি	...	২১৮
শান্তি	...	২৭৮

নিউলি-কোটা ফুরাল বেই	...	২২৪
শিকার বাহন	...	৪২৭
শীত	...	২২২
শীতের উদ্বোধন	...	২২৭
শীতের বনে কোন্ সে কঠিন	...	২২২
শীতের বিদায়	...	২৩৪
শীতের যোদ্ধা	...	৭৪
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন	...	২৩০
শিল্পীর ছবিতে বাহা	...	১১২
তুনিতে কি পাস	...	২০৭
তুচ্ছ হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে	...	৪৪
শেষ পর্ব	...	১০২
শেষ মিনতি	...	২১৫
শেষের রঙ	...	২৪৬
শ্রামল শোভন প্রাবণ-ছায়া	...	১৩৬
প্রাবণ, তুমি বাতাসে কার	...	২১৪
প্রাবণ-বিদায়	...	২১৪
প্রাবণ সে যার চলে পাহা	...	২১৬
সকল কলুষ তামস হর	...	১৮৩
সন্ন্যাসী যে আগিল ঐ	...	২৪৪
সমাপ্তাপূরণ	...	৩১১
সমাপ্তি	...	২২২
সম্পাদক	...	২৫৩
সম্বোধন	...	২০৩
সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা	...	৬২
সোনার কাঠি	...	৫২১
স্তব	...	২৩৩
স্থির কেনেছিলেম	...	৩
স্বতি-পাথুর	...	১০৭

হার হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার	...	২২৪
হার মানালে	...	১৮৩
হালকা আমার স্বভাব	...	৮২
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়	...	৪৭০
হিন্দু ব্রাহ্ম	...	৫৮০
হিমের রাতে ঐ গগনের	...	২২৬
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী	...	১৭৬
হৃদয় আমার, ঐ বুঝি	...	২০৪
হে ক্ষণিকের অতিথি	...	১৪২
হে বসন্ত, হে সুন্দর	...	২৩৭
হেমন্ত	...	২২৫
হে মহাজীবন	...	১৮২
হে যক্ষ তোমার প্রেম	...	১২১
হে যক্ষ, সেদিন	...	৭৬
হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে	...	২৩৩
হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব	...	২২৫